রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা

শান্তিদেব ঘোষ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

ভূমিকা

১৩৪৯ সালে "রবীন্দ্রসঙ্গীত" নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলাম, তাকে বলা চলে পূজনীয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গান, নৃত্য ও অভিনয়-জীবনের ভূমিকা। আগ্রহী পাঠকগণ সেই কারণেই তৃপ্ত না হয়ে বারে বারেই আমাকে অনুরোধ করতেন আরো বিস্তারিত ভাবে গুরুদেবের এ-জীবনের কথা শোনাতে। শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার জীবনের প্রবল চাপে সে অনুরোধ রক্ষা করবার অবসর আমি পাইনি। তবুও, কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদকের আগ্রহে এবং উৎসাহে লেখার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল না, অসুবিধার মধ্যেই মাঝে মাঝে লিখতে বাধ্য হয়েছি। সেগুলিকেই এবারকার "রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা" গ্রন্থে সাজিয়ে প্রকাশ করা হলো।

পূজনীয় গুরুদেবের বিচিত্রপথগামী জীবনের প্রকাশে সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের ছিল একটি সম্মানজনক স্থান। এপথে, ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর যেমন ছিল গভীর অনুরাগ তেমনি অনুরাগ ছিল তাঁর ইয়োরোপীয় সংগীত-সংস্কৃতির প্রতি। তাকেও তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সৃষ্টির কাজে। কিন্তু প্রকাশকালে দেখা গেল তার একটি সমন্বয়ধর্মী ভারতীয় রূপ।

পূজনীয় গুরুদেবের এই-জীবনের সব কথা বলে শেষ করতে বহু সময়ের প্রয়োজন হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ, তাঁর সঙ্গীতজীবনের বহু প্রয়োজনীয় সংবাদ, যা এখনো অপ্রকাশিত রয়ে গেছে, তাকে প্রকৃত ঐতিহাসিক এবং গবেষকদের মত নিষ্ঠার সঙ্গে খুঁজে বের করতে হবে, প্রথমে। এর সঙ্গে প্রয়োজন হবে ঊনবিংশ শতকের বাংলা-সংগীত-সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে বাংলাভাষায় রচিত যাবতীয় গানের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের। শিক্ষকতার কাজের অবসরে গুরুদেবের সংগীত-জীবন, বাংলা সংগীতের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ এবং বাংলার বিচিত্র সংগীতধারার সঙ্গে পরিচিত হবার পথে কিছু দূর অগ্রসর হবার পরই আমি এর প্রয়োজনীয়তা পরিষ্কারভাবে অনুভব করতে সক্ষম হই। আমার একার চেষ্টায় এতবড় কাজ শেষ করা সম্ভব নয়। বহুজনকে উৎসাহের সঙ্গে একাজে হাত দিতে হবে। এবং এইরূপ সমবেত প্রচেষ্টার ফলেই জানা যাবে যে, গত শতাব্দীর বাংলা সংগীত-সংস্কৃতির স্রষ্টা-উত্তরাধিকারী রূপে, বিশেষ করে গুরুদেবকে এবং গত শতাব্দীর সংগীতধারাকে নতুন যুগের উপযোগী করে গড়ে তোলার দ্বারাই তাঁর এই সৃষ্টির সার্থকতা।

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে প্রকাশিত বাংলাভাষার নানা প্রকার সংগীতগ্রন্থ

এবং গত শতাব্দীর বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনধারার ব্যাপক পরিচয়ের উপযোগী বেশ কিছু ঐতিহাসিক গবেষণাগ্রন্থ এবং প্রবন্ধাদি পড়বার সুযোগ আমার হয়েছিল। "রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা" গ্রন্থের প্রবন্ধ কটির রচনা-কালে সেইসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি থেকে আমি প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। আমার সেই ঋণ আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি। এছাড়া, কৃতজ্ঞ আমি শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অমিতাভ চৌধুরীর কাছে, যাঁদের উৎসাহে ও সাহায্যে "রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা" গ্রন্থটির দ্রুত প্রকাশ সম্ভব হলো।

শান্তিদেব ঘোষ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এবারকার সংস্করণে কিছু নতুন তথ্য ও তৎসহ পরিশিষ্টে গ্রন্থে উল্লেখিত গান ও কবিতার একটি তালিকা সংযোজিত হল।

শান্তিদেব ঘোষ

উৎসর্গ

স্নেহের শুভময় ঘোষ (ভুলু)-কে

দাদা

সূচী

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-চিন্তা

পূজনীয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সঙ্গীতরচয়িতা এবং সুকণ্ঠ গায়ক। এ ছাড়া সঙ্গীতের ব্যাখ্যাতা হিসেবে তাঁর যে আর একটি গুণ প্রকাশ পেয়েছে তা তাঁর সমসাময়িক আর কোনো সঙ্গীতকার বা গায়কদের মধ্যে দেখি না। কী ভারতীয়, কী ইয়োরোপীয় সব সঙ্গীতের প্রকৃতি বিষয়ে তিনি যে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা লিখিতভাবে রেখে গেছেন তা বাংলার সঙ্গীত-সাহিত্যে তুলনাহীন। প্রত্যেকটির সুন্দর পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। এ ছাড়া মানব-জীবনে সঙ্গীতের প্রয়োজন যে কত গভীর সে বিষয়ে তাঁর চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হলে সঙ্গীত সম্বন্ধে এখনো আমাদের শিক্ষিতদের মনে যে সংকীর্ণতা আছে তা দূর করতে সাহায্য করবে। এই লেখাগুলি পড়ে বেশ বোঝা যায় যে, তিনি সঙ্গীতকে বাইরের বিলাসের বস্তু বলে দেখেননি, দেখেছিলেন সাধকের মতো ধ্যানের দৃষ্টিতে সঙ্গীতরসের অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করে। এরই পরিচয় হিসেবে তাঁর লেখা থেকে কয়েকটি অংশ আমি উদ্ধৃত করছি। প্রথমটির বিষয় হচ্ছে আমাদের সঙ্গীত। গুরুদেব লিখেছেন—

"বাল্যকালে স্বভাবদোষে আমি যথারীতি গান শিখিনি বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের বাড়িতে গানের চর্চার বিরাম ছিল না। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন সঙ্গীতের আচার্য, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অতএব ছেলেবেলায় যে-সব গান সর্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে শখের দলের গান নয়; তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের ঠাট আপনা-আপনিই জমে উঠেছিল। রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অত্যন্ত যাঁরা শুচিবায়ুগ্রস্ত, তাঁদের সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না, অর্থাৎ সুরের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কিছু-কিছু ধারণা থাকা সত্ত্বেও আমার মন তার অভ্যাসে বাঁধা পড়েনি—কিন্তু কালোয়াতি সঙ্গীতের রূপ এবং রস সম্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে-ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল।

"যাই হোক, গীতরসের যে সঞ্চয় বাল্যকালে আমার চিত্তকে পূর্ণ করেছিল, স্বভাবতই তার গতি হল কোন্ মুখে, তার প্রকাশ হল কোন্ রূপে, সেই কথাটি

যখন চিন্তা করে দেখি তখন তার থেকে বুঝতে পারি সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রকৃতি কী।"

গুরুদেবের কথানুযায়ী, "আমার মনে যে সুর জমেছিল, সে সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে, তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা দিল। ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সঙ্গীতের রূপ সে রচনা করলে না। সঙ্গীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট্ট বোঝা গেল না।

"আকাশে মেঘের মধ্যে বাষ্পাকারে যে জলের সঞ্চয় হয়, বিশুদ্ধ জলধারা-বর্ষণেই তার প্রকাশ। গাছের ভিতর যে রস গোপনে সঞ্চিত হতে থাকে, তার প্রকাশ পাতার সঙ্গে ফুলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। সঙ্গীতেরও এই রকম দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সঙ্গীত আকারে, আর হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে, সেই ভেদ অনুসারে সঙ্গীতের এই দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় হিন্দুস্থানে আর বাংলা দেশে। কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশে সঙ্গীত কবিতার অনুচর না হোক, সহচর বটে। কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে সে স্বরাজে প্রতিষ্ঠিত; বাণী তার 'ছায়েবানুগতা'। ভজন-সঙ্গীতের কথা যদি ছেড়ে দিই, তবে দেখতে পাই পশ্চিমে সঙ্গীত যে-বাক্য আশ্রয় করে, তা অতি তুচ্ছ। সঙ্গীত সেখানে স্বতন্ত্র, সে আপনাকেই প্রকাশ করে।

"বাংলাদেশে হৃদয়াবেগের স্বাভাবিক প্রকাশ সাহিত্যে। 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'—সে দেখতে পাচ্ছি সাহিত্যের মধুচক্র থেকে। বাণীর প্রতিই বাঙালীর অন্তরের টান; এই জন্যেই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সবচেয়ে বেশী হয়েছে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যে তো মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না—এই জন্যে বাংলাদেশে সঙ্গীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়; বাণীর পাশেই তার আসন।"

এর প্রমাণ গুরুদেব পেয়েছেন কীর্তনে। তাঁর মতে—"এই কীর্তনের সঙ্গীত অপরূপ, কিন্তু সঙ্গীত যুগলভাবে গড়া-পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবেই এর স্বার্থকতা। পদাবলীর সঙ্গেই যেন তার রাসলীলা; স্বাতন্ত্র্য সে সইতেই পারবে না। সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য যন্ত্রে সব চেয়ে প্রকাশ পায়। বাংলার আপন কোনো যন্ত্র নেই।...বীণা রবাব শরদ্‌ সেতার এস্রাজ সারেঙ্গী প্রভৃতির তুলনায় আমাদের রাখালের বাঁশি বা বৈরাগীর একতারা কিছুই নয়। তা ছাড়া, গড়ের বাদ্যের

বীভৎস ব্যঙ্গরূপে বাংলাদেশে কন্সার্ট-নামক যে যন্ত্রসঙ্গীতের উৎপত্তি হয়েছে তাকে সহ্য করা আমাদের লজ্জা এবং তাতে 'আনন্দ' পাওয়ায় আমাদের অপরাধ।

"এই-সমস্ত লক্ষণ দেখে আমার বিশ্বাস হয়, বাংলাদেশে কাব্যের সহযোগে সঙ্গীতের যে বিকাশ হচ্ছে, সে একটি অপরূপ জিনিস হয়ে উঠবে। তাতে রাগ-রাগিণীর প্রথাগত বিশুদ্ধতা থাকবে না, যেমন কীর্তনে তা নেই; অর্থাৎ গানের জাতরক্ষা হবে না, নিয়মের স্খলন হতে থাকবে, কেননা তাকে বাণীর দাবী মেনে চলতে হবে। কিন্তু এমনতর পরিণয়ে পরস্পরের মন জোগাবার জন্যে উভয় পক্ষেরই নিজের জিদ কিছু-কিছু না ছাড়লে মিলন সুন্দর হয় না। এই জন্যে গানে বাণীকেও সুরের খাতিরে কিছু আপোষ করতে হয়, তাকে সুরের উপযোগী হতে হয়। যাই হোক, বাংলাদেশে এই এক-জাতের কাব্যকলা ক্রমশ ব্যাপক হয়ে উঠবে বলে মনে করি। অন্ততঃ আমার নিজের কবিত্বের ইতিহাসে দেখতে পাই গান-রচনা, অর্থাৎ সঙ্গীতের সঙ্গে বাণীর মিলন-সাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে।"

গুরুদেব জানতেন—"সঙ্গীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিরাজ করে, সেখানে তার নিয়ম সংযমের যে শুচিতা প্রকাশ পায়, বাণীর সহযোগে গান রূপে তার সেই শুচিতা তেমন করে বাঁচিয়ে চলা যায় না বটে, কিন্তু পরম্পরাগত সঙ্গীত-রীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয় সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে। কবিতাতেও ছন্দের রীতি আছে—সে রীতি কোনো বড় কবি নিখুঁতভাবে সাবধানে বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করেন না—অর্থাৎ তাঁরা নিয়মের উপরেও কর্তৃত্ব করেন কিন্তু সেই কর্তৃত্ব করতে গেলেও নিয়মকে স্বীকার করা চাই। স্বাতন্ত্র্য যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা, সেখানে কলাবিদ্যার স্থান নেই। এই জন্যে নিজের সৃজনশক্তিকে ছাড়া দিতে গেলেই শিক্ষা ও সংযম-শক্তির বেশী দরকার হয়।

"আমাদের দুই রকমেব খাদ্য আছে—একটি প্রয়োজনের, আর-একটি অপ্রয়োজনের;—একটি অন্ন, আর একটি অমৃত। অন্নের ক্ষুধায় আমরা মর্ত্য-লোকের সকল জীবজন্তর সমান, অমৃতের ক্ষুধায় আমরা সুরলোকে দেবতাদের দলে। সঙ্গীত হচ্ছে অমৃতেব নানা ধারার একটি।

"একথা মনে রাখতে হবে, যা অমৃত, যা প্রয়োজনকে অতিক্রম করে আপনাকে প্রকাশ করে, মনুষ্যত্বের চরম মহিমা তাতেই। যে জাতি পেটুক, সে কেবলমাত্র নিজের প্রতিদিনের গরজ মিটিয়ে চলেছে, মৃত্যুতেই তার একান্ত মৃত্যু। গ্রীস যে আজও অমর হয়ে আছে, সে তার ধনে, ধান্যে, রাষ্ট্রীয় প্রতাপে নয়;

আত্মার আনন্দরূপ যা-কিছু সে সৃষ্টি করেছে, তাতেই সে চিরদিন বেঁচে আছে। প্রত্যেক জাতির উপরে ভার আছে, সে মর্ত্যলোকে আপন অমরলোকের সৃষ্টি করবে। গ্রীস সেই নিজের অমরাবতীতে আজও বাস করছে। সঙ্গীত মানবের সেই আনন্দরূপ, সে মানবের নিজের অভাবমোচনের অতীত বলেই সর্বমানবের এবং সর্বকালের—রাজ্য সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু এই আনন্দরূপ চিরন্তন।

"যে সকল ঘোরতর প্রবীণ লোক ওজনদরে জিনিসের মূল্য বিচার করেন, সারবান বলতে যাঁরা ভারবান বোঝেন, তাঁরা সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যাকে সৌখিনতা বলে অবজ্ঞা করে থাকেন। তাঁরা জানেন না, যাদের বীর্য আছে সৌন্দর্য তাদেরই। যে শক্তি আপনাকে শক্তিরূপেই প্রকাশ করে, সে হল পালোয়ানি, কিন্তু শক্তির সত্যরূপ হচ্ছে সৌন্দর্য। গাছের পূর্ণ শক্তি তার ফুলে ; তার মোটা গুঁড়িটার মধ্যে সে কেবল আপনিই থাকে, কিন্তু তার ফুলের মধ্যে সে যে ফল ফলায় তারই বীজের ভিতর ভাবীকালের অরণ্য, অর্থাৎ তাব অমরতা। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সর্বপ্রকার কলাবিদ্যায় প্রাণশক্তি আপন অমরতাকে ফলিয়ে তোলে—অপিস-আদালতে কলে-কারখানায় নয়। উপনিষদ বলেছেন, জন্মেছে বলেই সকলে অমর হয় না, যারা অসীমকে উপলব্ধি করেছে, 'অমৃতাস্তে ভবন্তি।' অভাবের উপলব্ধিতে কাপড়ের কল, পাটের বস্তার কারখানা—অসীমের উপলব্ধিতেই সঙ্গীত, অসীমের উপলব্ধিতেই আমরা সৃষ্টিকর্তা। যে সৃষ্টিকর্তা চন্দ্রসূর্যের সিংহাসনে বসে দরবার করছেন তিনি যে গুণীজাতিকে শিরোপা দিয়ে বলেন, 'সাবাস ! আমার সুরের সঙ্গে তোমার সুর মিলছে'—সেই ধন্য, সেই বেঁচে যায়, তাঁর অমৃত সভার পাশে তার চিরকালের আসন পাকা হয়ে থাকে।"

মানব জীবনে সঙ্গীতের এই প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করেই তিনি তাঁর সমকালীন ললিতকলা ও সঙ্গীতবিমুখ শিক্ষাবিদদের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর মত দাঁড়িয়ে শান্তিনিকেতন ও পরে বিশ্বভারতী স্থাপনের সময় পরিষ্কার ভাষায় জানালেন যে, "শিক্ষার এইরূপ সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আমাদের জীবন ক্রমে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছে। অতঃপর একে প্রশ্রয় দেওয়া কোনো মতেই আর উচিত হবে না। আমরা এই যে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনার প্রস্তাব করেছি সেখানে সঙ্গীত এবং ললিত-কলাকে সম্মানের আসন দিতে হবে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন যুগে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সঙ্গীত এবং ললিতকলার যে সব ভিন্ন ভিন্ন রীতি বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে তাকে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তর থেকে উদ্ধার করে এইখানে সংহত করতে হবে।

"এইরূপে আমাদের রসবোধ এবং রুচির আদর্শ যথার্থরূপে গঠিত হয়ে উঠবে। তাহলেই আমাদের সঙ্গীত এবং শিল্পকলা সৌন্দর্যে এবং সম্পদে বিকশিত হয়ে উঠবে। তখন আমরা বিদেশী কলাকে সত্য এবং সংযতভাবে বিচার করবার ক্ষমতালাভ করব এবং তখন তা থেকে ভাব এবং রূপ গ্রহণ করলেও আমরা পরস্বাপহরণের অপবাদভাজন হব না।"

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে তিনি বলেছিলেন, "বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলার শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে এই আমাদের সঙ্কল্প হউক।"

গুরুদেবের সঙ্গীত-চিন্তার মাধ্যমে এতক্ষণ আমরা জানতে পেলাম যে, তিনি ভারতের নানাস্তরের সঙ্গীতকে কী চোখে দেখতেন বা কী ভাবে অনুভব করতেন এবং কী কারণে শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় তার মর্যাদার স্থান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বিশ্বপথিক। তাই বিশ্বভারতী স্থাপন করে বলেছিলেন, এখানে সমগ্র বিশ্ব একনীড়ে বাসা বাঁধবে। সুতরাং, সঙ্গীত-রসিক গুরুদেবের পক্ষে একমাত্র দেশের সঙ্গীত নিয়ে এককোণে পড়ে থাকা সম্ভব নয়। তাই তাঁর সঙ্গীত-চিন্তায় পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গীতের প্রকাশও দেখি। বিশেষ করে, ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের বিষয়ে আমরা তাঁর একাধিক লেখা পাই। সেই সঙ্গীতের চর্চা করেছেন, তা শুনেছেন এবং তা নিয়ে ভেবেছেন। ভারতের সঙ্গে তার বিভেদ বা ঐক্য যদি কোথাও থেকে থাকে তা বোঝবার ও সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন।

ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের প্রকৃতিটিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গুরুদেব বলেছেন :— "পূর্বে যে ইংরেজি সঙ্গীতকে পরিহাস করে আনন্দ লাভ করা গেছে, এখন তার প্রতি মনোযোগ করে ততোধিক বেশি আনন্দ লাভ করা যায়। এখন অভ্যাস-ক্রমে ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের এতটুকু আস্বাদ পাওয়া গেছে যার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে, যদি চর্চা করা যায় তাহলে ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশী সঙ্গীত যে আমার ভালো লাগে সে কথার বিশেষ উল্লেখ করা বাহুল্য। অথচ দুয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ জাতিভেদ আছে তার আর সন্দেহ নেই।

"আমার কাছে ইংরেজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরেজি সঙ্গীত মানব-জগতের সঙ্গীত, আর আমাদের সঙ্গীত প্রকাণ্ড নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় বিষাদগম্ভীর সঙ্গীত। কানাড়া টৌড়ি

প্রভৃতি বড়ো বড়ো রাগিণীর মধ্যে যে গাম্ভীর্য এবং কাতরতা আছে সে যেন কোনো ব্যক্তি-বিশেষের নয়—সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের।

"আমাদের দেশের সঙ্গীতের এই বিশেষত্বটি আমার কাছে বড়ো ভালো লাগে। আমাদের দেশে প্রভাত মধ্যাহ্ন অপরাহ্ন সায়াহ্ন অর্ধরাত্রি ও বর্ষা-বসন্তের রাগিণী রচিত হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরের খাসমহলের গোপন নহবতখানায় যে কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে নব নব রাগিণী বাজিতেছে, আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তা প্রবেশ করিয়াছে। বাহিরের প্রকাশের অন্তরালে যে একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে আমাদের টোড়ি কানাড়া তাহাই জানাইয়া দিতেছে।

"হার্মনি বা স্বরসংগতি ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের প্রধান বস্তু, আর রাগরাগিণীর ব্যাকরণ আমাদের সঙ্গীতের মুখ্য অবলম্বন। বার বার অনুভব করেছি আমাদের সংগীত আমাদের সুখ দুঃখকে অতিক্রম করে চলে যায়। আমাদের বিবাহ-রাত্রিতে রসনচৌকিতে সাহানা বাজে। কিন্তু সেই সাহানার তানের মধ্যে প্রমোদের ঢেউ খেলে কোথায়। তার মধ্যে যৌবনের চাঞ্চল্য কিছুমাত্র নেই ; তা গম্ভীর, তার মীড়ের ভাজে ভাজে করুণা। আমাদের দেশে আধুনিক বিবাহে সানাইয়ের সঙ্গে বিলিতি ব্যাণ্ড বাজানো বড়-মানুষী বর্বরতার একটা অঙ্গ। উভয়ের প্রভেদ একেবারে সুস্পষ্ট। বিলিতি ব্যাণ্ডের সুরে মানুষের আমোদ আহ্লাদের সমারোহ ধরণী কাঁপিয়ে তুলছে ; যেমন লোকজনের ভিড়, যেমন হাস্যালাপ, যেমন সাজসজ্জা, যেমন ফুলপাতা আলোকের ঘটা, ব্যাণ্ডের সুরের উচ্ছ্বাসও ঠিক তেমনি। কিন্তু বিবাহের প্রমোদ সভাকে চারিদিকে বেষ্টন করে যে অন্ধকার রাত্রি নিস্তব্ধ হয়ে আছে, যেখানে লোকলোকান্তরেব অনন্ত উৎসব নীরব নক্ষত্রসভায় প্রশান্ত আলোকে দীপ্তিমান, সাহানার সুর সেইখানকার বাণী নিয়ে প্রবেশ করে। আমাদের সঙ্গীত মানুষের প্রমোদশালার সিংহদ্বারটা ধীরে ধীরে খুলে দেয় এবং জনতার মাঝখানে অসীমকে আহ্বান করে আনে। আমাদের সঙ্গীত একের গান—একলার গান ; কিন্তু তা কোণের এক নয়, তা বিশ্বব্যাপী এক।"

"ইয়োরোপের সঙ্গীত যেন মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। তাই দেখতে পাই, সকল রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া ইয়োরোপে গানের সুর খাটানো চলে। ইয়োরোপের গান আমার হৃদয়কে একদিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত এ সঙ্গীত রোমান্টিক।

রোমান্টিক বলিলে যে *ঠিকটি* কী বুঝায় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু মোটামুটি বলিতে গেলে, রোমান্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্যের দিক, তাহা জীবনসমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক, তাহা অবিরাম গতি চাঞ্চল্যের উপর আলোক ছায়ার দ্বন্দ্বসম্পাতের দিক। ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে।"

"ইয়োরোপীয় সঙ্গীতে ওস্তাদকে অনেক বেশি বাঁধাধরার মধ্যে থাকতে হয়। গানের কর্তা নিজের হাতে সীমানা পাকা করে দেন, ওস্তাদ সেটা সম্পূর্ণ বজায় রাখেন। তাঁকে যে নিতান্ত আড়ষ্ট হযে থাকতে হবে তাও নয়, আবার খুব দাপাদাপি করবেন সে রাস্তাও বন্ধ। ইয়োরোপের প্রত্যেক গানে আছে বিশেষ ব্যক্তিত্ব, ওস্তাদকে সাবধানে গানের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে হয়। এ সঙ্গীতে স্বয়ং রচয়িতার ইচ্ছামতো মাঝে তালে ঢিল পড়ে এবং প্রত্যেকবারেই সমের কাছে গানকে আপন তালের হিসেব-নিকেশ কবে হাঁফ ছাড়তে হয় না। কেননা সমস্ত সঙ্গীতের প্রয়োজন বুঝে রচয়িতা নিজে তার সীমানা বেঁধে দেন, এতেই সুরে তালে রেষারেষি বন্ধ হযে যায়। ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের তালের বোলটা মৃদঙ্গেব মধ্যে নেই, তা হার্মনি বিভাগের গানের অন্তবঙ্গ রূপেই একাসনে বিরাজ করে।

"আমাদের দেশে গান সাধাটাই মুখ্য, সেই গানেই আমাদের যতকিছু দুরূহতা, ইয়োরোপে গলা সাধাটাই মুখ্য, সেই গলার স্বরে তাহারা অসাধ্য সাধন কবে। আমাদের দেশে যাহারা প্রকৃত শ্রোতা তাহারা গান গাওয়াটাকে শুনিলেই সন্তুষ্ট থাকে, ইয়োরোপে শ্রোতারা গান-গাওয়াটাকে শোনে।"

উভয়দেশের সঙ্গীতের মূল পার্থক্যটি লক্ষ্য করেও দুযের মধ্যে মিলন যে একেবারেই অসম্ভব একথা গুরুদেব বলছেন না। তাঁর মতে :—"সঙ্গীতে আমাদের বাইরের সংস্রব প্রয়োজন হয়েছে। ইযোরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ভালো করে পবিচয় হলে আমাদের সঙ্গীতকে আমবা সত্যকাব বড়ো করে ব্যবহার করতে শিখব।

"এশিয়ার প্রায় সকল দেশেই আজ পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গে প্রাচ্য ভাবের মিশ্রণ চলছে। এই মিশ্রণে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা। এই মিলনের প্রথম অবস্থায় দুই ধারার রঙেব তফাতটা থেকে যায়, অনুকরণের জোরটা মরে না। কিন্তু আন্তরিক মিলন ক্রমে ঘটে, যদি সে মিলনে প্রাণশক্তি থাকে—কলমের গাছের মতো নূতনে পুরাতনে ভেদ লুপ্ত হয়ে ফলের মধ্যে রসের বিশিষ্টতা জন্মে।

আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এটা ঘটেছে, সংগীতেও কেন ঘটবে না বুঝিনে। যে চিত্তের মধ্যে দিয়ে এই মিলন সম্ভবপর হয় আমরা সেই চিত্তের অপেক্ষা করছি। ইয়োরোপীয় সাহিত্যচর্চা প্রাচ্য শিক্ষিত সমাজে যে পরিমাণে অনেকদিন ধরে অনেকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে, ইয়োরোপীয় সংগীতচর্চাও যদি তেমনি হতো তা হলে নিঃসন্দেহই প্রাচ্য সংগীতে রস-প্রকাশের একটি নূতন শক্তি সঞ্চার হতো।

"...আমাদের রাগরাগিণী স্বরসংগতিকে স্বীকার করেও আত্মরক্ষা করতে একেবারেই পারে না একথা জোর করে কে বলতে পারে? সৃষ্টির শক্তি কী লীলা করতে সমর্থ, কোনো-একটা বাঁধা নিয়মের দ্বারা আমরা আগে হতে তার সীমা নির্ণয় করতে পারিনে। কিন্তু, সৃষ্টিতে নূতন রূপের প্রবর্তন বিশেষ শক্তিমান প্রতিভার দ্বারাই সাধ্য, আনাড়ির বা মাঝারি লোকের কর্ম নয়। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের যেমন, তেমনি তার সঙ্গীতেরও মস্ত একটা সম্পদ আছে। সে যদি আমরা বুঝতে না পারি, তবে সে আমাদের বোধশক্তিরই দৈন্য; যদি তাকে গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব হয়, তবে তার দ্বারা আভিজাত্যের প্রমাণ হয় না।"

"তবে কিনা ইহাও নিশ্চিত যে, আমাদের গানে হার্মনি ব্যবহার করিতে হইলে তার ছাঁদ স্বতন্ত্র হইবে। অন্তত মূল সুরকে যদি ঠেলিয়া চলিতে চায় তবে সেটা তার পক্ষে আস্পর্ধা হইবে।

"আমাদের গানের বিপুল তান কর্তব ঐ হার্মনি বিভাগে চালান করিয়া দিলে মূল গানটার সহজ স্বরূপ ও গাম্ভীর্য রক্ষা পায়, অথচ তার গতিপথ খোলা থাকে।"

বাঙালী জীবনে বিলাতী সংস্কৃতির প্রভাব

কলকাতা শহরে ইংরেজরা ভালভাবে এবং নিশ্চিন্তে বসবাসের সুযোগ পায় পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর থেকে। বলতে গেলে তার পরই তারা প্রকৃত পক্ষে বাঙলাদেশের রাজা হয়ে বসলো। এর পরে নবাবেরা যে ক'দিন ছিলেন সে ক'দিন ইংরেজদের খুশিমতই ওঠ্বোস করেছেন মাত্র, ক্ষমতা তাঁদের প্রায় কিছুই ছিল না। স্বভাবতই কলকাতার ইংরেজদের জীবনযাত্রার ঢং বদলে গেল। প্রচুর টাকা হাতে এল প্রায় সকলের। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল তাঁদের সমাজে নৃত্য, গীত, থিয়েটার ইত্যাদির দ্বারা চিত্তবিনোদনের প্রবল ইচ্ছা। গড়ে উঠতে লাগল বহু অর্থ ব্যয়ে শখের সঙ্গীতের ক্লাব ও থিয়েটারের দল। কলকাতায় সর্বপ্রথম বিলিতী আদর্শের থিয়েটার স্থাপিত হল ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। ইয়োরোপীয় যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠ-সঙ্গীতের ক্লাব, ইয়োরোপীয় নর্তকীদের নাচ, অপেরা, বলনাচ, সামরিক ব্যাণ্ড ইত্যাদির চর্চা ভালভাবেই চলতে থাকে। ইংলণ্ড থেকে গাইয়ে-বাজিয়ে, নর্তক-নর্তকী এবং অভিনেতাদেরও আনা হতো। আরম্ভে বহু বৎসর পর্যন্ত শখের দলই ছিল প্রধান। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপ একটি শখের থিয়েটারে সেক্সপীয়রের "হ্যামলেট", "কিং লীয়র", "ওথেলো", "রিচার্ড দি থার্ড" ইত্যাদি বিখ্যাত নাটকগুলি ভালোভাবেই অভিনীত হয়েছে। এর পূর্বে ইয়োরোপীয়দের থিয়েটারে মহিলাদের স্থান ছিল না। মেয়েদের ভূমিকায় পুরুষেরাই অভিনয় করতো মেয়ে সেজে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইয়োরোপের মহিলারা প্রথম পুরুষদের সঙ্গে থিয়েটারে অভিনয় করার অনুমতি পেল। তখনকার দিনে ইয়োরোপীয়দের অবসর বিনোদনের একমাত্র উপায় ছিল, ক্লাবে গিয়ে কনসার্ট ও গান শোনা বা থিয়েটারে অভিনয় দেখা। পেশাদার নর্তকীদের নাচ হতো প্রায়ই। কনসার্টে খ্যাতনামা রচয়িতাদের সিম্ফনি, সোনেটা ইত্যাদি নানা প্রকার বাজনা খুবই প্রশংসা পেত।

১৭৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ বাংলাদেশের থিয়েটারের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। হেরাসিম লেবাদেভ নামে রুশ দেশীয় একজন সঙ্গীতজ্ঞ-ব্যাণ্ডমাস্টার কলকাতায় এসে দুটি ইংরাজী নাটকের বাংলা অনুবাদ করিয়ে বাঙ্গালী নট ও নটীদের দিয়ে

অভিনয় করিয়েছিলেন। নাটকের অনুবাদ ও ভারতচন্দ্রের কবিতার সুর দিয়ে সাহায্য করেন লেবাদেভের প্রধান সহকারী গোলকনাথ দাস নামে একজন বাঙ্গালী।৮ এই নাটকের অভিনয় দেখতে বাঙ্গালী সমাজের বহু লোক এসেছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে।

ঊনবিংশ শতকের একেবারে আরম্ভে কলকাতার আশেপাশে অর্থাৎ চন্দননগর, খিদিরপুর, দমদম প্রভৃতি শহরের ইয়োরোপীয়রাও শখের কনসার্ট ও থিয়েটারের দল তৈরি করে নিজেদের চিত্তবিনোদনের সুব্যবস্থা করতেন।

ইয়োরোপীয় সমাজের নর ও নারীদের মধ্যে গান-বাজনা ও নাটকের অভিনয় দেখে সময় কাটানোর আকাঙ্ক্ষা কতখানি প্রবল ছিল তা জানা যায় তাঁদেরই নানা প্রকার চিঠিপত্র থেকে। একজন ইংরেজ মহিলা কলকাতা থেকে নিজের দেশে চিঠিতে জানাচ্ছেন—

"শীতকালে কনসার্ট বলনাচ হয়। টিকেট করে যেতে হয়। বিচিত্র সব সঙ্গীত আসর আমরা উপভোগ করছি। সন্ধ্যাবেলা থিয়েটারে যাওয়ার চেয়ে ভাল সময় কাটানোর আর কিছু নেই।"

কলকাতায় কেবলমাত্র ইংরেজরাই গান বাজনা ও অভিনয়ে প্রধান ভূমিকা যে নিতেন তা নয়, ইতালীয় এবং জার্মান দেশীয়রাও অনেকে ছিলেন সে দলে। তাঁদেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিলক লকাতার ইয়োরোপীয়দের সঙ্গীত সমাজে।

এই যুগের ইংরেজদের উৎসব দিনের খানাপিনার সঙ্গে গান-বাজনা, বলনাচ, নর্তকীদের নাচ, থিয়েটার, ফ্যান্সি ড্রেস, ব্যাণ্ড ইত্যাদির খুবই জাঁকজমক ছিল। তাঁদের দেখাদেখি কলকাতার ভারতীয় ধনী সমাজ বিশেষ অনুষ্ঠানে বা ভোজে নিমন্ত্রিত বিদেশী রাজপুরুষদের চিত্তবিনোদনের জন্যে বিদেশী আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করতেন প্রচুর অর্থব্যয়ে। কলকাতার বাইরের ধনী জমিদার সম্প্রদায়ও যে এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকতে চাননি তা জানা যায় কৃষ্ণনগরের জমিদারদের ইতিহাস থেকে। তাতে আছে, "ইংরাজী বাদ্য (ব্যাণ্ড), পূর্বে এ দেশস্থ লোকের মধ্যে, কেবল কলিকাতার নিকটস্থ স্থানবাসী ফ্রিঙ্গীরা জানিত। বহু ব্যয়সমর্থ না হইলে দূরবর্তী লোকেরা তাহাদিগকে আনিতে পারিত না। এই রাজবংশোদ্ভব রাজা গিরীশচন্দ্র (শাসনকাল—১৮০২-১৮৪১), কলিকাতার একদল ইংরাজ বাদ্যকর কৃষ্ণনগরে আনিয়া, চর্মকার জাতীয় কয়েকজনকে তাঁহাদের দ্বারা শিক্ষা দেওয়ান।"

তখনকার দিনে ইংরেজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারে বা সঙ্গীতের ক্লাবের সঙ্গে

বাঙ্গালীদের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। সবই ছিল সম্পূর্ণ রূপে ইংরেজদের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা যখন 'দি চৌরঙ্গী থিয়েটার' নামে একটি অ্যামেচার অভিনয় সংস্থা গঠন করলেন তখন দেখা গেল তার পরিচালক-মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে। এদিক থেকে সে যুগে তিনিই বোধ হয় একমাত্র বাঙালী। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এর সদস্য রূপে তাঁকে দেখতে পাই। ঋণের দায়ে থিয়েটারটি যখন প্রায় বন্ধ হতে বসেছে তখন দ্বারকানাথ ৩০ হাজারের উপর টাকা দিয়ে নিলাম থেকে ডেকে নিয়ে থিয়েটারটিকে বাঁচিয়ে দেন। কয়েক বছর পরে (১৮৩৯) আগুন লেগে থিয়েটার গৃহটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। প্রথমবার বিলেত ভ্রমণের পূর্বে দ্বারকানাথ 'লুইস্' নামক আর একটি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজদের থিয়েটারের প্রভাব কলকাতার অন্যান্য ধনী বাঙ্গালীদের মধ্যেও পড়েছিল। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীর প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন এর উৎসাহীদের মধ্যে প্রধান। তিনি "হিন্দু থিয়েটার" নাম দিয়ে একটি শখের নাটকের দল গঠন করেন। সেখানে ইংরাজী ভাষার নাটকেরই অভিনয় হতো। হিন্দু থিয়েটার ১৮৩১ থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ভালভাবেই চলেছিল। এ ছাড়া ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আর একদল বাঙ্গালী ইযোরোপীয় থিয়েটারের অনুকরণে "বিদ্যাসুন্দর" নামে একটি বাংলা নাটকের অভিনয় করান। এই অভিনয়ের বিষয়ে সে যুগের সংবাদপত্র যা জানাচ্ছে তা এখানে উল্লেখযোগ্য। তাতে আছে—

"Vidyasundar in Bengali, after the English fashion, it commenced with mu ic of orchestra which was very pleasing. The native musical Instruments, such as the Sitar, the Sarangi, the Pakhwaj and others, were played by Hindus, almost all Brahmin, and among them the Violin was managed by Brajonath Goswami."

উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিংশ শতকের প্রায় প্রথমার্ধ পর্যন্ত কলকাতার বাংলা থিয়েটারে অতি প্রচলিত এবং বাংলা যাত্রাভিনয়ে এখনো আমরা যা শুনি, সেই অর্কেষ্ট্রা বাজনার সূত্রপাত ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের এই "বিদ্যাসুন্দর" নাটকটির অভিনয় কালেই প্রথম হয়েছিল বলেই অনুমান করি। সংবাদটির আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো ব্রজনাথ গোস্বামীর বেহালার বাজনা। এর পূর্বে বাঙালী কখনো বেহালা বাজিয়েছিল কিনা তার কোনো খবর জানা যায় না। ব্রজনাথ

কি ভাবে বেহালা বাজাতে শিখলেন তার কোনো সংবাদ আমরা পাই না। তবে এটুকু জানা গেছে যে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার ইংরাজদের এক ক্লাবে মাসিক ৮ টাকা থেকে ১৬ টাকা বেতনে নামকরা শিক্ষকদের কাছে ইয়োরোপীয় গান বাজনা শেখা যেতো। এছাড়া সে যুগের ধনী বাঙ্গালীরাও নিজেদের বাড়িতে আলাদা শিক্ষক নিযুক্ত করতেন ইয়োরোপীয় সঙ্গীত শিক্ষার্থে।

তখনকার দিনে ইংরেজদের সঙ্গে বাঙালীদের অভিনয় করার কোন সুযোগ ছিল না। ইংরেজরা নিজেদের সমাজ থেকে লোক বেছে অভিনয় করাতেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এর ব্যতিক্রম ঘটে। এবারেই প্রথম একটি সুদর্শন বাঙালী যুবক ইংরেজদের সঙ্গে অভিনয়ে যোগ দেন। সেক্সপিয়রের বিখ্যাত নাটক "ওথেলোতে" একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রের অভিনয় করে তিনি দেশী ও বিদেশী দর্শক সকলকেই মুগ্ধ করেছিলেন। নাটকটির অভিনয় হয়েছিল ইংরেজ পরিচালিত "সাঁ-সুচী" নামক থিয়েটারে। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটির পরই বাঙালীদের মধ্যে ইংরাজী প্রথায় বাংলা নাটকের প্রতি প্রবল উৎসাহ দেখা দেয়। বাংলাভাষার নতুন নাটক নতুন আদর্শে ধনী সমাজের শখের দলের দ্বারা অভিনীত হতে থাকে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে ৩১শে জুলাই অভিনীত হল "রত্নাবলী" নামে একটি নাটক। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরই ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। পাইকপাড়ার ধনী জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ ছিলেন সহযোগী। যতীন্দ্রমোহন ইয়োরোপীয় থিয়েটারের অনুরূপ দেশী অর্কেষ্ট্রা দল গঠন করার ভার দিয়েছিলেন তাঁদের পরিবারের সঙ্গীতগুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পালের উপর। ঐকতান উপযোগী দেশী রাগরাগিণী অবলম্বনে গৎও রচনা করলেন তাঁরা। এই কনসার্টে দেশী যন্ত্রের সঙ্গে ইয়োরোপীয় যন্ত্রাদিও ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রীরা ইয়োরোপীয় বাদকদের প্রথায় গৎগুলিকে নব-প্রবর্তিত বাংলা স্বরলিপিতে কাগজে লিখে, সামনে রেখে, দেখে বাজাতেন। এই কনসার্ট থেকেই বাংলাদেশে প্রথম বাংলা স্বরলিপির উদ্ভব। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিজে কলকাতাবাসী ইংরেজদের থিয়েটার, অপেরা ও অন্যান্য সঙ্গীতানুষ্ঠানে সর্বদাই যোগ দিতেন। সেইসব দেখে এবং শুনে রত্নাবলী নাটকের অভিনয়কালে দেশী কনসার্টকে নাটকে ব্যবহার করতে উৎসাহী হন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অর্কেষ্ট্রার পর এই রত্নাবলী নাটকেই আর একবার নতুন করে অর্কেষ্ট্রা বাজনার উৎসাহ দেখা দিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন যখন নিজবাটীতে একটি শখের থিয়েটার ও কনসার্টের দল গঠন করেন তখন তাতে

দেশী যন্ত্রের সঙ্গে বিদেশী যন্ত্রাদিও ব্যবহার করা হতো।

যেমন:—২টি বেহালা, ২টি টেনর, ২টি ফ্লুট, ১টি ভায়লিন সেলো, ১টি ক্লারিয়োনেট ও ১টি ডবলবাস। এ ছাড়া আরো জানা যায় যে, যতীন্দ্রমোহনের ভ্রাতা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইয়োরোপীয় সঙ্গীতকে ভাল করে জানবার আগ্রহে একটি জার্মান দেশীয় সঙ্গীতজ্ঞকে নিজবাড়িতে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করে ইয়োরোপীয় সঙ্গীত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নিজে সঙ্গীত শিখেছিলেন, বাড়ির ছেলেদেরও শিখিয়েছিলেন এবং তাঁরই উৎসাহে, তাঁর সঙ্গীত গোষ্ঠীর প্রথম দিককার ছাত্র কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও দক্ষিণাচরণ সেনকে তা ভাল করে শেখবার সুযোগ দিয়েছিলেন। সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর যে ভাল করেই ইয়োরোপীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের চচা করেছিলেন তা জানা যায় তাঁর রচিত বিপুল সংখ্যায় বাংলা ও ইংরাজী ভাষার সঙ্গীত পুস্তকগুলিতে। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "গীত সূত্রসার" বইটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সহজেই অনুভব করতে পারবেন যে, ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের কতখানি গভীর অনুশীলন ও অধ্যয়নের পর এই বইটি রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। দক্ষিণাচরণ সেনের দ্বারা গঠিত ভারতীয় অর্কেষ্ট্রাদল কলকাতায় উনবিংশ শতকের শেষার্ধে শ্রেষ্ঠদলরূপে পরিচিত ছিল। দেশী যন্ত্রের ঐকতান বাজনার দল গঠন করে তিনি সে যুগে যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা সম্ভব হতো না ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের গভীর জ্ঞান ছাড়া।

কলকাতার ধনী বাঙ্গালীদের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত শখের থিয়েটারের যুগ শেষ হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে, গিরীশ ঘোষ ও অমৃতলাল বসু প্রভৃতির চেষ্টায়। তখন থেকেই পেশাদারী থিয়েটারের সূত্রপাত। তাঁরা এই থিয়েটারের নাম দিয়েছিলেন "ন্যাশনাল থিয়েটার"। অমৃতলাল বলেছেন বিদেশাগত পেশাদারী নাটক ও অপেরার দলের অভিনয় ও গান শুনে তিনি ও তাঁর মতো একদল যুবক খুবই উৎসাহিত হন ঐ প্রকারের পেশাদারী থিয়েটারের দল গঠন করতে। তারই ফলে স্থাপিত হয়েছিল "ন্যাশনাল থিয়েটার"। কয়েক বছর পর এই থিয়েটারের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে প্রথম ইতালীয় অপেরার হুবহু অনুকরণে বাংলা ভাষায় একটি গীত-নাটকের অভিনয় হয়। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত এই নাটকটি বাংলার নাট্য ইতিহাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তার একটি কারণ হলো, এই প্রকারের গীত-নাটক বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম। আর দ্বিতীয় কারণ হলো যে, এই নাটকই পূজনীয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গীতি-নাটক "বাল্মীকি প্রতিভা" রচনার পথ সহজ করেছিল। ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত এই গীতি–

নাটকটির বিষয়ে সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বর্ণনার অংশ বিশেষ তুলে দিচ্ছি।

"গত কয় বর্ষ ধরিয়া—জাতীয় নাট্যশালায় "সংস্কৃত যাত্রা" যাহা অপেরা নামে অভিনীত হইয়া আসিয়াছে, অধ্যক্ষগণ এক্ষণে তৎপরিবর্তে প্রকৃত গীতাভিনয় প্রদর্শন জন্য অগ্রসর হইয়াছেন।

"পেশাদার যাত্রায় যেমন দুই একটি কথা এবং তৎপরেই গান থাকে, এতদিন সেই প্রণালীর অপেরা বা যাত্রা অভিনীত হইতেছিল; অধ্যক্ষ সমাজ এক্ষণে ইটালীয়ান অপেরার ন্যায় আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সমস্তই সংগীত দ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তর, স্বগত বিলাপযুক্ত প্রকৃত গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, এরূপ প্রথা বঙ্গীয় নাট্য সমাজে সম্পূর্ণ নূতন এবং সেই কারণে অভিনয় পক্ষে কঠিনও হইয়াছে।

"…গত শনিবার রজনীতে "কামিনীকুঞ্জ" নামক উক্তবিধ নূতন গীতিকাব্যের অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এরূপ প্রকারের অভিনয় এই প্রথম হওয়ায়, শত শত দর্শকে নাট্যশালা পূর্ণ হইয়াছিল।

"…নায়িকা শ্রীমতী কাদম্বিনী…ইহার স্বর যেরূপ উচ্চ, সুন্দর, সেইমতো মুগ্ধকর। ইনি নৃত্য এবং গীত দ্বারা দর্শক মাত্রকেই মুগ্ধ করিয়াছিলেন।"

নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হবার পর সংবাদপত্রের চিঠিপত্র অংশের একটি চিঠিও এখানে উল্লেখযোগ্য। চিঠিতে দর্শক জানাচ্ছেন—

"ইতিপূর্বে আমরা অনেক নাট্যরসিকের অভিনয়ে নাট্যশালায় উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু এ প্রকার নূতন কাণ্ড কখনই দৃষ্টিগোচর হয় নাই।…আমরা ভরসা করি, এই জাতীয় নাট্যশালার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এইরূপ রুচিকর উত্তম উত্তম বিষয়ের অবতারণা দ্বারা সাধারণের মনোহরণ করুন।

"যদি "কামিনীকুঞ্জ" নাট্যরসিক-মধ্যে প্রত্যেক গীতের অবসর স্থানে বাক্‌চাতুর্য থাকিত তাহা হইলে সেদিন নাটকাভিনয় সম্বন্ধে একটি যুগান্তর উপস্থিত হইত।"

এই চিঠিটির প্রতিবাদ করলেন সম্পাদক নিজে। উত্তরে তিনি লিখছেন—

"দর্শক মহাশয়ের রুচি বিভিন্ন দেখিতেছি। গীতের অবসর স্থানে "বাকৃচাতুর্য" থাকিলে তাহাকে প্রকৃত গীতাভিনয় বলা যায় না। তাহা সংস্কৃত যাত্রা মাত্র। নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ বিজ্ঞাপন দেন যে "কামিনীকুঞ্জ" ইটালীয়ান অপেরা অনুসারে রচিত, বাস্তবিক তাহাই যথার্থ।"

এই ঘটনা থেকে এটুকু বেশ বোঝা যায় যে, পুরোপুরি গীত-নাটক—যাকে

ইংরাজী ভাষায় বলে অপেরা, বাংলাদেশে তা এই বারেই প্রথম রচিত ও অভিনীত হয়।

কলকাতায় শখের থিয়েটারের আরম্ভকাল থেকেই ইয়োরোপীয় নাটকের প্রভাবে রচিত দেশী-গতের কনসার্ট ছিল নাটকের একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ। তার জন্যে ধনীদের বহু অর্থ ব্যয়ে বাজনার দল ও ব্যাণ্ডমাস্টার নিযুক্ত করতে হতো। বিদেশী যন্ত্রের যন্ত্রীদের অভাব মোচনের প্রয়োজনে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে। সেখানে একমাত্র কাজ ছিল ঐকতান দল গঠন করা এবং দলের প্রয়োজনে যুবকদের শিখিয়ে নেওয়া। পেশাদারী থিয়েটারের যুগে, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে "অমৃতবাজার পত্রিকা"-য় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে আমরা সেইরূপ একটি খবর পাই। তাতে জানানো হচ্ছে যে—

"বহুবাজার ঐক্যতান সমাজ ৪।৫ বৎসর যাবৎ গুরুতর পরিশ্রম করিয়া ইংরাজী যন্ত্রসকল বাদন করিতেছেন। পাঁচজন লোক আবশ্যক হইয়াছে। পিয়ানো, হারমোনিয়ম, কন্সর্টিনা, সিক্রেফ্লুট ও ফ্লাটফ্লুট। অধ্যক্ষ (ব্যাণ্ডমাস্টার) পার্বতী-চরণ দাশ শিক্ষা দিবেন।"

এই সব বিবরণ থেকে এটুকু বেশ বোঝা যায় যে, ইয়োরোপীয় সমাজের যোগাযোগে কলকাতার বাঙ্গালীরা অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে বিলিতী নৃত্য, গীতবাদ্য ও অভিনয়ের এক সম্পূর্ণ নূতন ধারার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন, পরে ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় দেখা দেয় এর চর্চার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ এবং এই শতাব্দীর শেষার্ধে দেখা গেল ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় দুই ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যাপক প্রচেষ্টা। তারই ফলে দেখা দিয়েছিল, দেশী ও বিদেশী যন্ত্রে দেশীগতের অর্কেস্ট্রা, বাংলা ভাষায় গান ও নাচবহুল বিয়োগান্ত নাটক, বাংলা-ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত, বাংলা স্বরলিপির উৎপত্তি, ইয়োরোপীয় স্বরলিপিতে ভারতীয় সঙ্গীত গ্রন্থ, যাত্রা ও থিয়েটারে কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে নানারূপ ইয়োরোপীয় বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার, আর ইটালীয়ান অপেরার অনুকরণে বাংলা গীত-নাট্য। স্থাপিত হলো মিউজিক্ আকাডেমী, সঙ্গীত-শিক্ষার কলেজ ও স্কুল। বাঁকুড়া জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজ সরকার ভারতীয় সঙ্গীত শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। শেখানোর সুবিধার্থে গানের বই রচনা করে দিয়েছিলেন মহারাজ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিজে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিল কলকাতার শিক্ষিত ধনীদের মধ্যে অন্যতম। কলকাতার বাঙ্গালী ও ইয়োরোপীয় উভয় সমাজে সম্মানের অধিকার লাভে সমর্থ

হন এই বংশে প্রথম, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর। তাঁর জন্ম ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। যুবা বয়সেই তিনি শিক্ষায়, ধনেমানে ও সম্মানে কলিকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত। ইয়োরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি-প্রীতি ছিল তাঁর প্রবল। ইয়োরোপীয় সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কতখানি গভীর ছিল তা স্পষ্ট জানা যায় তাঁর জীবনী থেকে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে একজন ইংরেজ কলকাতায় থাকাকালীন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে যেভাবে দেখেছিলেন ও জেনেছিলেন, দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর নিজের স্মৃতিকথায় তিনি তার একটি বর্ণনা রেখে গেছেন। তাতে আছে—

"Dwarakanath had the good taste to appreciate European music and theatricals, and so quickly became enamoured of Italian Opera, when in his own country, that he engaged one of the travelling artists to give him lesson in singing. No wonder, therefore, that he yielded to the intoxication of similar delight on a large scale when he arrived in England."

দ্বারকানাথ জোড়াসাঁকোর বসতবাড়ী তৈরি করে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের রাত্রিতে বহু দেশী ও বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করেন। তাঁদের চিত্তবিনোদনের জন্যে ইংরাজী বাদ্য ও নৃত্যের আয়োজন করেছিলেন। অতিথিরা এতে যোগ দিয়ে খুশি হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন, সে খবর তখনকার দিনের সংবাদ-পত্রের বিবরণে পাওয়া যায়।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের একটি বাগানবাড়ি ছিল কলকাতার বেলগাছিয়ায়, "বেলগাছিয়া ভিলা" নামে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই পর্যন্ত তা ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সম্পত্তি। সেই বাড়ি পরে নিলামে ডেকে নেন পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর। এই ভিলায় ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দ্বারকানাথ সপরিষদ বড়লাটকে নিমন্ত্রণ করেন। সেদিন সঙ্গীত পরিবেশনের জন্যে নিযুক্ত ছিলেন কলকাতার সেরা ইয়োরোপীয় গাইয়ে ও বাজিয়ের দল—লিস্টন, মিস হার্ভে, সিয়েমনি। ফরাসী অপেরার অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও এসেছিলেন অনেকে—রুবি, ম্যাডাম লে মেরি, ওয়ালতে, টন। বড়লাটের নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় গানবাজনা দিয়ে, মাঝে খাওয়াদাওয়ার পর শুরু হয় বিলিতী নাচ—ওয়াল্টজ, কোয়াড্রিল, গ্যালপ।

লর্ড অকল্যাণ্ড যখন বড়লাট হয়ে এলেন, তখন তাঁকেও দ্বারকানাথ এইভাবে নিমন্ত্রণ করেন।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারিতেও মিস এমিলি ইডেনের সম্মানে দ্বারকানাথ নাচ ও সান্ধ্যভোজের আয়োজন করেন এই ভিলায়। রাত দুপুর পর্যন্ত নাচ চলেছিল। পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে এ-বিষয়ে লিখেছেন—"আমাদের বেলগাছিযার বাগানে অসামান্য সমারোহে গবর্নর জেনারেলের ভগিনী মিস ইডেন প্রভৃতি অতি প্রধান প্রধান বিবি ও সাহেবদিগের এক ভোজ হয। রূপে, গুণে, পদে, সৌন্দর্যে, নৃত্যে, মদ্যে, আলোকে আলোকে বাগান একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল।" এছাড়া একটু আগেই আমরা আলোচনার দ্বারা জেনেছি যে, কলকাতার ইংরেজদের শখের থিয়েটারের দলের পৃষ্ঠপোষকরূপে ইংরেজ সমাজের সঙ্গে দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠতার বিবরণ।

দ্বারকানাথ যখন প্রথমবার (১৮৪২) ইংলণ্ডে যান তখন তাঁকে দেখাশোনার জন্যে যাঁদের তিনি সঙ্গে নিয়ে গিযেছিলেন তার একটি তালিকা তাঁরই পৌত্র, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক চিঠি থেকে আমরা জানতে পাই। তিনি লিখছেন—

"He (Dwarakanath) had 17 servants with him, among whom were two native servants. He had with him besides a secretary, one interpreter, a German musician, and another gentleman, who with his physician Dr. Martin would make a party of five. These were his constant companions."

দ্বারকানাথের এই দলে জার্মান মিউজিশিযানও যে একজন সবসময়ের জন্যে নিযুক্ত ছিলেন সেটিও এখানে লক্ষ্য করার বিষয়। বিলাতে বাসকালে ভারত-তত্ত্ববিদ ম্যাক্সমূলরের সঙ্গে দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। ম্যাক্সমূলর তাঁর স্মৃতিকথায দ্বারকানাথের সঙ্গীত-জীবনের একদিনের একটি ঘটনার বড় সুন্দর একটি বর্ণনা রেখে গেছেন। তিনি লিখছেন—

"দ্বারকানাথ অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয ছিলেন এবং ইটালীয় ও ফরাসী সঙ্গীত খুব পছন্দ করতেন। তিনি গান করতেন আর আমি সেই গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতাম—এই ভাবে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দে কেটে যেতো। তিনি বেশ সুকণ্ঠ ছিলেন। একদিন আমি তাঁকে বললাম, একটি খাঁটি ভারত-সঙ্গীত গাইতে, তাতে তিনি যে গানটি প্রথমে গাইলেন, সেটা ঠিক ভারতীয় নয়,

পারসিক গজল এবং আমিও তাতে বিশেষ মাধুর্য পেলাম না। খাঁটি ভারতীয় সঙ্গীত গাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তিনি মৃদু হেসে বললেন; 'তুমি তা উপভোগ করতে পারবে না।' তারপর আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য একটি গান নিজে বাজিয়ে গাইলেন। সত্য বলতে কি, আমি বাস্তবিকই কিছু উপভোগ করতে পারলাম না। আমার মনে হলো যে, গানে না আছে সুর না আছে ঝঙ্কার, না আছে সামঞ্জস্য। দ্বারকানাথকে এই কথা বলায় তিনি বললেন, "তোমরা সকলেই এক রকমের। যদি কোন জিনিষ তোমাদের কাছে নতুন ঠেকে বা প্রথমেই তোমাদের মনোরঞ্জন করতে না পারে, তোমরা অমনি তার প্রতি বিমুখ। প্রথম যখন আমি ইটালীয় গীতবাদ্য শুনি, তখন আমিও তাতে কোনো রস পাইনি, কিন্তু তবু আমি ক্ষান্ত হইনি ; আমি ক্রমাগত চর্চা করতে লাগলাম যতক্ষণে না আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলাম। সকল বিষয়েই এই রূপ'।"

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার বিলাত ভ্রমণকালে একটি অর্গান যন্ত্র কিনে দেশে পাঠিয়ে চিঠিতে লিখেছিলেন :

"অর্গানের বারেলগুলি বসাইবার আগে বাবিং ইয়ংকে দিয়া দেখাইয়া নেওয়া ভালো। ওর কয়েকটায় দেশী সুর বসানো, বাকীগুলো নতুন অপেরার।"*

দ্বারকানাথের এই জীবনী থেকে এটুকু পরিষ্কার জানা যায় যে, এই বংশে ইয়োরোপীয় সংগীত চর্চার প্রথম উৎসই হলেন তিনি নিজে। নিষ্ঠার সঙ্গেই তার চর্চা তিনি করেছিলেন। সেই ধারা তাঁর বংশে পরবর্তী যুগেও প্রবাহিত ছিল এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যেও সেই প্রবাহের পরিচয় আমরা পাচ্ছি। দ্বারকানাথের মৃত্যু হয় ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে, ইংলণ্ডে।

দ্বারকানাথের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয় সঙ্গীত-প্রীতির কথা আমরা ভাল করেই জানি। কিন্তু তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ইয়োরোপীয় প্রথায় পিয়ানো বাজাবার শিক্ষা সাহেব মাস্টার রেখে কিছুকাল করেছিলেন বলেও জানা যায়। দেবেন্দ্রনাথ বিলিতী যন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন বলেই ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা প্রণালী নূতন করে প্রবর্তিত হবার পর কোনো এক সময়ে "একর্ডিয়ান" নামে বিদেশী যন্ত্রটি দিন কতক ব্যবহার করা হয়েছিল ব্রহ্ম সঙ্গীতের সঙ্গে। এই যন্ত্রটির ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায় কলকাতায় হারমোনিয়ম যন্ত্রটি চালু হবার পর।

দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পিয়ানো যন্ত্রটি বাজাতে শিখেছিলেন, কিন্তু তাঁর গানের গলা ছিল না। তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্যে

একটি পিয়ানো ছিল। পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং তাঁর ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ হারমোনিয়ম যন্ত্রটি বাজাতে শিখে ব্রাহ্ম সমাজে সঙ্গীতের সঙ্গে তার সঙ্গত করতেন। গুরুদেব দ্বিজেন্দ্রনাথের বিষয়ে বলেছেন—তিনি "গান গাইতে পারতেন না, বিলিতী বাঁশী বাজাতে পারতেন, কিন্তু সে গানের জন্য নয়, অঙ্ক দিয়ে এক-এক রাগিণীতে গানের সুর মেপে নেবার জন্য।"

সুর মেপে নেওয়া কথাটির মধ্যে একটু তাৎপর্য আছে। ইয়োরোপের শব্দ-বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে, সমব্যবধানের কম্পনজনিত যে ধ্বনি আমাদের কানে আমরা শুনি সেইটিই হলো সঙ্গীতধ্বনি। প্রত্যেক সেকেণ্ডে ১৬টি কম্পন থেকে আরম্ভ করে ৪৮০০০ পর্যন্ত কম্পনজনিত ধ্বনি আমাদের কর্ণগোচর হয়। এর কম বা এর বেশী কম্পনযুক্ত ধ্বনি শোনা যায় না। পুরুষকণ্ঠে ১৯০ থেকে ৬৭৮ পর্যন্ত এবং স্ত্রীকণ্ঠে ৫৭২ থেকে ১৬০৬ পর্যন্ত কম্পনজনিত ধ্বনি প্রকাশিত হয়। যাঁর কণ্ঠে উদারা গ্রামেব সর্বনিম্ন সুর "সা" বের হয় তাতে ২৫৬ কম্পন আছে। রে—২৮৮, গা—৩২০, মা—৩৪১, পা—৩৮৪, ধা—৪২৬, নি—৪৮০টি কম্পন আছে। এইভাবে উদারার সুরকে দ্বিগুণিত করলে পরে "মুদারার" এবং চতুর্গুণ কম্পনে পাব "তারা" গ্রামের। সুরগুলিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বিলিতী সঙ্গীত শাস্ত্রের ধ্বনিতত্ত্ব পড়ে ভারতীয় রাগরাগিণীর শুদ্ধ, কড়ি ও কোমল সুরগুলির কম্পন কত হবে তারই পরীক্ষা কবতেন বাঁশীতে সুর বাজিয়ে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুব পিয়ানো, বেহালা, হারমোনিয়ম, অর্গান ইত্যাদি যন্ত্রগুলি ভালভাবেই বাজাতে সমর্থ ছিলেন। তিনি পিয়ানোতে এক একটি দেশী রাগরাগিণীর গৎ নিযে ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের আদর্শে নানা ছন্দে, নানা লয়ে এবং শব্দের গুরুত্ব ও লঘুত্বের দ্বারা রাগিণীটিকে কবিতার মতো চলনশীল ভাবের অনুগামী করে তুলতে চেষ্টা করতেন।

গুরুদেবের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথও ছিলেন সঙ্গীতের অত্যন্ত অনুরাগী। নিজের ছেলেমেয়েদের ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ইয়োরোপীয় যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীতের শিক্ষারও সুব্যবস্থা করেছিলেন। হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভাদেবীর বিষয়ে গুরুদেব বলছেন—

"বাল্যকালে প্রতিভা ও আমি এক সঙ্গে মানুষ হয়েছিলুম। সেজদাদা প্রতিভাকে বিলিতি সঙ্গীতে পাকা করে তুললেন। তাতে করে তাকে দিশি গানের পথ ভুলিয়ে দেওয়া হয়নি সে আমরা জানি।

"বিলিতি সঙ্গীতের গুণ হচ্ছে তাতে সুর সাধানো হয় খুব খাঁটি করে।

কানদোরস্ত হয়ে যায়, আর পিয়ানোর শাসনে তালেও ঢিলেমি থাকে না।"

প্রতিভাদেবীর ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের চর্চা কতখানি পাকা ছিল, সে কথা বলতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলছেন—"তিনি (প্রতিভাদেবী) পিয়ানোয় বাজাতেন ওস্তাদী বিলেতী বাজনা। বেঠোভেনের 'Funeral March' ও 'Moonlight Sonata' আমি অন্তত হাজারবার শুনেছি।" ইন্দিরাদেবী বলেছেন—"তাঁর (হেমেন্দ্রনাথের) ঘরে দেশী বিলেতী সংগীতের যুগল স্রোত অবিরাম বয়ে চলেছিল। বড় মেয়ে প্রতিভাদিদিকে তিনি সর্ববিদ্যাপারদর্শিনী করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর চতুর্থ কন্যা মনীষা 'তমীশ্বরাণাং' বেদমন্ত্রে এবং রবিকাকার কতকগুলি গানে, যথা 'পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে' প্রভৃতিতে পিয়ানোর সংগত বসিয়েছিলেন।"

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও কন্যা ইন্দিরাদেবী উভয়েই ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের শিক্ষা ভালোভাবেই পেয়েছিলেন। এ বিষয়ে ইন্দিরাদেবী নিজের স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

"ছেলেবেলা থেকেই আমরা গান বাজনার আবহাওয়ায় মানুষ—দেশী বিলিতী দুরকমেরই। ঠাকুর বংশে দেখতে পাই পুরুষানুক্রমে এই দুই ধারাই অল্পবিস্তর চলে আসছে। যাঁরা বাংলাদেশের সেকালের সংগীত ইতিহাসের খোঁজ রাখেন, তাঁদের এই সূত্রে স্বভাবতই পাথুরেঘাটার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম মনে পড়বে। তাঁর ছেলে প্রমোদকুমার ঠাকুরের রচিত কতকগুলি বিলিতী স্বরলিপিতে লিখিত ও বিলিতী স্বরসন্ধিযুক্ত (harmony) দেশী রাগরাগিণীর ছোট গৎ আমার কাছে এখনও আছে। সৌরীন্দ্রমোহন বা ছোট রাজার গুরুদাস নামে এক নাতিও সেকালের কলকাতায় রঙ্গমঞ্চে কোনো বৈদিক স্তোত্রের স্বরসন্ধি করে গাওয়াবার পরীক্ষা করেছিলেন।

"আমার বিলিতী সংগীতপ্রীতি অবশ্য লরেটো কনভেণ্টে শিক্ষাজনিত। সেখানে সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রালের অর্গানিস্ট মিঃ স্লেটারের কাছে পিয়ানো এবং মানজাটো নামক এক ইতালীয় বেহালা শিক্ষকের কাছে বেহালা শেখবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখনকারকালে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ অব মিউজিক থেকে গানের উপপত্তিক প্রশ্ন এদেশে পাঠানো হতো। তার ইণ্টারমিডিয়েট পর্ব পর্যন্ত আমি পাস করেছিলুম।

"মনে আছে, আমাকে, আমার দাদা সুরেনকে আর সরলাদিদিকে রবিকাকা একবার "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটির উপর একটি স্বরসন্ধিযুক্ত পিয়ানোর গৎ

রচনা করতে বলেছিলেন। কথা ছিল যার সবচেয়ে ভালো হবে, তিনি তাকে পুরস্কার দেবেন। আমাদের মধ্যে একমাত্র সুরেনই উৎসাহ এবং পরিশ্রম করে এই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।"

সরলা দেবী ছিলেন গুরুদেবের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। কন্যাকে ইয়োরোপীয় সঙ্গীত ও পিয়ানো শেখানোর জন্যে একটি মেম শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হয়েছিল। সেই শিক্ষয়িত্রীটি রোজ এক ঘণ্টা করে সরলা দেবীকে ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের অভ্যাস করাতেন।

পরবর্তী যুগে এই বাড়ির সন্তানরা অনেকেই ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের চর্চা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন গুরুদেবের অনেকগুলি গান ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে কর্ড ও হার্মনি করে পত্রিকায় তা ছাপিয়েও ছিলেন।

কলকাতার ধনীদের দ্বারা প্রবর্তিত শখের থিয়েটারের যুগে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির যুবকদের মধ্যে অর্কেস্ট্রাসহ শখের থিয়েটার গঠনের ঝোঁক উঠেছিল। গুরুদেবের আপন দাদা, খুড়তুতো দাদা ও দাদাদের বন্ধুরা মিলে বাড়িতেই একটি নাট্য-সম্প্রদায় খাড়া করেছিলেন। কেশব সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন ছিলেন এঁদের অভিনয় শিক্ষক। এখানে "কৃষ্ণকুমারী" ও "একেই কি বলে সভ্যতা" নাটক দুটি অভিনীত হবার পর ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের দ্বারা রচিত 'নবনাটক'-টির বহু মাস ধরে মহড়া দিয়ে অভিনয় করেন। পর পর ৯ রাত্রি নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকের কনসার্টের গৎ রচনা করে দিতেন গৃহশিক্ষক বিষ্ণু চক্রবর্তী। রাত্রে বাজনার মহড়া বসতো। যন্ত্রের মধ্যে ছিল 'হারমোনিয়ম', দু-তিনটি 'বেহালা', 'করতাল', 'ঢোল', 'বাঁয়া-তবলা', 'ক্লারিয়োনেট', 'পিক্‌লো' ও বড় 'বাস্ বেহালা'। নবনাটকের অভিনয়ের পর আর কোনো নাটক অভিনীত হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না।

মনে হয় পরবর্তী হিন্দুমেলার আন্দোলনের সঙ্গে এই পরিবারের যুবকেরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে নাটকের অভিনয় নিয়ে মেতে থাকবার অবসর আর তাঁরা পাননি। এই যুগে অন্যান্য ধনীদের মধ্যেও শখের থিয়েটার ছিল বলে শোনা যায় না। বেশ কয়েক বছর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে নাটকের অভিনয় বন্ধ থাকার পর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদেবের প্রথম বিলেত ভ্রমণের আগে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত একটি নাটকের অভিনয় হয়েছিল বলে আমরা জানতে পাই। গুরুদেব তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, এইবারই প্রথম তিনি নাটকের অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন। নাটকটির নাম ছিল 'এমন কর্ম আর কোরবো না'।

গুরুদেব অভিনয় করেন অলীক প্রকাশের ভূমিকায়। এবারেই প্রথম বাড়ির মহিলারা নাটকের অভিনয়ে অনুমতি পান। এই ঘটনার পর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে, স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত 'বসন্ত উৎসব' নামে একটি গীত-নাটকের অভিনয়ের সংবাদ আমরা পাই। তখন গুরুদেব তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে বিলেতে আছেন। "বসন্ত উৎসব" পুরোপুরি অপেরা জাতীয় গীত-নাট্যের ছাঁদে রচিত। বাড়ির "বিদ্বজ্জন সমাগম সভার" সমাগত অতিথিবৃন্দের মনোরঞ্জনার্থে অভিনীত হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে এই ধরনের অপেরা জাতীয় গীত নাটকের অভিনয় এইবারই প্রথম হলো। কিন্তু অপেরা-জাতীয় নাটক রচনা ও অভিনয় করানোর উৎসাহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে কিভাবে জাগল তার কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

ইতিপূর্বে আমরা ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে অভিনীত "কামিনীকুঞ্জ" নামে ইটালীয় অপেরার ন্যায় আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমস্তই সংগীত দ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তরযুক্ত যে নাটকের আলোচনা করেছি স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত উৎসব' অপেরার পিছনে তারই প্রভাব ছিল বলে আমার ধারণা। নতুন ধরনের নাটক হিসেবে "কামিনীকুঞ্জ" কলিকাতার তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের চিত্ত আকর্ষণ করে এবং সর্বত্র প্রশংসিতও হয়। অনুমান করি ঠাকুর বাড়ির যুবকেরাও নিশ্চয়ই বাংলা ভাষার নতুন ধরনের এই অপেরাটি দেখে খুশি হয়েছিলেন এবং সেই খুশির ফলেই "বসন্তোৎসব" অপেরা বা গীতনাটকটির জন্ম। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী তাঁর স্মৃতিচিত্রে বসন্তোৎসব বিষয়ে লিখেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের বিলাত নিবাস কালেই আমার মায়ের রচিত 'বসন্তোৎসব' গীতনাট্যের অভিনয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সঙ্গীতের এক মহাহিল্লোলে হিল্লোলিত হয়ে উঠেছিল বাড়ি তখন।"

হিরন্ময়ী দেবীও এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

"জোড়াসাঁকো হইতে কাব্য নাট্যের সৃজন প্রথম এই 'বসন্ত উৎসবে'ই। ইংলণ্ডে বইখানি পড়িয়া রবিমামা মাকে যে আনন্দপূর্ণ পত্র লেখেন, বড়ই দুঃখের বিষয়, সে পত্রখানি মা আর রাখেন নাই। রবিমামা বিলাত হইতে বাড়ি ফিরিবার পর আমাদের অন্তঃপুরে 'বসন্ত-উৎসবে'র অভিনয় হইয়াছিল।"

গুরুদেব বিলেত থেকে ফিরলেন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। এসেই

দেখলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত "মানময়ী" নাটকের অভিনয়ের আয়োজন চলেছে। গুরুদেবও এতে অভিনয় করলেন। নাটকটি পুরোপুরি গীত নাটক নয়। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের খাঁটি অপেরা জাতীয় নাটকের কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভুলতে পারেননি বলেই গুরুদেবকে দিয়ে পর পর দু' বছর 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' গীতি-নাটক দুটি লেখালেন, নিজে সাহায্য করলেন কথায় সুর যোজনায়। পরিবারের সকলে মিলে তার অভিনয়ও দেখালেন নিমন্ত্রিত গুণীজনের সামনে। কয়েক বছর পরে গুরুদেব নিজেব উৎসাহেই রচনা করেছিলেন 'মায়ার খেলা' গীতি-নাটকটি।

উনবিংশ শতকে বাঙ্গালীদেব মধ্যে যাঁরা ইয়োরোপীয় সঙ্গীত ও অভিনয়কে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং যাঁবা তারই প্রভাবে নতুন পথের সন্ধানে উৎসাহিত হয়েছিলেন, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৃষ্টিমূলক কাজে সকলের অগ্রণী।

রবীন্দ্রনাথের গানে বিলাতী সংগীতের প্রভাব

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গানে ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রভাব নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমাদের ভালো করে দেখে নিতে হবে যে, এই সংগীতের চর্চা বা তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁর মধ্যে কতখানি ছিল এবং কিভাবে তা তিনি লাভ করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজের উক্তি এবং আত্মীয়স্বজনদের স্মৃতিকথাই হলো আমাদের একমাত্র অবলম্বন। ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রথম-পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন—

"At seventeen, when I first came to Europe, I came to know it intimately, but even before that time I had heard European music in our own household. I had heard the music of Chopin and others at an early age."

অন্যত্র বলেছেন—

"As a young boy I heard European music being played on the piano; much of it I found attractive, but I could not enter fully into the spirit of the thing."

এই দুটি উক্তি থেকে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে তাঁর পরিবারে ইয়োরোপীয় সংগীতের চর্চা ছিল এবং সেই সাংগীতিক পরিবেশ তাঁর বাল্যজীবনকে যথেষ্ট আকৃষ্টও করেছিল। প্রথম ভালো গান শোনার বিষয়ে তিনি লিখেছেন—

"I first heard European songs when I was 17-years old, during my first visit to London. The artist was Madame Nilsson, who used to have a great reputation in those days."

১৭ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমবার ইংলণ্ডে যান ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। সেখানে সবসমেত মোট ১ বৎসর ৫ মাস ছিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডে তিনি কেবল পড়াশোনাই করেননি, ইয়োরোপীয় সংগীত শুনেছেন নানা উপলক্ষে এবং কণ্ঠসংগীতেরও চর্চা করেছিলেন উৎসাহের সঙ্গে। তাঁর তখনকার চিঠিপত্রে জানা

যায় যে, প্রায়ই তিনি Evening Party, ফ্যান্সিবল ও অন্যান্য নাচগানের নিমন্ত্রণে পিয়ানো, বাঁশি, বেহালা ইত্যাদি যন্ত্রের সংগতে 'Gallop' এবং 'Lancers' নাচ নেচেছেন। ব্রাইটনে কোথাও আমোদ-উৎসব হলে মিস্ K. গুরুদেবদের সকলকে খবর দিতেন, সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন, অবসর পেলে তাঁদের সঙ্গে গল্প করতেন এবং ছেলেদের গান শেখাতেন। জীবনস্মৃতিতেও তিনি সে কথা লিখেছেন—

"ব্রাইটনে থাকিতে সেখানকার সংগীতশালায় একবার একজন বিখ্যাত গায়িকার গান শুনিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার নামটা ভুলিতেছি—মাডাম নীলসন্ অথবা মাডাম আলবানী হইবেন। কণ্ঠস্বরের এমন আশ্চর্য শক্তি পূর্বে কখনো দেখি নাই।"

এইখানেই Dr. M.-এর বাড়িতে সন্ধ্যার নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন গানবাজনা আমোদপ্রমোদে যোগদানের জন্যে। তাঁদের অনেকের অনুরোধে 'প্রেমের কথা আর বোলো না' এবং আরো দুটি বাংলা গান তিনি গেয়েছিলেন। গানবাজনা আহারাদিতে সেই সন্ধ্যা তাঁর আনন্দেই কেটেছিল। পরে লণ্ডনে Mr. K.-র পরিবারে এসে উঠলেন। সেখানে দেখলেন তাঁর তৃতীয়া কন্যা Miss A. প্রায়ই গানবাজনা করেন, গানের চর্চাও আছে। এখানকার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—

"এই পরিবারে আমি বেশ সুখে আছি। সন্ধ্যেবেলা বেশ আমোদে কেটে যায়,—গানবাজনা, বই পড়া।" অন্যত্র লিখেছেন—

"এক একদিন আমাদের গানবাজনা হয়। আমি ইতিমধ্যে অনেক ইংরাজি গান শিখেছি। জাঁক করতে চাই না কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এখানকার লোকে আমার গলার বেশ প্রশংসা করে। আমি গান করি। Miss A. বাজান। Miss A. আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন।"

জীবনস্মৃতিতে তাঁর সে-দিনের এই সংগীত-জীবনের আরো কিছু বর্ণনা আমরা পাই। যেমন—

"ডাক্তার স্কট নামে এক ভদ্রগৃহস্থের ঘরে আমার আশ্রয় জুটিল। [মিসেস স্কট] গৃহস্থালির সমস্ত কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়াশুনা গানবাজনায় তিনি সম্পূর্ণ যোগ দিতেন।"

"আইরিশ মেলডীজ্ আমি সুরে শুনিব, শিখিব এবং শিখিয়া আসিয়া অক্ষয়-বাবুকে শুনাইব, ইহাই আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল।...আইরিশ মেলডীজ্ বিলাতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম কিন্তু আগাগোড়া সব গানগুলি সম্পূর্ণ

করিবার ইচ্ছা আর রহিল না।"...

"দেশে ফিরিয়া আসিয়া এই সকল এবং অন্যান্য বিলাতি গান স্বজনসমাজে গাহিয়া শুনাইলাম। সকলেই বলিলেন, রবির গলা এমন বদল হইল কেন, কেমন যেন বিদেশী রকমের, মজার রকমের হইয়াছে।"

শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী গুরুদেবের প্রথম বিলাত-বাসকালীন সংগীত-জীবনের কথা স্মরণ করে বলেছেন—

"আমরা মায়ের সঙ্গে অনুমান ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গিয়ে পৌঁছই [বিলাতে], পরে বাবা ও রবিকাকা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আসেন। সেই সময় থেকেই বিলিতী সংগীতের সঙ্গে তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] পরিচয় হয় এবং শুনেছি তাঁর সুরেলা, জোরালো তারসপ্তকের চড়া গলা, যাকে ওদেশে বলে, 'টেনর্'—শুনে ওরা মুগ্ধ হতো।... মনে আছে যে,

"Won't you tell me, Molly darling,"

"Darling, you are growing old,"

"Good-bye, sweet heart, Good-bye."

প্রভৃতি তখনকার জনপ্রিয় গানগুলি তিনি গাইতেন।"

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরে এলেন বিলাতি সংগীতের গভীর প্রভাব নিয়ে। দেশে ফেরার কিছুকাল পরেই দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে তাঁকে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যটি রচনা করতে হলো "বিদ্বজ্জন সমাগম সভা" নামে বাড়িতে প্রচলিত একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠানে, নিমন্ত্রিত খ্যাতনামা সাহিত্যিক অতিথিদের নাটকের অভিনয়েব দ্বারা চিত্তবিনোদনের ইচ্ছায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' প্রথম অভিনীত হয়। এই ঘটনার কথা স্মরণ করে তিনি লিখছেন—

"...দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে।...সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল।...গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া।...বিলাতি

সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপগানে বসাইয়াছি। বস্তুত, বাল্মীকিপ্রতিভা, পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা; অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে।—ইয়োরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকিপ্রতিভা তাহা নহে, ইহা সুরে নাটিকা;...ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।"

ভারতীয় সংগীতে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' যে নূতন পরীক্ষা তা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের দেশে প্রাচীন ধারার নানাপ্রকার পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য আজও সুপ্রচলিত। ইতালীয় অপেরার অনুসরণে কলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত 'কামিনীকুঞ্জ' বা রবীন্দ্রনাথের গৃহে 'বসন্ত-উৎসব' নামে গীতিনাট্য অভিনীত হয়েছে। এসবের চরিত্রগুলির কথোপকথন গানের সুরে তালে লয়ে নিখুঁতভাবে বাধা বলে অভিনয়ের ঢংএ অভিনেতারা তা গাননি। গাওয়া হয়েছিল প্রচলিত গানের ঢংএ, রাগিণী এবং তালের সম, ফাঁক ও মাত্রার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে। বাল্মীকি-প্রতিভার জন্যে গুরুদেব হিন্দী ও প্রচলিত নানাপ্রকার বাংলা ঢংএর গান রচনা করলেন কিন্তু তাব গাইবার রীতি, অর্থাৎ তালের সম, ফাঁকের নিয়ম লঙ্ঘন না করে রাগরাগিণীর বিস্তার দ্বারা গান গাইবার যে প্রচলিত রীতি আছে তাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করলেন। এই নাটকের অভিনয়ের সময়ে বিভিন্ন চরিত্রগুলি সাধারণ কথার ছন্দে বা কথা বলার ঢং-এ রাগরাগিণী যুক্ত গানকে নতুন ভাবে প্রকাশ করলেন। এখানে প্রশ্ন উঠবে যে, এইপ্রকার গীতপদ্ধতির চিন্তা গুরুদেবের মনে এল কী করে? এর উত্তর পাব তাঁর নিজেরই লেখা থেকে। জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন—

"হার্বার্ট স্পেন্সরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুতঃ, রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষসাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন। আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে

সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমানসংগত রীতিমত সংগীত নহে। ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ; ইহাতে তালের কড়াক্কড় বাঁধন নাই, একটা লয়ের মাত্রা আছে; ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য, কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা, কোনো বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকিপ্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।"

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় বিলাতি সুরের অনুকরণে দস্যুদলের মত্ততার যে দুটি গান রচনা করেছিলেন, তার একটি হলো, 'কালী কালী বলো রে আজ', অপরটি হলো, 'তবে আয় সবে আয়'। আইরিশ সুরে রচিত বনদেবীর বিলাপের গানটি হলো 'মরি ও কাহার বাছা'। এ গানটি প্রথমবারে ছিল না। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নাটকটির পুনরাভিনয় কালে এটি রচিত।

বাল্মীকি-প্রতিভায় দেশী ও বিদেশী সুরের চর্চায় অভিজ্ঞতার ফলে সংগীতরচনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে তখন যে সব চিন্তার উদয় হয়েছিল তার থেকে সমগ্রভাবে রবীন্দ্রসংগীতের বিচারের সঠিক পথ পাওয়া যেতে পারে বলেই আমাদের ধারণা। সেই সময়কার তাঁর ঐ সংগীতচিন্তাকে তিনি প্রকাশ করেছিলেন বিস্তারিত ভাবে একই বছরে পর পর প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধ ক'টির উপর এখনো পর্যন্ত আমরা তেমন দৃষ্টি দিইনি বা তা নিয়ে বিস্তারিত ভাবে তেমন কোনো আলোচনাও আমরা করিনি। অথচ এই তিনটি প্রবন্ধের মধ্যেই গুরুদেবের সমগ্র-জীবনের নানা প্রকার সংগীতসৃষ্টির মূল রহস্যটি লুকিয়ে আছে। একথা চিন্তা করে, পাঠকদের সুবিধার্থে, প্রবন্ধ ক'টির বক্তব্য বিষয় একটু বিস্তারিত ভাবেই উদ্ধৃত করবো।

বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয়ের প্রায় মাস-দুই পরে, অর্থাৎ এপ্রিল মাসে, কলিকাতার বেথুন সোসাইটির এক অধিবেশনে তিনি সংগীত বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি 'সংগীত ও ভাব'* নামে ভারতী পত্রিকায় ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গানের উদাহরণ সহ বক্তৃতাটিতে তিনি যা বলেছিলেন তার অংশ বিশেষ প্রকাশিত প্রবন্ধটি থেকে তুলে দিচ্ছি।

"অল্পদিন হইল বঙ্গসমাজের নিদ্রা ভাঙিয়াছে, এখন তাহার শরীরে একটা নব

* দ্রঃ সঙ্গীত-চিন্তা (বৈশাখ ১৩৭৩)

উদ্যমের সঞ্চার হইয়াছে।...

"আমাদের বঙ্গসমাজে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, এমন-কি সে আন্দোলনের এক-একটা তরঙ্গ য়ুরোপের উপকূলে গিয়া পৌঁছাইতেছে। এখন হাজার চেষ্টা করো-না, হাজার কোলাহল করো-না কেন, এ তরঙ্গ রোধ করে কাহার সাধ্য! এই নূতন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে সংগীতের নব অভ্যুদয় হইয়াছে। সংগীত সবে জাগিয়া উঠিয়াছে মাত্র, কাজ ভালো করিয়া আরম্ভ হয় নাই। এখনো সংগীত লইয়া নানা প্রকার আলোচনা আরম্ভ হয় নাই; নানা নূতন মতামত উত্থিত হইয়া আমাদের দেশের সংগীত শাস্ত্রের বদ্ধ জলে একটা জীবন্ত তরঙ্গিত স্রোতের সৃষ্টি করে নাই।

"আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্র...মৃতশাস্ত্র।...বিবিধ বিচিত্র ভাবের লীলাময়, ছায়া-লোকময়, পরিবর্তনশীল মুখশ্রী দেখিতে পাই না।...

"আমার ইচ্ছা যে, কবিতার সহচর সংগীতকেও শাস্ত্রের লৌহকারা হইতে মুক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হউক।...

"রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য কী ছিল? ভাব প্রকাশ করা ব্যতীত আর তো কিছু নয়। আমরা যখন কথা কহি তখনও স্বরের উচ্চনীচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে।...সেই স্বরের উচ্চনীচতা ও তরঙ্গলীলা সংগীতে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সংগীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র।...সংগীত আর কিছু নয়—সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা।...কথা কহিয়া যে ভাব অসম্পূর্ণ-ভাবে প্রকাশ করি, রাগ-রাগিণীতে সেই ভাব সম্পূর্ণতররূপে প্রকাশ করি। অতএব রাগ-রাগিণীর উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা মাত্র।...এখন রাগরাগিণীই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইযাছে।...আজ গান শুনিলেই সকলে দেখিতে চান, জয়জয়ন্তী, বেহাগ বা কানাড়া বজায় আছে কিনা।.. বৈয়াকরণে ও কবিতে যে প্রভেদ, উপরিউক্ত ওস্তাদের সহিত আর-একজন ভাবুক গায়কের সেই প্রভেদ।...

"এখন সংগীতবেত্তারা যদি বিশেষ মনোযোগ-সহকারে আমাদের কী কী রাগিণীতে কী কী ভাব আছে তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, তবেই সংগীতের যথার্থ উপকার করেন। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে একটা ভাব আছে, তাহা যাইবে কোথা বলো।...

"সংগীতবেত্তারা সেই ভাবের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করুন। কেন বিশেষ-বিশেষ এক-এক রাগিণীতে বিশেষ-বিশেষ এক-একটা ভাবের উৎপত্তি হয় তাহার কারণ বাহির করুন। এই মনে করুন—পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল

মনে আসে আর ভৈঁরোতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে ?…

"কোন্‌ সুরগুলি দুঃখের ও কোন্‌ সুরগুলি সুখের হওয়া উচিত দেখা যাক।… আমরা যখন রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্পই থাকে, রোদনের স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত টানা হয়। আমরা যখন হাসি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা সুর একটিও নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান, আর তালের ঝোঁকে ঝোঁকে সুর লাগে। দুঃখের রাগিণী দুঃখের রজনীর ন্যায় অতি ধীরে ধীরে চলে, তাহাকে প্রতি কোমল সুরের উপর দিয়া যাইতে হয়। আর সুখের রাগিণী সুখের দিবসের ন্যায় অতিদ্রুত পদক্ষেপে চলে, দুই-তিনটা করিয়া সুর ডিঙাইয়া যায়। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে উল্লাসের সুর নাই।…সহসা উত্থান বা সহসা পতন নাই। উচ্ছ্বাসময় উল্লাসের সুরই অত্যন্ত সহসা।… ঘোরতর উল্লাসের সুর ইংরাজি রাগিণীতে আছে, আমাদের রাগিণীতে নাই বলিলেও হয়। তবে আমাদের দেশের সংগীতে রোদনের সুরের অভাব নাই। সকল রাগিণীতেই প্রায় কাঁদা যায়। একেবারে আর্তনাদ হইতে প্রশান্ত দুঃখ, সকল প্রকার ভাবই আমাদের রাগিণীতে প্রকাশ করা যায়।…

"আমাদের যাহা কিছু সুখের রাগিণী আছে তাহা বিলাসময় সুখের রাগিণী, গদ্‌গদ সুখের রাগিণী। অনেক সময়ে আমরা উল্লাসের গান রচনা করিতে হইলে রাগিণী যে ভাবেরই হউক তাহাকে দ্রুত তালে বসাইয়া লই, দ্রুত তাল সুখের ভাব-প্রকাশের একটা অঙ্গ বটে।…

"তালও ভাবপ্রকাশের একটা অঙ্গ।…ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালও দ্রুত ও বিলম্বিত করা আবশ্যক—সর্বত্রই যে তাল সমান রাখিতেই হইবে তাহা নয়। ভাবপ্রকাশকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া, সুর ও তালকে গৌণ উদ্দেশ্য করিলেই ভালো হয়।…আমাদের সংগীতে যে নিয়ম আছে যে, যেমন-তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়। তালের সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট, তাহার উপরে আরও কড়াক্কড় করা ভালো বোধ হয় না। তাহাতে স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত হানি করা হয়।…যেমন তাল আছে তেমনি থাকুক, মাত্রা-বিভাগ যেমন আছে তেমনি থাকুক, কেবল একটা নির্দিষ্ট স্থানে সমে ফিরিয়া আসিতেই হইবে এমন বাঁধাবাঁধি না থাকিলে সুবিধা বই অসুবিধা কিছুই দেখিতেছি না। এমন-কি, গীতিনাট্যে, যাহা আদ্যোপান্ত সুরে অভিনয় করিতে হয় তাহাতে স্থানবিশেষে তাল না থাকা বিশেষ আবশ্যক।

নহিলে অভিনয়ের স্ফূর্তি হওয়া অসম্ভব।…

"রাগরাগিণী-আলাপ ভাষাহীন সংগীত।…আলাপেও…কেবল কতকগুলি সুর কণ্ঠ হইতে বিক্ষেপ করিলেই হইবে না, যে-সকল সুরবিন্যাস-দ্বারা ভাব প্রকাশ হয় তাহাই আবশ্যক। গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন, আমি সংগীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই,…তাঁহারা গানের কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপবে দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।…সাধারণ কবিতা পড়িবার জন্য ও সংগীতের কবিতা শুনিবার জন্য।…গানের কবিতা পড়া যায় না, গানের কবিতা শুনা যায়।

"…সংগীতবেত্তাদিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, কী কী সুর কিরূপে বিন্যাস করিলে কী কী ভাবে প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে, তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন।…দুঃখ সুখ রোষ বা বিস্ময়ের রাগিণীতে কী কী সুর বাদী ও কী কী সুর বিসম্বাদী তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন।…বিভিন্ন ভাবেব নাম অনুসারে আমাদের বাগরাগিণীর বিভিন্ন নামকরণ করা হউক। আমাদের সংগীতবিদ্যালয়ে সুর-অভ্যাস ও বাগরাগিণী শিক্ষার শ্রেণী আছে, সেখানে রাগরাগিণীব ভাব-শিক্ষারও শ্রেণী স্থাপিত হউক।"

এই প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রকৃতি বিশ্লেষণ। বাল্মীকি-প্রতিভার নূতনভাবে পবীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি হলো, এর প্রায় সব গানই নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন কবে স্বতন্ত্র গান হিসেবে গাওযা যায় না—কাব্য হিসেবে গানগুলি পড়ে উপভোগ করবার মতো জিনিসও এ নয়। এই কারণেই তিনি বলেছেন, এই নাটকটি 'গানের সূত্রে নাট্যের মালা'। নাটকে সুখ দুঃখ কান্না ভয় হাসি ঠাট্টা আনন্দ উল্লাস বিস্ময় ইত্যাদি নিয়ে নানা রকমের বাস্তব কথোপকথনকে অতি সহজেই নানাপ্রকার ভারতীয় সুরে ও রাগরাগিণীতে বেঁধে কথোপকথনের ঢং-এ গেয়েছিলেন। এতে রাগিণীগুলিব রূপান্তর ঘটেছিল। প্রচলিত রূপের সঙ্গে তা মেলেনি। ঘোরতর উল্লাসের সুরের বেলায় বিলাতি সুর ও ঢং গ্রহণ করলেন, যেহেতু আমাদের গানে দস্যুদলেব উপযোগী উল্লাস বা মত্ততার গান প্রচলিত ছিল না। অধিকাংশ গানই সাধারণ কথাবার্তার ছন্দে গাওয়া হয়েছিল বলে তবলা বা পাখোয়াজের তালের বাঁধন নেই। যে কারণে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ থেকে দেখা যায় যে, তার গানের মাথায় একমাত্র রাগরাগিণীর উল্লেখ ছাড়া তালের কোনো উল্লেখ নেই। অথচ

সে-যুগে ও তার পরবর্তী বহু বৎসর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সব সংগীত গ্রন্থের অন্যান্য গানের সঙ্গে রাগ ও তালের উল্লেখ করা হতো। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়ের ভিত্তি ছিল উপরোক্ত এই বিষয়গুলি।

বাল্মীকি-প্রতিভার নূতন পরীক্ষায় হাত দিয়ে তাঁকে পূর্ব-প্রচলিত গীতি-নাটকের পথ থেকে অনেকখানি সরে যেতে হয়েছিল বলেই তিনি 'সংগীত ও ভাব' নামে বক্তৃতা ও প্রবন্ধটির দ্বারা এই নূতনত্বের সমর্থনে যুক্তি খাড়া করে বোঝাতে চাইলেন যে, সেযুগে ভারতীয় সংগীতে এইরূপ নূতনত্বের প্রয়োজন খুবই দেখা দিয়েছে।

'সংগীত ও ভাব' বক্তৃতা ও প্রবন্ধটির জের হিসেবে গুরুদেব পরবর্তী আষাঢ় সংখ্যায় 'ভারতী'তে প্রকাশ করলেন 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা'* নামে আর-একটি প্রবন্ধ। প্রকৃতপক্ষে এই রচনাটি হলো হার্বার্ট স্পেন্সরের 'The Origin and Function of Music' নামে একটি প্রবন্ধের ব্যাখ্যা। 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধটির যেখানে তিনি বলেছেন, "আমরা যখন কথা কহি তখনও স্বরের উচ্চনীচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে। কিন্তু তাহাতেও ভাবপ্রকাশ অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই স্বরের উচ্চনীচতা ও তরঙ্গলীলা সংগীতে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়।" এই মতকে, হার্বার্ট স্পেন্সরের যুক্তি সমেত বিস্তারিতভাবে বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতেং চেয়েছিলেন দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে। 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা'র মূল বক্তব্য বিষয় হলো—

"আনন্দে বা বিষাদে বা অন্যান্য মনোবৃত্তির উদয়ে সকল প্রাণীরই মাংসপেশীতে ও অনুভবজনক স্নায়ুতে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশিত হয়।···মনোভাবের বিশেষত্ব ও পরিমাণ অনুসারে কণ্ঠস্থিত মাংসপেশীসমূহ সংকুচিত হয়; তাহাদের বিভিন্ন প্রকারের সংকোচন অনুসারে আমাদের শব্দযন্ত্র বিভিন্ন আকার ধারণ করে; এবং সেই বিভিন্ন আকার অনুসারে শব্দের বিভিন্নতা সম্পাদিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, আমাদের কণ্ঠনিঃসৃত বিভিন্ন স্বর বিভিন্ন মনোবৃত্তির শরীরগত বিকাশ।···

"মনোভাবের বিশেষ উত্তেজনা হইলেই তবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক মাঝামাঝি স্বর ছাড়াইয়া উঠি অথবা নামি।···বেগবান মনোবৃত্তির প্রভাবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার স্বরের বাহিরে যাই।···

"···সচরাচর কথাবার্তার সহিত মনোবৃত্তির উত্তেজিত অবস্থার কথাবার্তার

* দ্রং সঙ্গীত-চিন্তা

ধারা স্বতন্ত্র।...উত্তেজিত অবস্থার কথাবার্তার যে-সকল লক্ষণ, সংগীতেরও তাহাই লক্ষণ। সুখ দুঃখ প্রভৃতির উত্তেজনায় আমাদের কণ্ঠস্বরে যে-সকল পরিবর্তন হয়, সংগীতে তাহারই চূড়ান্ত হয় মাত্র।...গানের স্বরও উচ্চ, গানের সমস্তই সুর; গানের সুর সচরাচর কথোপকথনের সুর হইতে অনেকটা উঁচু অথবা নিচু হইয়া থাকে এবং গানের সুরে উঁচু নিচু ক্রমাগত খেলাইতে থাকে।...উত্তেজিত মনো-বৃত্তির সুর সংগীতে যথাসম্ভব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তীব্র সুখ দুঃখ কণ্ঠে প্রকাশের যে লক্ষণ, সংগীতেরও সেই লক্ষণ।...

"সকল প্রকার কথোপকথনে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান আছে। কথা ও যে-ধরণে সেই কথা উচ্চারিত হয়। কথা ভাবের চিহ্ন (signs of ideas) আর ধরণ অনুভাবের চিহ্ন (signs of feeling)। কতকগুলি বিশেষ শব্দ আমাদের ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে এবং সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে যে সুখ বা দুঃখ উদয় হয়, সুরে তাহাই প্রকাশ করে। ...আমরা একসঙ্গে দুই প্রকারের কথা কহিয়া থাকি, ভাবের ও অনুভাবের।...

"সংগীত আমাদিগকে অব্যবহিত যে সুখ দেয়, তৎসঙ্গে আমাদের আবেগের ভাষার (Language of the emotions) পরিস্ফুটতা সাধন করিতে থাকে। আবেগের ভাষাই সংগীতের মূল।...

"...এমন একদিন আসিতেছে যখন আমরা সংগীতেই কথাবার্তা কহিব।...

"আমাদের দেশে সংগীত...স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলা সুরসমষ্টির কর্দম এবং রাগরাগিণীর ছাঁচ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে; সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে—তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই।...

"...আমাদের দেশীয় অনুভাবশূন্য সংগীত নিকৃষ্ট শ্রেণীর।...যতক্ষণ আমরা তাহার মধ্যে অনুভাব না আনিতে পারিব, ততক্ষণে আমরা উচ্চশ্রেণীর সংগীতবিৎ বলিয়া গর্ব করিতে পারিব না।"

বাল্মীকি-প্রতিভায় ব্যবহৃত হাসিকান্না ক্রোধবিস্ময়-মিশ্রিত নানারূপ কথোপ-কথনগুলি গানের সুরে বলবার সময়েও অনুভাবের সাহায্য নিয়েছিলেন। অর্থাৎ নাটকের হাসিকান্না ক্রোধ ইত্যাদি নানাভাবের কথা স্বাভাবিক অবস্থায় অভিনেতারা কণ্ঠে যেভাবে প্রকাশ করেন, কণ্ঠস্বরের সেই স্বাভাবিকতা এই নাটকে বজায় ছিল রাগিণী মিশ্রিত গানগুলি গেয়ে অভিনয় করার সময়। এইরূপ অনুভাবযুক্ত গীত-পদ্ধতির অভাবে আমাদের ভারতীয় সংগীতকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর

বলে সে যুগে গুরুদেব মনে করতেন।

পরবর্তী মাঘ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো 'সংগীত ও কবিতা' নামে গুরুদেবের তৃতীয় প্রবন্ধটি। এটিতে বলছেন—

"আমাদের ভাবপ্রকাশের দুটি উপকরণ আছে—কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাব প্রকাশ করে। এমন-কি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ভাবপ্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধান্য দিই ও সংগীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দিই।...কথোপকথনে আমরা যে-সকল সুর যেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি, সংগীতে সে-সকল সুর সেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি না, সুর বাছিয়া বাছিয়া লই, সুন্দর করিয়া বিন্যাস করি। কবিতায় যেমন বাছা বাছা সুন্দর কথায় ভাব প্রকাশ করে, সংগীতেও তেমনি বাছা-বাছা সুন্দর সুরে ভাব প্রকাশ করে। যুক্তির ভাষায় প্রচলিত কথোপ-কথনের সুর ব্যতীত আর কিছু আবশ্যক করে না, কিন্তু যুক্তির অতীত আবেগের ভাষায় সংগীতের সুর আবশ্যক করে। এ বিষয়েও সংগীত অবিকল কবিতার ন্যায়। সংগীতেও ছন্দ আছে। তালে তালে তাহার সুরের লীলা নিয়মিত হইতেছে।...কথোপকথনের সুরে সুশৃঙ্খল তাল নাই, সংগীতে তাল আছে। সংগীত ও কবিতা উভয়ে ভাবপ্রকাশের দুইটি অঙ্গ ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। তবে, কবিতা ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে যতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে, সংগীত ততখানি করে নাই। তাহার একটি প্রধান কারণ আছে। শূন্যগর্ভ কথার কোনো আকর্ষণ নাই, না তাহার অর্থ আছে, না তাহা কানে তেমন মিঠা লাগে। কিন্তু ভাবশূন্য সুরের একটা আকর্ষণ আছে, তাহা কানে মিষ্ট শুনায়। এইজন্য ভাবের অভাব হইলেও একটা ইন্দ্রিয়সুখ তাহা হইতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত সংগীতে ভাবের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। উত্তরোত্তর আস্কারা পাইয়া সুর বিদ্রোহী হইয়া ভাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।...সংগীতের ভূমি উর্বরা হওয়াতেই সংগীতের এমন দুর্দশা। মিষ্টসুর শুনিবামাত্রই ভালো লাগে, সেই নিমিত্ত সংগীতকে আর পরিশ্রম করিয়া ভাব কর্ষণ করিতে হয় নাই—কিন্তু শুদ্ধ মাত্র কথায় যথেষ্ট মিষ্টতা নাই বলিয়া কবিতাকে প্রাণের দায়ে ভাবের চর্চা করিতে হইয়াছে। সেই নিমিত্তই কবিতার এমন উন্নতি ও সংগীতের এমন অবনতি।...

"কবিতা উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়াছে ও সংগীত নিম্নশ্রেণীতে পড়িয়া রহিয়াছে; কবিতায় বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম ও প্রস্তরের ন্যায় স্থূল সমুদয় ভাবই প্রকাশ করা যায়, কিন্তু সংগীতে এখনো তাহা করা যায় না।...

Matthew Arnold বলেন—"মনের একটি মাত্র স্থায়ীভাব বাছিয়া লওয়া, ভাব-শৃঙ্খলের একটি মাত্র অংশের উপর অবস্থান থাকা সংগীতের কাজ।... কবিতার কাজ আরো বিস্তৃত। চিত্রকরের ন্যায় মুহূর্তের ব্যহশ্রীও তাঁহার বর্ণনীয়, গায়কের ন্যায় ক্ষণকালের ভাবোচ্ছ্বাসও তাঁহার গেয়। তাহা ছাড়া জীবনের গতিস্রোত তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়। ভাব হইতে ভাবান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে তাঁহাকে গমন করিতে হয়।...কেবলমাত্র স্থির দণ্ডায়মান আকৃতি তিনি চিত্র করেন না—একসময়ের স্থায়ী ভাব মাত্র তিনি বর্ণনা করেন না, গম্যমান শরীর, প্রবহমান ভাব, পরিবর্তমান তাঁর কবিতার বিষয়।... চলনশীল ভাবের প্রত্যেক ছায়ালোক সংগীতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। সংগীত একটি স্থায়ী স্থির ভাবের ব্যাখ্যা করে মাত্র। কিন্তু আমরা এই বলি যে, গতিশীল ভাব যে সংগীতের পক্ষে একেবারে অননুসরণীয় তাহা নহে, তবে এখনো সংগীতের সে বয়স হয় নাই। সংগীত ও কবিতায় আমরা আর-কিছু প্রভেদ দেখি না, কেবল উন্নতির তারতম্য।"

'সংগীত ও ভাব' নামে প্রবন্ধের যেখানে তিনি বলেছেন, ভারতীয় সংগীত শাস্ত্র স্থির অচঞ্চল—বিবিধ বিচিত্র ভাবের লীলাময় ছায়ালোকময় পরিবর্তনশীল মুখশ্রী দেখতে পাওয়া যায় না, এটি মূলতঃ তারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এখানে তিনি বললেন, কবিতায় বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম ও প্রস্তরের ন্যায় স্থূল সমুদয় ভাব প্রকাশ করায় যে সুবিধা আছে সংগীতে তা নেই। কবিতার মতো গতিশীল ভাব প্রকাশ করা সংগীতের পক্ষে এখনো সম্ভব হয়নি। ভাব প্রকাশে কবিতা যতখানি উন্নতিলাভে সমর্থ হয়েছে সংগীতে ততখানি হয়নি।

এই তিনটি প্রবন্ধ থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, 'গুরুদেব ইয়োরোপীয় সংগীত চিন্তাকে আদর্শরূপে সামনে রেখে বাল্মীকি-প্রতিভায় সংগীতের নূতন পরীক্ষায় হাত দিয়েছিলেন এবং এ যুগে তাঁর মনে এমন বিশ্বাসও জন্মেছিল যে, কতগুলি দিকে ভারতীয় সংগীত ইয়োরোপীয় সংগীতের তুলনায় অনেকখানি অনগ্রসর।

যৌবনের প্রারম্ভে সমগ্রভাবে ইয়োরোপের সংস্কৃতির প্রতি গুরুদেব যে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা জানা যায় সে যুগে প্রকাশিত তাঁরই "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র" নামক বইটির বিভিন্ন পত্রে। বইটির ভূমিকায় তিনি কোনো

প্রকার দ্বিধা না করে বলেছিলেন—

"বিদেশীয় সমাজ প্রথম দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে আর কোনো উপকার হউক বা না হউক, একজন বাঙালি ইংলণ্ডে গেলে কিরূপে তাহার মত গঠিত ও পরিবর্তিত হয় তাহার একটা ইতিহাস পাওয়া যায়।"

সংগীতেও যে রবীন্দ্রনাথের মত ইয়োরোপীয় ভাবধারায় অনেকখানি গঠিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল তার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয় ও এই প্রবন্ধ ক'টি প্রকাশের পরে, ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর তারিখে অভিনীত হলো দ্বিতীয় গীতনাট্য 'কালমৃগয়া'। এর কথা স্মরণ করে 'জীবনস্মৃতি'তে গুরুদেব লিখছেন—"বাল্মীকি-প্রতিভা'র গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটি গীতনাট্য লিখিয়াছিলাম।"

'কালমৃগয়া'তে বিলাতি গানের সুরে ও ছন্দে রচিত, বা যাকে বলে ভাঙা গান, তা ছিল মাত্র ছয়টি। যেমন—

১। ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে।
২। সকলি ফুরালো।
৩। মানা না মানিলি।
৪। তুই আয় রে কাছে আয় (ও ভাই দেখে যা)।
৫। ও দেখবি রে ভাই।
৬। এনেছি মোরা, এনেছি মোরা।

বাকি গানগুলি রচিত হলো নানা ঢঙের ভারতীয় গানের সাহায্যে।

এ যুগে, গীতনাটকের জন্য নয় এমন বিলাতি গান-ভাঙা বাংলা গান সংখ্যায় বেশি পাওয়া যায় না। জানা যায়, প্রথমবারের বিলাতবাস থেকে পরবর্তী ছয় বছর, অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এইরূপ ইংরাজি গান-ভাঙা বাংলা গান রচনা করেছিলেন মাত্র তিনটি। যেমন—'ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয়' ব্রহ্মসংগীতটি আর 'পুরানো সেই দিনের কথা' এবং 'কতবার ভেবেছিনু' বিবিধ পর্যায়ের গান দুটি। ভাঙা-গানের সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছে যে, বিলাতি সংগীতের প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকলেও ভাঙা-গান রচনার প্রতি গুরুদেবের তেমন আগ্রহ নেই।

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র পুনরভিনয় কালে 'মরি ও কাহার বাছা'

গানটি বনদেবীর বিলাপের গান হিসেবে নতুন করে যুক্ত হলো। 'কালমৃগয়া'-র 'মানা না মানিলি' গানটির সুরে। এবারের অভিনয়ে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' বহু-পরিমাণে বর্ধিত হলো। তাই গীতনাটকটির পুনর্মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন—

"অনেকগুলি নাম পরিবর্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্য হইতে গৃহীত।" 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন ('কালমৃগয়া') "গীতি-নাট্যের অনেকটা অংশ 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম···।"

এই গীতিনাট্যের এবারের অভিনয়ে বিলাতি সুরের গান রেখেছিলেন মাত্র চারটি। যেমন—

১। কালী কালী বল রে আজ।
২। তবে আয় সবে আয়।
৩। এনেছি মোরা, এনেছি মোরা।
৪। মবি ও কাহার বাছা।

নাটকটির জন্যে প্রায ২০টি দেশী ঢঙের গান রচনা করলেন নতুন করে আর 'কালমৃগয়া'র মোট ৯টি গান যুক্ত হলো এর সঙ্গে।

পর পর গীতিনাট্য দুটি রচনার সময়ে নতুন পরীক্ষার প্রতি তাঁর মনে যে উৎসাহ জেগেছিল তার বর্ণনা করতে গিয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে লিখলেন—

"বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যে-উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে-উৎসাহে আর-কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটির অপূর্ব মূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুরে বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে, এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম।

"এইরূপ একটা দস্তর ভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা। এইজন্য উহাদের মধ্যে তাল-বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি-বাংলার বাছবিচার নাই।···আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংগীত সম্বন্ধে উক্ত দুই গীতনাট্যে যে

দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কেহই কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই খুশি হইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন।"

জীবনস্মৃতির এই উক্তি ক'টি তাঁর ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ ক'টির কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অভিনীত হলো তৃতীয় গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'। প্রায় বছর খানেক আগে থেকেই এর গান রচনা তিনি শুরু করেছিলেন। বেথুন কলেজে মহিলারা অভিনয় করলেন, দর্শকও ছিলেন কেবলমাত্র মহিলারা। এই নাটকটি বিষয়ে গুরুদেব লিখছেন—'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' রচনার "অনেককাল পরে 'মায়ার খেলা' বলিয়া আর-একটি গীতনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্নমতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনার স্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, 'মায়ার খেলা' যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।"

এই গীতিনাট্যটির সঙ্গে পূর্বের দুটি গীতিনাট্যের প্রধান পার্থক্য হলো এই যে, এর বহু গানই নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র গান হিসেবে গেয়ে উপভোগ করা যায়। এছাড়া তবলার তালের ছন্দও এর বহু গানে রক্ষিত হয়েছে। যার জন্য এ-নাটকের গানগুলির রাগিণীর উল্লেখের সঙ্গে তালেরও উল্লেখ দেখি। তা সত্ত্বেও, এটি পুরোপুরি গীতিনাট্য এবং এর অভিনয়ের সময় অধিকাংশ গানই গাওয়া হয়েছিল পুরোপুরি কথোপকথনের ছন্দে তালের বাঁধাছন্দের নিয়ম লঙ্ঘন করে। এই গীতিনাটকে বিলাতি সুরের ভাঙা-গান আছে মাত্র একটি। গানটি হলো 'আহা আজি এ বসন্তে'। পূর্বের 'মানা না মানিলি' গানটির সুরে এটি রচিত। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই সাতটি বছরে গীতিনাটক রচনা এবং একই প্রথায় তার গান গেয়ে অভিনয় করার প্রতিই ছিল তাঁর ও তাঁর পরিবারের সকলের একমাত্র ঝোঁক। এ ছাড়া, বিলাতি গান-ভাঙা বাংলা গান মোট যে-ক'টির সন্ধান পাওয়া গেছে তা এই সময়ের মধ্যেই তিনি লিখেছিলেন। 'মায়ার খেলা' রচনার পর গীতিনাট্য রচনার প্রতি উৎসাহ আর যেমন দেখা গেল না, তেমনি দেখা গেল না বিলাতি ভাঙা বাংলা গান রচনার প্রতি আগ্রহ।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে ঘটল রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বারের বিলাত

যাত্রা। তখন তাঁর বয়স ২৯ বৎসর। খুবই উৎসাহ নিয়ে তিনি রওনা হয়েছিলেন, পৌঁছলেন সেপ্টেম্বর মাসে, কিন্তু দেশ ও বাড়ির জন্য মন খারাপ হওয়াতে মাত্র একমাস সে দেশে থাকার পর নভেম্বর মাসে দেশে ফিরে এলেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন তা আর সফল হলো না, কিন্তু এই একমাস সে দেশের সংগীতের চর্চায় তাঁর সময় যে কী ভাবে কেটেছিল তার সুন্দর একটি পরিচয় পাই তাঁরই লেখা 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থে। এক মাসের বিলাত বাস এবং জাহাজে ফেরার দিনলিপিতে সংগীত চর্চার উল্লেখ করে তিনি জানাচ্ছেন—

"সন্ধের সময় আর একবার গানবাজনা নিয়ে বসা গেল। Walter Mull বেশ Piano বাজায়। Miss Mull-এ আমায় মিলে অনেকগুলো গান গেয়েছি। এরা আমার গলার অনেক তারিফ করছে। Mull বলছিল, আমি যদি গলার চর্চা করি তাহলে St. James Hall Concert-এ গাইতে পারি—আমার রীতিমত উচ্চশ্রেণীর গলা আছে।...

"...সমস্ত দিন প্রায় গানবাজনায় কেটেছে।... Miss Mull গান শেখালে। ...কতকগুলো নতুন গান (গানের স্বরলিপি) কিনে এনেছি, সেগুলো গেয়ে দেখা গেল।...

"Tennis খেলে Oswalds-এর ওখানে গান গেয়ে এবং গান-বাজনা শুনে বাড়ি এসে খেয়ে পুনশ্চ গানবাজনা করে শোবার ঘরে এসেছি।

"...Miss Mull আমাকে সব গানগুলো গাওয়ালে। 'Remember me' বলে একটা গানের পর সে আস্তে আস্তে আমাকে বললে, Mr. T, I shall remember you।

"Miss Mull-এর কাছে একটু গান শিখলুম।...concert-এ আমাকে গান গাওয়ালে। বিস্তর বাহবা পাওয়া গেল।...একটি অত্যন্ত মোটা মেয়ে চমৎকার গান করলে। সেই আমার গানের accompaniment বাজিয়েছিল। Gounod-এর *Serenade* এবং *If* গেয়েছিলুম। আজকাল আমি অনেকটা সাহসপূর্বক গলা ছেড়ে গান গাই।...

"এখন অভ্যাসক্রমে য়ুরোপীয় সংগীতের এতটুকু আস্বাদ পাওয়া গেছে যার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে, যদি চর্চা করা যায় তাহলে য়ুরোপীয় সংগীতের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যেতে পারে।

"আজ রাত্তিরেও আমাকে অনেক গান গাইতে হলো। তার পর নিরালায়

অন্ধকারে জাহাজের কাঠরা ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে যখন গুন্ গুন্ করে একটা দিশি রাগিণী ভাঁজছিলুম ভারি মিষ্টি লাগল। ইংরিজি গান গেয়ে গেয়ে শ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলুম, হঠাৎ দিশি গানে প্রাণ আকুল হয়ে গেল।

(সুন্দরী মেয়েটি) "কাল রাত্তিরে আপনি এসে বললে: Aren't you going to sing? আমি বললুম: yes। বলে গান গাইতে গেলুম।...

"সে (Australian মেয়েটি)...আমাকে বললে, চলো Music Saloon-এ গিয়ে আমরা গান বাজনা করিগে। সেখানে গিয়ে গান আরম্ভ করে দেওয়া গেল। আজ আমাকে বার বার করে অনেক রাত্তির পর্যন্ত গাইয়েছে। Ave Maria এবং আরো দুয়েকটা গান বেশ রীতিমত ভালো করে গেয়েছিলুম। বিস্তর অপরিচিত মেয়ে জানালাব ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে আমাকে বহুল সাধুবাদ দিয়ে গেল। আজ ভোরে বোধ হলো আমার গান এদের বাস্তবিক ভালো লেগেছে—Indian-এর গান বলে কেবল মাত্র বিস্ময় নয়। এই মাত্র Connolly এসে আমাকে বলে গেল: I say, Tagore, you sang awfully well this evening। আমি আগে যে রকম গলা চেপে গাইতুম এখন দেখছি সেটা ভারি ভুল। Then (you'll) remember me বলে একটা গান গাইলুম। আমার নব বন্ধুর সেটা ভারি ভালো লেগেছে,...। (Australian বোন) "বেশ Piano বাজায়। সেদিন একটা সুর বাজাচ্ছিল আমার খুব পরিচিত, যেটা নিয়ে Park St.-এ থাকতে প্রায় Parody করতুম—বোধহয় কী একটা Cavatina কিংবা Estudiantina কিংবা Dames de Seville কিংবা ঐ রকম একটা বিদিগিচ্ছি ব্যাপার। কিন্তু পরিচিত বলেই আমার ভারী ভালো লাগল। আজ রাত্তিরেও আমাকে গাইতে হলো।

"Mrs. Moeller আমাকে গান গাইতে অনুরোধ করলে, সে আমার সঙ্গে পিয়ানো বাজালে। Mrs. Moeller বললে: It is a treat to hear you sing। Webb এসে বললে—What would we do without you Tagore—there's nobody on board who sings so well। যা হোক, জাহাজে এসে আমার গান বেশ appreciated হচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে এর আগে আমি যে ইংরিজি গানগুলো গাইতুম, কোনোটাই tenor pitch-এ ছিল না তাই আমার গলা খুলত না। এবারে সমস্ত উঁচু pitch-এর music কিনেছি, তাই এত প্রশংসা পাওয়া যাচ্ছে।

"Schiller (একজন জর্মান সহযাত্রী) আমাকে বলছিল, তুমি যদি তোমার

গলার রীতিমত চর্চা কর তাহলে আশ্চর্য উন্নতি হতে পারে: 'You have a mine of wealth in your voice'।"

এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ১৭।১৮ বৎসর বয়সে, প্রথমবার বিলাত-ভ্রমণে গিয়ে সেদেশের কণ্ঠসংগীতের যে চর্চা গুরুদেব করেছিলেন, প্রায় দশ বছরের ব্যবধানেও তা তিনি ভোলেননি। তাই, এবারের এই অল্পদিনের চর্চায় তাঁর গান গাইবার শক্তির প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং গাইয়ে হিসেবে প্রশংসাও পাচ্ছেন। কিন্তু এবারে দেশে ফিরে আসার পর প্রথমবারের মতো বিদেশী সংগীতের উত্তেজনার কোনো পরিচয় পেলাম না। নতুন কোনো গীতনাট্য বা বিলাতি গানভাঙা বাংলা গান রচনারও কোনো খবর নেই। তবে, এটুকু জানা যায় যে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের কোনো এক সময়ে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয় আর একবার খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে করেছিলেন। এবারেও বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি স্বয়ং, দস্যুদলে ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুর-পরিবারের অনেকে। সরস্বতীর ভূমিকা নিয়েছিলেন ইন্দিরা দেবী, আর বালিকার ভূমিকায় ছিলেন অভিজ্ঞা দেবী। ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ল্যান্সডাউন-পত্নীর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে এই অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। ইন্দিরা দেবী তাঁর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' পুস্তকে এর একটু বিবরণ রেখে গেছেন—

"বাবা [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর] একবাব বিলেত থেকে আসবার সময়ে তাঁর সহযাত্রী তখনকার লাটপত্নী লেডী ল্যান্সডাউনকে জোড়াসাঁকোর বাড়ি আসবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।...কলকাতায় আসবার পর লাটপত্নী এই নিমন্ত্রণ রক্ষার অভিপ্রায় জানালে তাঁর জন্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র একটি বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। লেডী ল্যান্সডাউনের সঙ্গে তখনকার ছোট-লাটপত্নী লেডী এলিয়ট প্রভৃতি আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ ছিলেন।"

বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের যে ছবিটির সঙ্গে আমরা আজ পরিচিত সেটি তোলা হয়েছিল এইবারে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। শোনা যায় যে, গুরুদেব বাল্মীকির সাজে যে গাউনটি কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত পিছনে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন সেটি ঐ সময়ে প্রথম ব্যবহৃত হয়, আগে নাকি তা ছিল না। গভর্নর জেনারেল-পত্নী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ইংরেজ অতিথিদের কথা চিন্তা করে নাকি দস্যুদলের রাজার চিহ্ন হিসেবে এবারের সাজের সঙ্গে এটি যুক্ত হয়। দস্যুদলের শরীর যথাসম্ভব জামা, পাজামা ও পাগড়িতে ঢাকা হয়েছিল, কাবুলিদের অনুকরণে, যাতে তাঁদের

শরীরের কোনো অংশ বিশিষ্ট মহিলা অতিথিদের চোখে না পড়ে।

এই গীতনাট্য প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়ে বিশেষ করে বলার প্রয়োজন আছে। সে যুগের কলকাতা থিয়েটারগুলিতে বিলাতি আদর্শে সীন এঁকে এবং অন্য উপায়ে যেভাবে মঞ্চকে রিয়েলিস্টিক সাজে সাজানোর চেষ্টা করা হতো তাঁদের বাড়ির মঞ্চসজ্জাতেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের বাল্মীকি-প্রতিভার মঞ্চসজ্জার যে বর্ণনা রেখে গেছেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া' গ্রন্থে তাতে তার সাক্ষ্য মেলে। দুটো তুলোর বক, খড়ভরা একটা মরা হরিণ, সীনে আঁকা কচুবনে বরাহ ও বটের ডালপালা লাগানো হয়েছিল মঞ্চে। টিনের নল দিয়ে বর্ষার গানের সময় মঞ্চে জল ছাড়া, আয়না দিয়ে বিদ্যুতের আলো, টিন বাজিয়ে কড়্ কড়্ শব্দ, দোতলার ছাদ থেকে দুটো দম্বল গড়গড় করে এধার ওধার গড়ানো, টাট্টু ঘোড়ার পিঠে লুঠের মাল নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ এবং ঘোড়াকে মঞ্চে ঘাসটাস খাওয়ানোর দৃশ্যে নিমন্ত্রিত মেম ও সাহেবেরা মহাখুশী হয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে গুরুদেবের ৩২ বৎসর বয়স পর্যন্ত অভিনয়ে, সংগীতে ও সাজ-সজ্জায় বিলেতের প্রভাব কতখানি প্রবল। বিলাতি সংগীতের প্রতি সে বয়সেও তাঁর ভালোবাসা কতখানি গভীর ছিল তা জানা যায় তাঁর সে যুগের কয়েকটি চিঠি থেকে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়—

"এবারে চলে আসবার আগে যেদিন একদিন দুপুর বেলায় স পার্ক স্ট্রীটে এসেছিলেন, তুই পিয়ানোয় বসেছিলি, আমি গান গাবার উদ্যোগ করেছিলুম ·।"

আর-একটি চিঠিতে লিখছেন—"বেলি [প্রথম কন্যা] যদি দেশী এবং ইংরাজী সংগীতে বেশ ওস্তাদ হয়ে ওঠে তাহলে আমার অনেকটা সাধ মিটবে।

"আমার ভারি ইচ্ছা করছিল আমি এই রকম করে শুয়ে থাকি আর পাশের ঘর থেকে কেউ আপন ইচ্ছামত পিয়ানোতে একটার পর একটা বাজনা বাজিয়ে যায়। তার মধ্যে আমার সেই Chopin-টাও থাকে। মনের ভিতর এই রকম যে-ইচ্ছা জন্মায়, সেই ইচ্ছাটা অপরিতৃপ্ত থাকলেও তার ভিতরে একরকমের সুখ আছে।"

গুরুদেবের বিলাতি সংগীতানুরাগের কথা উল্লেখ করে ইন্দিরা দেবী লিখেছেন—

"আমি অবশ্য রবিকাকার অনেক বিলিতি গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজিয়েছি, সে-সব এখনও সেদিনের মূক সাক্ষী-স্বরূপ আমার গানের বাঁধানো বইয়ে পড়ে আছে, যথা,

'In the gloaming',

'Then you will remember me',

'Good night, good night, beloved',

সুইন্‌বার্নের 'If' ইত্যাদি। এছাড়া বেন্‌ জনসনের বিখ্যাত গান—

'Drink to me only with thine eyes' ভেঙে লিখেছিলেন 'কতবার ভেবেছিনু'। আর একটা গান, রোমান ক্যাথলিকদের বিখ্যাত স্তব 'আভেমারিয়া', রবিকাকা পিয়ানো ও বেহালার যুগল সংগতে গাইতেন, সেটি আমার বড় ভালো লাগত।…'Darling you are growing old' প্রভৃতি ইংরিজি গানের সুরও মজা করে টেনে টেনে গাইতেন।"*

এই ভাবে, ১৭।১৮ বৎসর বয়স থেকে ৩৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিলাতি কণ্ঠসংগীতের সার্থক চর্চার সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা পাই। এবং ইয়োরোপীয় সংগীত বিষয়ে তাঁর জ্ঞান যে বিলাতপ্রত্যাগত অন্যান্য শিক্ষিত ভারতীয়দের মতো শৌখিন ছিল না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই ইয়োরোপীয় সংগীতবিষয়ে তাঁর মতামতের মূল্য যথেষ্ট আছে বলেই মনে করি।

প্রথম-যৌবনে ইযোরোপীয় সংগীতের পূর্ণ সমর্থনে ভারতীয় সংগীতের উদ্দেশ্যে বিরূপ মতামত তিনি প্রকাশ করেন, কিন্তু দেখা যায়, তিরিশ বছরের কাছাকাছি বয়সে তিনি প্রথম অনুভব করছেন যে, উভয় দেশের সংগীতের প্রকৃতি এক নয়, দুয়ের মধ্যে প্রচুর প্রভেদ বর্তমান। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' থেকেই তা প্রথম জানতে পাই। সেই সময় থেকে তিনি উভয় দেশের সংগীতের প্রকৃত স্বরূপটি যে কী এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন। ডায়ারি বা দিনলিপির ১০ অক্টোবর তারিখে লিখছেন—

"…এখন অভ্যাসক্রমে য়ুরোপীয় সংগীতের এতটুকু আস্বাদ পাওয়া গেছে যার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে, যদি চর্চা করা যায় তাহলে য়ুরোপীয় সংগীতের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশী সংগীত যে আমার ভালো লাগে সে কথার বিশেষ উল্লেখ করা বাহুল্য। অথচ দুয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ জাতিভেদ আছে তার আর সন্দেহ নেই।"

এরই দিন ছয় পরে আবার লিখলেন—

"…আমার কাছে ইংরাজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরাজি সংগীত লোকালয়ের সংগীত, আর আমাদের সংগীত প্রকাণ্ড

* রবীন্দ্র স্মৃতি।

নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় বিষাদের সংগীত।"

দুই দেশের সংগীতের তুলনামূলক গুরুদেবের এই চিন্তা প্রায় বছর চার পরে, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের এক চিঠিতে আরো বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হলো। তিনি লিখলেন—

"আমার মনে হয় দিনের জগৎটা য়ুরোপীয় সংগীত, সুরে-বেসুরে খণ্ডে-অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্মনির জটলা—আর, রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত, একটি বিশুদ্ধ করুণ গম্ভীর অমিশ্র রাগিণী। দুটোই আমাদের বিচলিত করে, অথচ দুটোই পরস্পরবিরোধী।…কী করা যাবে।… আমরা ভারতবর্ষীয়েরা সেই রাত্রির রাজত্বে থাকি— আমরা অখণ্ড অনাদি দ্বারা অভিভূত। আমাদের নির্জন এককের গান, য়ুরোপের সজন লোকালয়ের সংগীত। আমাদের গান শ্রোতাকে মনুষ্যের প্রতিদিনের সুখদুঃখের সীমা থেকে বের করে নিয়ে নিখিলের মূলে একটি সঙ্গীবিহীন বৈরাগ্যের দেশ আছে সেইখানে নিয়ে যায়—আর য়ুরোপের সংগীত মনুষ্যের সুখদুঃখের অনন্ত উত্থান-পতনের বিচিত্র-ভাবে নৃত্য করিয়ে নিয়ে চলে।"

ভারতীয় ও ইযোরোপীয় সংগীতের স্বরূপ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তা এর পর থেকে একই খাতে জীবনের শেষ পর্যন্ত বয়ে গেছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর জীবনস্মৃতি-র 'বিলাতি সংগীত' নামে পরিচ্ছেদে দুই দেশের সংগীতের এই পার্থক্যের পুনরালোচনা করে বললেন—

"য়ুরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তবজীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। তাই দেখিতে পাই, সকল রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া য়ুরোপে গানের সুর খাটানো চলে; আমাদের দিশি সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভুত হইয়া পড়ে, তাহাতে রস থাকে না। আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, এই জন্য তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য;…

…য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে একদিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত, এ সংগীত রোমান্টিক।…ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সংগীতে কোথাও কোথাও সে-চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে-চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই।"

এ ছাড়া তাঁর প্রথম-যৌবনের যে বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, গায়কেরা "গানের কথার সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের

উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।" তখনকার তাঁর এই মতটি যে ভ্রান্ত, এবারেই প্রথম বিনা দ্বিধায় তিনি তা স্বীকার করছেন, এবং বলছেন—

"যে মতটিকে [১৮৮১ খৃষ্টাব্দের বক্তৃতা] তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে-মতটি যে সত্য নয়, সে-কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইযা যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহন মাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো; বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে? বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এইজন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভালো। হিন্দুস্থানি গানের কথা সাধারণতঃ এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুর আপনার আবেদন অনাযাসে প্রচার করিতে পারে। এইরূপে রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপ ভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সংগীতের উৎকর্ষ। কিন্তু বাংলাদেশে বহুকাল হইতে কথারই আধিপত্য এত বেশি যে এখানে বিশুদ্ধ সংগীত নিজের স্বাধীন অধিকাবটি লাভ করিতে পারে নাই। সেই জন্য এ দেশে তাহাকে ভগিনী কাব্যকলার আশ্রয়েই বাস করিতে হয। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাবুর গান পর্যন্ত সকলেরই অধীন থাকিয়া সে আপনার মাধুর্য বিকাশের চেষ্টা করিযাছে। গান রচনা করিবার সময় এইটে বার বাব অনুভব করা গিযাছে।"

পরবর্তী বাকি জীবন, সংগীত বিষয়ক বহু লেখায়, উভয় দেশের সংগীতের আলোচনার সময় তিনি একই অভিমতের পুনরুক্তি করে গেছেন নানা ভাবে। পূর্ণরূপে সুগঠিত এই মত। তাই এর কোনো পরিবর্তন আর ঘটেনি।

প্রভাবের এই আলোচনা থেকে যে ক'টি মূল তথ্য আমরা পেলাম, তা হচ্ছে—

১৮৮১ থেকে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইয়োরোপের সংগীতচিন্তার প্রভাবে গীতি-নাটক রচনা ও তার অভিনয়ের প্রতি অত্যধিক আগ্রহ।

গীতিনাটকের গানগুলি, অভিনয়কালে গাইবার যে পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল তা প্রাচীন বা প্রচলিত কোনো প্রকার ভারতীয় গীতিনাটকের আদর্শ অনুযায়ী নয়।

গীতিনাটকের ভারতীয় সুরের গানগুলি ইয়োরোপীয় সংগীতচিন্তার প্রভাবে যে ভাবে রচিত এবং গীত হয়েছিল তাকে আমরা বলব সমন্বয়ধর্মী প্রভাবের ফল।

বিলাতি গান-ভাঙা যাবতীয় বাংলা গান গীতিনাটকের যুগেই রচিত হয়। সংখ্যায় বেশির ভাগ রচিত হয়েছিল গীতিনাটককে অবলম্বন করে।

অনেকে, ইংরাজি ভাঙা বাংলা গানকেই প্রভাবের একমাত্র লক্ষণ বলে মনে করেন। আমাদের মতে তা ঠিক নয়। এ গানের সংখ্যার স্বল্পতায় এবং গুরুদেবের ২৭ বৎসর বয়েসের পর থেকে ভাঙা-গান আর রচিত না হওয়াতে, স্বভাবতই বলা যেতে পারে যে, আজীবন প্রেরণা যোগাবার মতো সুরের ঐশ্বর্যের সন্ধান তিনি এর মধ্যে আর পাননি। এ ছাড়া, ভাঙা-গানগুলি সুরের দিক থেকে হুবহু অনুকরণজাত বলেই গুরুদেবের মনে এভাবে গান রচনায় আর উৎসাহ জাগেনি। তাই ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রকৃত প্রভাব যে কোথায় তা খুঁজতে হবে অন্যত্র। গীতিনাটকের গান রচনার সময় তার সূত্রপাত এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত সেই প্রভাব রবীন্দ্রসংগীতে নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে। একে বলা চলে উভয় ধারার সমন্বয়ধর্মী প্রভাব।

১৮৭৮ এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে গুরুদেব ইংলণ্ডে যে সব ইংরাজি গান ভাল করে শিখেছিলেন এবং গাইতে পারতেন, তার তালিকা এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে তা উদ্ধৃত করছি।—

১ 'Won't you tell me, Molly darling.'
২ 'Darling, you are growing old.'
৩ 'Good-bye, sweet heart, Good-bye.'
৪ 'Then you will remember me.'
৫ 'In the gloaming.'
৬ 'Goodnight, goodnight, beloved.'
৭ 'Go where glory waits thee.'
৮ 'The Vicar of Bray.'
৯ 'Of all the wives as e'er (Nancy Lee).'
১০ 'The British Grenadiers.'
১১ 'Ye bank and braes.'
১২ 'Robin Adair.'
১৩ 'If' (By Swinburn.)
১৪ 'Drink to me only with Thine eyes.' (By Ben Jonson)
১৫ 'Ave Maria.' (Roman Catholic Chant).
১৬ 'Serenade.' (By Gounod).

Gounod-এর সঙ্গীত Messe Solennelle এবং Faust, Chopin-এর Funeral March এবং Galops, আর Wagner-এর Parsifal অপেরার সঙ্গে গুরুদেব যে ভালরকমে পরিচিত ছিলেন তা তাঁর লেখা থেকে অনুমান করা যায়।

গতিশীল আবেগের গান

১২৮৭ সালে বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাটকের প্রথম অভিনয়ের পর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর ১২৮৮ সালে প্রকাশিত "সঙ্গীত ও ভাব" এবং "সঙ্গীত ও কবিতা" নামে দুটি প্রবন্ধে বলেছিলেন যে, ভারতীয় সঙ্গীতে কবিতার মত বিচিত্র ভাবের লীলাময়, ছায়ালোকময় পরিবর্তনশীল রূপ দেখা যায় না। কবিতায় বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম এবং পাথরের ন্যায় স্থূল ভাবসকল প্রকাশ করা যেমন সহজ হয়েছে গানে তা হয়নি। কবিতার মত চলনশীল বা গতিশীল ভাবের গান আমাদের দেশের রাগরাগিণীর সাহায্যে রচিত হয় না। ভারতীয় সঙ্গীত একটি স্থায়ী ভাবেরই মাত্র ব্যাখ্যা করে।

প্রথম যৌবনে ইংলণ্ডে গিয়ে বিলেতি কণ্ঠসঙ্গীতের চর্চার পর ভারতীয় সঙ্গীতের এইরূপ একটি অভাবের চিন্তা গুরুদেবের মনে উদয় হয় এবং তার সমাধানের ইচ্ছা থেকেই বাল্মীকি-প্রতিভা গীতনাটকটি রচনা করে এবং তার অভিনয়ের মাধ্যমে তা নিয়ে পরীক্ষায় নেমেছিলেন।

গুরুদেব ইংলণ্ড থেকে ফিরেছিলেন ১২৮৬ সালের মাঘ মাসে বা ইংরাজি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। ১২৮৭ সালের ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনীত হলো। এর কয়েক মাস আগেই নাটকটির রচনা ও মহড়ার কাজ শুরু করেছিলেন। নাটকটির গানগুলি রচনার সময় দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিয়ানো যন্ত্রে কিভাবে দেশী ও বিদেশী গানের সমন্বয়ের কাজ চলেছিল "জীবনস্মৃতি"তে তার খবর দিয়ে গুরুদেব লিখছেন :—

"বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যে-উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে-উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাব ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথা বিরুদ্ধ বিপর্যস্ত ভাবে দৌড় করাইবা মাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানা প্রকার কথা

কহিতেছে, এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথা যোজনার চেষ্টা করিতাম।"

উদ্ধৃত বর্ণনাটুকু থেকে জানা যাচ্ছে যে, বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর জ্যোতিদাদা ও অক্ষয়বাবুর সঙ্গে গুরুদেব নানা প্রকৃতির দেশীসুরের গানকে বিলিতি আদর্শে নূতন রূপে প্রকাশের চেষ্টা করেছিলেন। এর পূর্বে এ প্রকারের প্রচেষ্টার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

বাল্মীকি-প্রতিভার প্রায় সব ক'টি গানই হল্পো দেশী নানা প্রকার রাগরাগিণী বা সুরে বাঁধা দু-কলি বা চার কলির গান। কিন্তু নাটকের চরিত্রগুলি যখন পরস্পরের মধ্যে গানের সুরে উত্তর প্রত্যুত্তরে কথা বলে তখন পর পর রাগিণীর পরিবর্তন এবং ভাবানুযায়ী লয়ে পরিবর্তনের দ্বারা পুরো একটি দৃশ্যের গানে স্থূল, সূক্ষ্ম নানা ভাবের সঙ্গে গতিশীলতার লক্ষণ সহজেই অনুভূত হয়। কিন্তু, নাটকটির প্রথম দৃশ্যের একটি বিশেষ গানে এইরূপ লক্ষণ স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এর কারণ হলো এ গানটি হুবহু ইংরাজি গানের অনুকরণে রচিত, যাকে আমরা বলবো ইংরাজি-ভাঙা বাংলা গান। গানটি হলো "কালী কালী বল রে আজ"। গানটিতে শিকারে যাবার পূর্বে দস্যুদল তাঁদের আরাধ্যাদেবী শ্যামা মায়ের কাছে উত্তেজক ভাষায় প্রার্থনা জানাচ্ছে। গানটির আরম্ভের চার পংক্তিতে ঢিমা লয়ের ভাঙাছন্দ, পঞ্চম পংক্তি "ঐ ঘোর মত্ত করে নৃত্য" থেকে "হা হা হা" পর্যন্ত লয় দ্রুত। "আরে বল রে শ্যামা মায়ের জয়" থেকে বাকি শেষ অংশ গাইতে হবে মধ্যলয়ে, ছন্দ ভেঙে। গানটির শব্দোচ্চারণে ও স্বর প্রকাশের ভঙ্গীতে বৈচিত্র্য দরকার হয় উদ্দীপনার ভাব প্রকাশের জন্য।

ঢিমালয়ের ভাঙাছন্দ

কালী কালী বল রে আজ,
বল হো, হো, হো, বলহো, হো, হো, বলহো!
নামের জোরে সাধিব কাজ,
বলহো, হো, বলহো, বলহো!

দ্রুত ছন্দ

ঐ ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গমাঝারে,
ঐ লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে,
ঐ লট্টপট্টকেশ, অট্ট অট্ট হাসে রে;
হাহাহা, হাহাহা, হাহাহা!

মধ্যলয়ের ভাঙা ছন্দ

আরে বল রে শ্যামা মায়ের জয় জয়,
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়,
আরে বল রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়,
আরে বল্‌রে শ্যামা মায়ের জয়।

এইভাবে বাল্মীকি-প্রতিভার গান রচনার পর গুরুদেবের কাছে গানে সুর যোজনার একটি নূতন পথ খুলে গেল। অর্থাৎ, ভারতীয় সঙ্গীতের কলিবিভাগের রীতিতে সুর না বসিয়ে একটানা পংক্তির পর পংক্তির ভাব ধরে প্রথম থেকে শেষ অবধি গাইবার উপযোগী গান রচনার প্রেরণা তাঁর মনে জাগল। এবং এও বুঝলেন যে, গান গাইবার সময় কথার ভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্থানে স্থানে লয় বদল করারও দরকার হয়।

গুরুদেবের গান রচনার এই নূতন প্রচেষ্টা কেবল মাত্র বাল্মীকি-প্রতিভাতেই যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। সে যুগে, তাঁর সাধারণ লিরিক আবেগের দু-একটি গানেও এর প্রকাশ লক্ষ্য করি। "বলি, ও আমার গোলাপ-বালা" গানটি গুরুদেব রচনা করেছিলেন এক ভাবে, আহমদাবাদে, প্রথমবার বিলাত যাত্রার পূর্বে। বিদেশ থেকে ফিরে গানটিকে নিয়ে মাজাঘষা করেছিলেন। বর্তমানে যে ভাবে গানটিকে আমরা পাই সে রূপ গানটি পেয়েছিল ইয়োরোপীয় সঙ্গীতচিন্তার প্রভাবে গান রচনার পরীক্ষার যুগে। গানটিতে ভারতীয় কলিবিভাগের রীতিতে সুর যোজনা করলেন না। গানটি গাইতে আরম্ভ করে একটানা তেইশ পংক্তি পর্যন্ত গেয়ে শেষ করতে হয়।

বেহাগ একতালা

বলি, ও আমার গোলাপ-বালা,
তোল মু'খানি, তোল মু'খানি,
কুসুমকুঞ্জ কর আলা!
বলি, কিসের সরম এত!
সখি, কিসের সরম এত!
সখি, পাতার মাঝারে লুকায়ে মু'খানি
কিসের সরম এত!
বালা, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা,
সখী, ঘুমায় চন্দ্রতারা,

প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্‌বালারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় জগৎ যত!
সখি, বলিতে মনের কথা,
বল, এমন সময় কোথা!
প্রিয়ে, তোল মু'খানি আছে গো আমার
প্রাণের কথা কত!
আমি এমন সুধীর স্বরে,
সখি, কহিব তোমার কানে,
প্রিয়ে, স্বপনের মত সে কথা আসিয়ে
পশিবে তোমার প্রাণে।
তবে, মু'খানি তুলিয়া চাও
সুধীরে মু'খানি তুলিয়া চাও!
সখী, একটি চুম্বন দাও
গোপনে, একটি চুম্বন দাও।

একই কালে, একই আদর্শে বেহাগ-খাম্বাজ রাগিণীতে গুরুদেব রচনা করেছিলেন "সখি, ভাবনা কাহারে বলে?" গানটি। এর মোট পংক্তি সংখ্যা হলো একত্রিশ।

বেহাগ-খাম্বাজ—একতালা
সখি, ভাবনা কাহারে বলে?
সখি, যাতনা কাহারে বলে?
তোমরা যে বল দিবস-রজনী
ভালবাসা ভালবাসা—
সখি ভালবাসা কারে কয়?
সেকি কেবলি যাতনাময়?
তাহে, কেবলি চোখের জল?
তাহে কেবলি দুখের শ্বাস?
লোকে তবে করে কি সুখের তরে
এমন দুখের আশ?

আমার চোখে তো সকলি শোভন,
সকলি নবীন, সকলি বিমল,
সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন,
বিশদ জোছনা, কুসুম কোমল,
সকলি আমারি মত।

(তারা) কেবলি হাসে, কেবলি গায,
হাসিযা খেলিযা মরিতে চায়,
না জানে বেদন, না জানে রোদন,
না জানে সাধের যাতনা যত!
ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে,
জোছনা হাসিযা মিলায়ে যায,
হাসিতে হাসিতে আলোক-সাগরে
আকাশের তারা তেযাগে কায।
আমার মতন সুখী কে আছে।
আয সখী আয আমার কাছে!
সুখী হৃদয়ের সুখের গান
শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ।
প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল
একদিন নয হাসিবি তোরা,
একদিন নয বিষাদ ভুলিয়া
সকলে মিলিযা গাহিব মোরা।

এ গান দুটি ১২৮৭ সালের কোন এক সময়ে রচিত। আমাদের দেশে বহু পংক্তির সমষ্টি বড় কবিতাতে এইরূপ সুর যোজনার রীতি পূর্বে দেখা যায়নি।

১২৮৯ সালের মাঝামাঝি গুরুদেবের দ্বিতীয় গীতনাট্য "কালমৃগয়া" রচিত ও অভিনীত হলো বাল্মীকি-প্রতিভার রীতিতে। এর পর থেকে তিনি তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত বহুপংক্তির সমষ্টি বেশ কিছু বড় কবিতাকে একই রীতির দেশী সুরের গানে পরিণত করেছিলেন। যেমন:—

১। আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে।
২। তোমরা হাসিযা বহিযা চলিযা যাও।

৩। এই তো ভালো লেগেছিল।

৪। এস এস বসন্ত ধরাতলে।

৫। এ শুধু অলসমায়া।

৬। কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া।

৭। প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়।

এই গানগুলির সুর যোজনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে দু-একটি কথা বুঝিয়ে বলার দরকার আছে।

উচ্চাঙ্গের হিন্দী সঙ্গীতের রাগ বা রাগিণীকে যখন আলাপের রীতিতে বিস্তার করা হয় তখন রাগিণীর মূল স্থায়ী লিরিক আবেগটি একটি বিশেষ গতি লাভ করে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, নানা রূপে এগিয়ে চলে। গুরুদেবের লিরিক আবেগের উপরোক্ত বড় কবিতাগুলির স্থায়ী আবেগটি শব্দ ও ছন্দেব ব্যঞ্জনায় সেই রূপবৈচিত্র্যে লীলায়িত, ছোট একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায়নি। এই সব কবিতার প্রতি পংক্তির অর্থ বা ভাব অবলম্বনে গুরুদেব যখন সুর যোজনা করলেন তখন স্বভাবতই দেখা গেল, গান হিসেবেও কবিতাগুলির গতিশীলতা ব্যাহত হয়নি। তাই প্রথম থেকে একটানা গেয়ে এই গান ক'টি শেষ করতে হয়। তালিকায় উদ্ধৃত "আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে' এবং "এস এস বসন্ত ধরাতলে' গান দুটি একটু ভিন্ন ধরনের। অন্য গানগুলি একটানা গেয়ে শেষ করা হয় বাঁধা ছন্দের তালে। কিন্তু "আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে" গানটি সেভাবে গাওয়ার রীতি নয়। কথা বলার ঢং-এ ভাঙা ছন্দে গাইতে হবে।

"এস এস বসন্ত ধরাতলে" গানটির মোট পংক্তি সংখ্যা তেইশ। মিশ্ররাগিণী এবং চতুর্মাত্রিক ছন্দের তালে এটি রচিত। প্রচলিত কলি বিভাগের রীতিতে রাগিণী বসানো হয়নি বলে আস্থায়ীর সুরে বারে বারে ফিরে আসার কোন সুযোগ এ গানটিতে নেই। গানটি বাঁধা তালে রচিত হলেও পংক্তির ভাবানুযায়ী তালের লয় পরিবর্তন করে, কখনো ঢিমালয়ে, কখনো মধ্যলয়ে, কখনো দ্রুতলয়ে তা গাইতে হবে একটানা না থেমে।

(মধ্য লয়)

এস এস বসন্ত ধরাতলে ;

আন মুহু মুহু নবতান, আন নব প্রাণ, নব গান,

আন গন্ধমদভরে অলস সমীরণ,

(দ্রুত লয়)

আন বিশ্বের অন্তরে অন্তরে নিবিড় চেতনা।

আন নব উল্লাস হিল্লোল,

আন আন আনন্দ ছন্দের হিন্দোলা ধরাতলে।

ভাঙো ভাঙো বন্ধন-শৃঙ্খল

আন আন উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা ধরাতলে॥

(মধ্য লয়)

এস থর-থর-কম্পিত , মর্মরমুখরিত, নবপল্লব-পুলকিত

ফুল-আকুল মালতীবল্লী-বিতানে, সুখছায়ে, মধুবায়ে।

(দ্রুত লয)

এস বিকশিত উন্মুখ, এস চির উৎসুক, নন্দনপথচিবযাত্রী।

এস স্পন্দিত নন্দিত চিত্ত-নিলয়ে গানে গানে প্রাণে প্রাণে॥

(ঢিমা লযে)

এস অরুণ-চরণ কমল-বরণ তরুণ উষাব কোলে।

এস জ্যোৎস্না-বিবশ-নিশিথে, কলকল্লোল তটিনীতীরে,

সুখসুপ্ত সরসী নীরে।

(দ্রুত লয়ে)

এস তড়িৎ-শিখাসম ঝঞ্ঝাবিভঙ্গে সিন্ধুতরঙ্গদোলে।

এস জাগর-মুখর প্রভাতে, এস নগরে প্রান্তরে বনে,

এস কর্মে বচনে মনে, এস এস

(মধ্য লয়ে)

এস মঞ্জীব-গুঞ্জর চরণে, এস গীতমুখর কলকণ্ঠে,

এস মঞ্জুল মল্লিকা-মাল্যে, এস কোমল কিশলয় বসনে।

(দ্রুত লয়ে)

এস সুন্দব, যৌবন-বেগে, এস দৃপ্তবীর, নব তেজে,

ওহে দুর্মদ, কর জযযাত্রা, চলজরা-পরাভব সমরে,

পবনে কেশর-রেণু ছড়াযে, চঞ্চল কুন্তল উড়াযে॥

কথা বলার রীতির গান

বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া গীতনাট্য বিষয়ে গুরুদেব বলেছিলেন :—

"ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু গীতনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকী মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে।...যাঁহারা এই গীতনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা, আশা করি, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকি-প্রতিভা গীতনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব।...উহা সঙ্গীতের একটি নূতন পরীক্ষা।...সঙ্গীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্য বিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র।"

বৈঠকি গান বলতে গুরুদেব বাংলাদেশের তৎকালীন ধনী শিক্ষিত সমাজের বৈঠকে প্রচলিত উচ্চাঙ্গের নানা প্রকৃতির হিন্দী গান এবং বাংলা গানের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। ঐ সব হিন্দী ও বাংলা গানগুলিকে ভেঙে গুরুদেব তাঁর গীতনাটকের কথোপকথনের উপযোগী গানে পরিণত করলেন। নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রের কথাবার্তায় রাগ, দুঃখ, হাসি, কান্না, ভয়, ঠাট্টা, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি হৃদয়াবেগের কথা বর্তমান, কিন্তু, অভিনয়ের সময়ে সেগুলিকে নানা রাগিণীতে কথার ঢং-এ গেয়েছিলেন। এগুলি প্রচলিত গান রূপে দেখা দেয়নি, সঙ্গীতশাস্ত্রানুযায়ী তালের কোন বাঁধনও ছিল না এর অধিকাংশ গানে। সেই কারণেই গুরুদেব বলেছিলেন, "বাল্মীকি-প্রতিভা'য় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।"

এই গীতনাট্য দুটির রচনা ও অভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে গুরুদেব কয়েক মাস পরে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিলের সায়াহ্নে বেথুন সোসাইটিতে গানের উদাহরণ সহ একটি বক্তৃতা, 'ভারতী' পত্রিকায় 'সঙ্গীত ও ভাব', 'সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' এবং 'সংগীত ও কবিতা' নামে প্রবন্ধ ক'টি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর গীতনাট্য দুটির গানগুলি কী আদর্শে রচিত এবং কেন কথার ঢং-এ তা গাইলেন সে কথা বোঝাবার ইচ্ছায়। তিনটি প্রবন্ধই 'বাল্মীকি-প্রতিভা'

ও 'কালমৃগয়া' গীতনাট্য দুটির অভিনয় কালে রচিত। প্রবন্ধ ক'টির কতগুলি পংক্তি উদ্ধৃত করে দেখাবার চেষ্টা করবো যে, সেই সব চিন্তাকে বাল্মীকি-প্রতিভার নানা হৃদয়াবেগের গানে কার্যকরী করে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

১। "আমরা যখন রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাশি সুরের ব্যবধান অতি অল্পই থাকে, রোদনের স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত টানা হয়।"

বাল্মীকি-প্রতিভার গারাভৈরবী রাগিণীর "হা কী দশা হল আমার" এবং গৌরীরাগিণীব "বলব কী আর বলব খুড়ো—উঁ, উঁ," গান দুটি তালের নিয়ম ভাঙা কথার ছন্দে ঢিমা লয়ে গাওয়া হয়। দ্বিতীয় গানটির "উঁ, উঁ," শব্দটিতে রাগিণী ঠিক রেখে বাস্তবানুগ কান্নার সুব গলায় প্রকাশ করাই হলো রীতি।

২। "আমবা যখন হাসি হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা সুর একটিও নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দুব ব্যবধান, আর তালের ঝোঁকে ঝোঁকে সুর লাগে।"

পিলুবাগিণীর "পথ ভুলেছিস সত্যি বটে" গানটির "হা হা হা হা হা হা" এবং কানাড়া রাগেব "হাঃ হাঃ ভাযা খাপ্পা" গান দুটিতেই হাসির হা হা শব্দে রাগিণী ঠিক রেখে, ঝোঁক দিয়ে হুবহু হাসির অভিনয়ে গাইতে হয়; এ ছাড়া পুরো গান দুটির সুরগুলি পরস্পরের মধ্যে বেশ একটু ব্যবধান রেখেই গঠিত।

৩। "সুখের রাগিণী সুখেব দিবসের ন্যায় অতিদ্রুত পদক্ষেপে চলে, দুই তিনটি সুর ডিঙ্গাইয়া যায়। আমাদের রাগিণীর মধ্যে উল্লাসের সুর নাই। আমাদের সঙ্গীতের ভাবই ক্রমে ক্রমে উত্থান বা ক্রমে ক্রমে পতন। সহসা উত্থান বা সহসা পতন নাই। উচ্ছ্বাসময় উল্লাসের সুরই অত্যন্ত সহসা।...ঘোরতর উল্লাসের সুর ইংরাজি রাগিণীতে আছে, আমাদের রাগিণীতে নাই বলিলেও হয়।"

খাম্বাজে "একডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে" এবং ইমনকল্যাণ রাগিণীতে "এই বেলা সবে মিলে চল হো" দস্যুদের উল্লাসের গান। এ দুটি গানে সুরের সহসা উত্থান ও পতন কীভাবে ঘটেছে তা লক্ষ্য করার মত।

৪। "অনেক সময়ে আমরা উল্লাসের গান রচনা করিতে হইলে রাগিণী যে ভাবেরই হউক তাহাকে দ্রুত তালে বসাইয়া লই।"

ভাটিয়ারি রাগের "এত রঙ্গ শিখেছ কোথায় মুণ্ডমালিনী" হলো দ্রুত তালের দস্যুদের উল্লাসের গান।

৫। ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালও দ্রুত বিলম্বিত করা আবশ্যক— সর্বত্রই যে তাল সমান রাখিতে হইবে তাহা নয়।"

ইংরাজি গান ভাঙা "কালী কালী বল রে আজ" গানটিতে এর পরিচয় খুবই সুস্পষ্ট। এ ছাড়া বেহাগ রাগিণীর একটি গানে ভাবানুযায়ী লয়ের পরিবর্তন কী ভাবে করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ সেইরূপ একটি গানের উল্লেখ করবো। গানটি বাল্মীকি গেয়েছেন।

"কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে।"

আস্থায়ী অংশের এ-পর্যন্ত ঢিমালয়ে কথার ছন্দে গাইতে হবে।

"যাই দেখি শিকারেতে
রহিব আমোদে মেতে
ভুলি সব জ্বালা বনে বনে ছুটিয়ে।"

দ্রুতলয়ের বাঁধা ছন্দে একটানা অন্তরার এই তিন পংক্তি গেয়ে, প্রথম অংশের "কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে" পংক্তি ফিরে পূর্ব নিয়মে তা গাইতে হবে।

"আপনা ভুলিতে চাই, ভুলিব কেমনে—
কেমনে যাবে বেদনা।"

সঞ্চারীর এই কলিটি গাওয়া হয় মধ্যলয়ে কথার ঢং-এ।

"ধরি ধনু আনি বাণ
গাহিব ব্যাধের গান,
দলবল লয়ে মাতিব।"

আভোগের এই অংশটি দ্রুতলয়ে বাঁধা ছন্দে গাহিবার পর "কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে" পূর্বের নিয়মানুসারে গেয়ে গেয়ে গানটি শেষ করতে হবে। এ গানটির প্রথম পংক্তি, আরম্ভেই কেবল গাওয়া হয়, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রতি কলির শেষে ফিরে ফিরে গাওয়া হয় না।

৬। "যেমন তাল আছে তেমনি থাকুক, মাত্রা বিভাগ যেমন আছে তেমনি থাকুক, কেবল একটা নির্দিষ্ট স্থানে সমে ফিরিয়া আসিতেই হইবে এমন বাঁধাবাঁধি না থাকিলে সুবিধা বই অসুবিধা কিছুই দেখিতেছি না।"

"যেমন তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়। তালে সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট, তাহার উপরে আরো কড়াক্কড় করা ভালো বোধ হয় না।"

মিশ্র বাগেশ্রীতে—"ছাড়ব না ভাই ছাড়ব না ভাই', বাহারে—"গহনে গহনে যা রে তোরা" এবং নটনারায়ণে—"আর না, আর না, এখানে আর না" গান তিনটির বেশির ভাগ পংক্তি গাওয়া হয় তালের ছন্দে; দু-এক জায়গায় তা ভাঙতে হয়। কিন্তু তাল আছে বলেই নিয়মিত সমের ঝোঁককে বিশেষ করে দেখাবার জন্ম বারে বারে পুনরুক্তি করার সুযোগ নেই। প্রতি পংক্তি ছন্দ রেখে গেয়ে শেষ করতে হবে। পংক্তি শেষ হলেও সম বা ফাঁকের নিয়মে তা থামে না।

৭। "গীতনাট্যে যাহা আদ্যোপান্ত অভিনয় করিতে হয় তাহাতে স্থান বিশেষে তাল না থাকা বিশেষ আবশ্যক। নইলে অভিনয়ের স্ফূর্তি হওয়া অসম্ভব।"

বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়ার অধিকাংশ গানই গুরুদেব রচনা করেছিলেন, তাঁর জানা সে-যুগের প্রচলিত হিন্দী ও নানা প্রকার বাংলা গান ভেঙে। এই কারণে, ঐ গানগুলিকে আমরা বলতে পারি ভাষান্তরিত গান। নিজস্ব গান প্রায় নেই বললেই চলে। বিলাতি সুরের কয়েকটি ভাঙা গান ছিল। বাকি সবই দেশী গানের অনুসরণে রচিত। কিন্তু সব ক'টি মূলগান যখন ভাষান্তরিত হয়ে নাটকে গীত হলো তখন তাতে দেখা দিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। কারণ, সেগুলিকে গাওয়া হলো সুরে কথা বলার ঢং-এ। গীতনাট্যের গানের এই বিশেষত্বটির কথা বোঝাতে গিয়ে গুরুদেব বললেন—

"নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সঙ্গীত-মাধুর্য ইহার অতি অল্পই আছে।...ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টা মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।"

এই ভাবে, বাল্মীকি-প্রতিভা রচনার সময় সুর যোজনার নিম্নোক্ত মূল রীতি ক'টি গুরুদেবের কাছে ধরা পড়েছিল, বরাবরের মত তাঁর মনে তা গেঁথে গিয়েছিল এবং তিনি স্থির জেনেছিলেন—

১। হতাশা, বিষণ্ণতা, বিরহ, দুঃখ বা রোদনের ভাবযুক্ত কথার রাগিণী গড়ানো এবং অত্যন্ত টানা হবে।

২। প্রাণবন্ত, জীবনী শক্তিপূর্ণ, হাসিখুসি, সুখের ও উচ্ছাসময় উল্লাসের গানে সুর দ্রুতপদক্ষেপে চলবে, দুই তিনটি সুর ডিঙ্গিয়ে যাবে অথবা অত্যন্ত সহসা উঠবে বা নামবে।

৩। শ্রদ্ধা, নিবেদন, বন্দনা ও গম্ভীর আবেগের কথার সুর হবে না গড়ানো। স্বরগুলি কাছাকাছি বসবে এবং লয় অত্যন্ত ঢিমা বা অত্যন্ত দ্রুত হবে না।

৪। অভিনয়ের মত কথাবার্তার ঢং-এ গান গাইতে হলে ভাবানুযায়ী

একই গানের মধ্যে লয়ের তফাত করতেই হবে।

ভাবানুযায়ী সুর যোজনার মূল এই ক'টি রীতিকে গুরুদেব তাঁর পরবর্তী জীবনের নানা পর্যায়ের গানে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত। তাঁর গানে হার্বার্ট স্পেন্সরের সঙ্গীত-চিন্তার বা ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের প্রভাবের এটিই হলো উল্লেখযোগ্য দিক।

ভারতীয় সঙ্গীত হলো রাগরাগিণী ও ছন্দের বিপুল ও বিচিত্র ভাণ্ডার বিশেষ। তাই, সুর ও ছন্দের জন্য গুরুদেবের অন্যদেশের কাছে হাত পাততে হয়নি। কথার ভাবানুযায়ী সুর ও ছন্দপ্রয়োগের কতকগুলি বিশেষ রীতি আমাদের দেশের প্রাচীন সঙ্গীতেও ছিল। এর প্রতি গুরুদেবের দৃষ্টি পড়ে বিদেশী চিন্তায় গীতনাট্য রচনা করতে গিয়ে। এর পরে, সেই জন্যেই ভারতের প্রাচীন সঙ্গীত-সম্পদকে ব্যাপকভাবে সঙ্গীতসৃষ্টির কাজে ব্যবহার করতে তাঁর সুবিধা হয়েছিল। কথার ভাবানুযায়ী কিভাবে প্রাচীন ভারতে গান রচিত হতো সংক্ষেপে তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

চৌতালে রচিত হিন্দী ধ্রুপদ গানের গতি ধীর ও প্রকৃতি গম্ভীর, সুর যোজনার পদ্ধতি সহজ, সরল ও নিরাভরণ। এ গানে চাঞ্চল্য নেই। গানগুলি শান্ত, উদাত্ত ধর্মসাধনার অনুকূল। এ গানে অকম্পিত সুরই অধিক, কিন্তু, গমক ও মীড় প্রধান। রাগরাগিণীর শুদ্ধতার প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন গায়কেরা গাইবার সময়। বন্দেসী হিন্দী গানের সুরের পরিবর্তন করার স্বাধীনতা ছিল না গায়কদের। প্রতিটি সুরকে কথার উপর স্পষ্টভাবে প্রকাশিত করাই হলো এ গানের প্রচলিত রীতি। খেয়াল আদিপর্বে ছিল ধ্রুপদেরই জ্ঞাতি। গুরুদেবের গম্ভীর প্রকৃতির যাবতীয় গানে ধ্রুপদ ও আদিযুগের খেয়ালের এই গাম্ভীর্য প্রকাশিত। ধীর গম্ভীর প্রকৃতির গানগুলির প্রায় সবই চৌতাল, ধামার, ঢিমা-তেতালা ও একতালার ছন্দে হিন্দী গানের আদর্শেই গুরুদেব রচনা করেছিলেন।

ঝাঁপতাল, তেওড়া তালের প্রাচীন হিন্দী গানে উদ্দীপনা বা উল্লাসের গান-গুলির স্বর সহসা উপরে এবং নীচে বেশ কিছু ব্যবধান রেখে ওঠানামা করে। গুরুদেব তাঁর নিজের রচিত একই ভাবের গানে এই তালগুলি ব্যবহার করেছেন এবং তার সুর যোজনার রীতি এক।

খেয়াল হলো চঞ্চল আনন্দের গান। বিশেষ করে দ্রুত খেয়াল ও টপ খেয়ালের ছন্দের ঝোঁক শ্রোতার মনকে আনন্দে চঞ্চল করে তোলে। গুরুদেবের দ্রুত তেতালায় ছন্দে রচিত বাংলা গানগুলিতে এইরূপ একটি চঞ্চল আনন্দের

আবেগই লক্ষিত হয়।

হিন্দী বা বাংলা টপ্পা গান গম্ভীর বা উদ্দীপক ভাবের সহায়ক নয়। বিরহ বা বিচ্ছেদজনিত দুঃখানুভূতির ভাব প্রকাশের পক্ষেই তা উপযুক্ত। গুরুদেব প্রাচীন টপ্পাগানের অনুসরণে যখনই বাংলা গান রচনা করেছেন তখন বিরহ বা দুঃখানুভূতির আবেগই তাতে প্রকাশ পেয়েছে। টপ্পা গানের স্বরপ্রয়োগ রীতিতে এবং ছন্দের গতিতে চাঞ্চল্যের আভাস নেই।

এই ভাবে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পদকে নিজের গান রচনার সময় বিচিত্র পথে কাজে লাগিয়েছিলেন। এই কারণেই প্রথম যৌবনে ভারতীয় সঙ্গীতের নানা অভাবের কথা তাঁর মনে উদয় হলেও পরে তা দূর হতে বেশি সময় লাগেনি।

গুরুদেবের রচিত গানের ভাণ্ডার নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, গম্ভীর, উদ্দীপক, আনন্দচঞ্চল, দুঃখবেদনা প্রভৃতি বিচিত্র হৃদয়াবেগের গান রচনাকালে তিনি বিদেশী চিন্তার সাহায্য পেয়েও তাকে দেশজ উপকরণেই সাজালেন। দুই দেশের এই চিন্তার সমন্বয়ের সার্থক পরিচয় আমরা পাই জীবনের শেষ দশকে রচিত গুরুদেবের নৃত্যনাট্য ক'টিতে। এতে কথার ভাবানুযায়ী তালের ছন্দ, ভাঙাছন্দ, কথার ছন্দ ও লয়ের বৈচিত্র্য প্রভৃতি সবই একসাথে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এর সুর ও রচনার ঢং সম্পূর্ণ ভারতীয়।

গুরুদেবের নানা পর্যায়ের গানেও এই প্রভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট। আগেই বলা হয়েছে এক প্রকৃতির বড় কবিতায় সুর যোজনার নূতন রীতির কথা। রাগিণী বা সুরে গাঁথা বড় কবিতাকে ভাবানুযায়ী একই তালের লয় বদল করে কিভাবে গাইতে হয় তার উদাহরণও আমরা পেয়েছি পূর্বে উল্লেখিত "এস এস বসন্ত ধরাতলে" গানটিতে। এছাড়া বাল্মীকি-প্রতিভার গানের মত সুরে কথা বলার ঢং-এর গানও তিনি রচনা করেছিলেন শেষ জীবনে। যেমন "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি" এবং "তুমি কি কেবলি ছবি" গান দুটি। গুরুদেবের কণ্ঠে এমন বহু গান শুনেছি যা তিনি গাইতেন সম্পূর্ণ কথা বলার ঢং-এ। তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ তিনি রেখে গেছেন তাঁর মধ্যবয়সে রচিত এবং বৃদ্ধবয়সে রেকর্ডে গীত "তবু মনে রেখো", "কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ" এবং "এস হে বধূ ফিরে এস" গান ক'টিতে।

এই ভাবে নিজের গানের দ্বারা গুরুদেব ভারতীয় সঙ্গীতের যে মুক্তির পথ দেখিয়ে গেলেন, ইয়োরোপীয় সঙ্গীত-চিন্তার প্রভাবে তা অনুকরণজাত নয়, তা সমন্বয়জাত।

গুরুদেবের গানে কলি বিভাগের কয়েকটি বিশেষত্ব

ভারতবর্ষে উচ্চাঙ্গের হিন্দী ও লোকসঙ্গীতের কথাগুলিকে দুই কলি থেকে শুরু করে চার কলিতে সাজিয়ে সুর যোজনার বিধিবদ্ধ কয়েকটি প্রথা চলে আসছে বহু যুগ থেকে। বহুকলির গানও আছে কিন্তু তাতে সুর যোজনা করা হয় দুই থেকে চার কলির সুরকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। হিন্দী ধ্রুপদ গানের পংক্তিকে মোট চার কলিতে ভাগ করে সুর যোজনা করাই হলো প্রচলিত রীতি। দু-কলির ধ্রুপদ গানও পাওয়া যায় কিন্তু তা প্রচলিত রীতির গান নয়। ধ্রুপদের চারটি কলির নাম হচ্ছে আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। খেয়াল গানের প্রচলিত কলির সংখ্যা মাত্র দুটি—যেমন আস্থায়ী ও অন্তরা। কখনো কখনো চার কলির গানও পাওয়া যায়, কিন্তু তার শেষ দুটি কলি গাওয়া হয় অন্তরার সুরে। টপ্পা ও ঠুংরী হলো দু-কলির গান, এর অনুকরণে বাংলা ভাষায় বহু গান রচিত হয়েছিল। বাংলার নিজস্ব লোকসঙ্গীত ও কীর্তন মূলতঃ দু-কলির সুরেরই গান। ঐ গানের কলি-সংখ্যা সাধারণত বেশি থাকে বলে বাকি কলিগুলি অন্তরার সুরের পুনরাবৃত্তিতে গাওয়া হয়। ধ্রুপদের মত চার কলির গান লোকসঙ্গীতে বা কীর্তন গানে পাওয়া যায় না।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ হিন্দী ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পার অনুসরণে চার কলির এবং দু-কলির গান যেমন রচনা করেছিলেন, তেমনি করেছিলেন লোকসঙ্গীত ও কীর্তনের প্রচলিত কলিবিভাগের অনুসরণে বহু গান। কিন্তু ধ্রুপদের মত চার কলির গানই পাই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। চার কলির প্রতি তাঁর প্রবণতা অত্যধিক ছিল বলেই খেয়াল, টপ্পা, কীর্তন ও লোকসঙ্গীতের আদর্শে রচিত তাঁর বহু গানকে চার কলিতে সাজিয়ে তিনি ধ্রুপদের নিয়মেই সুর যোজনা করেছিলেন। কিন্তু, এ ছাড়াও গুরুদেবের এমন অনেক গান পাই, যার কলিগুলিতে সুর যোজনার সময় তিনি নূতন কতকগুলি রীতির উদ্ভাবন করেছিলেন। যেমন, গুরুদেবের পাঁচ কলি থেকে দশ কলির গানে সচরাচর দেখা যায় যে, তিনি গানের প্রথম চার কলিতে হিন্দী ধ্রুপদের নিয়মে সুর যোজনা করেছেন এবং পরবর্তী বাকি কলিতে পর পর ব্যবহার করেছেন সঞ্চারী ও আভোগের সুরকে।

গুরুদেবের বাউল বা কীর্তন সুরের গানেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। সে গানগুলি যে কী, তা তাঁরই চার কলি থেকে দশ কলিতে রচিত কয়েকটি গান নিয়ে আলোচনা করে বোঝাবার চেষ্টা করবো।

প্রথমে শুরু করছি একটি পাঁচ কলির গান দিয়ে। গানটির প্রথম কলি আস্থায়ী এবং দ্বিতীয় কলি অন্তরা। তৃতীয় কলির সুর অন্তরার মত। সেই জন্যে এটিকে বলবো দ্বিতীয় অন্তরা। পরবর্তী চতুর্থ কলিতে সঞ্চারীর মত ভিন্ন সুর বসেছে। পঞ্চম কলির সুর দ্বিতীয় কলি বা অন্তরার সুরের অনুরূপ। এটিকে আভোগ বা তৃতীয় অন্তরা বলা চলে। নমুনা হিসেবে এইরূপ পাঁচ কলির যে গানটির উল্লেখ করছি সেটি হলো ভীমপলশ্রী রাগে ও একতালে রচিত গুরুদেবের 'আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে'। এর মোট পাঁচটি কলিতে সুর যে ভাবে বসেছে তা হলো :—

আস্থায়ী।

আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানান মুনি বলে,
সংশয়ে তাই দুলি হে॥

১ম-অন্তরা।

তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ—
শত লোকের শত বুলি হে॥

২য়-অন্তরা।

কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল ক'রে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধুলো তাই নিয়ে আছি—
পাইনে চরণ ধূলি হে॥

সঞ্চারী।

শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়,
আপনা-আপনি বিবাদ বাধায়

কারে সামালিব, একি হল দায়,
একা যে অনেকগুলি হে ॥
৩য় অন্তরা বা আভোগ।
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে,
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁধার মাঝে প'ড়ে কত মরি কেঁদে,
চরণেতে লহো তুলি' হে ॥

গানটিতে লক্ষ্য করবার মত বিষয় হলো এই যে, পর পর একই সুরের দু'টি অন্তরার শেষে সঞ্চারীর সুর বসানো হয়েছে, যা সাধারণত হয় না। প্রথম অন্তরার পর সঞ্চারীর সুর বসানোই হলো প্রচলিত রীতি।

"গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে" হলো ছ' কলির গান। এর প্রথম ও দ্বিতীয় কলি যথাক্রমে আস্থায়ী ও অন্তরা এবং তৃতীয় কলিটিতে সঞ্চারীর ন্যায় ভিন্ন সুর বসানো হয়েছে। পরের চতুর্থ কলির সুর অন্তরার মত, সুতরাং এই কলিকে বলবো আভোগ। এ পর্যন্ত গানটিকে আমরা ধ্রুপদের মত চার কলিতে পাচ্ছি। কিন্তু এখানেই শেষ না করে আরো দু'টি কলি জুড়ে গানটিকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। সঞ্চারী ও আভোগের সুরে এই কলি দু'টি পর পর গাওয়া হয়।

আস্থায়ী।
গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে
বিসরি ত্রাস লোকলাজে
সজনি, আও আও লো ॥
অন্তরা।
পিনহ চারু নীল বাস
হৃদয়ে প্রণয়কুসুমরাশ,
হরিণনেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জবনমে আও লো!
।
ঢালে কুসুম সুরভ-ভার;
ঢালে বিহগ সুরব-সার,

ঢালে ইন্দু অমৃতধার
বিমল রজতভাতি রে।
আভোগ।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে
ফুটল সজনি, পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতি রে।
২য় সঞ্চারী।
দেখ, লো সখি, শ্যামরায়
নয়নে প্রেম উথলে যায়,
মধুর বদন অমৃতসদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
৩য় অন্তরা বা ২য় আভোগ।
আও আও সজনিবৃন্দ
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ
শ্যামকো পদারবিন্দ
ভানুসিংহ বন্দিছে।

ঝিঁঝিট রাগের এই কীর্তন গানটির পর আর একটি কীর্তন সুরের ছ'কলির গান উদ্ধৃত করছি। গানটির প্রথম চার কলিতে ধ্রুপদের নিয়মে পর পর কীর্তনের সুর বসানো হয়েছে। পঞ্চম কলির সুর সঞ্চারী কলির মত কিন্তু হুবহু এক নয়। ষষ্ঠ কলিতে পাই সামান্য পরিবর্তিত আকারে আভোগের সুর। যেমন :—

আস্থায়ী।
পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে
আধেক আঁখির কোণে অলস অন্যমনে।
অন্তরা।
আপনারে আমি দিতে আসি যেঁই
জেনো জেনো সেই শুভ নিমেষেই
জীর্ণ কিছুই নেই কিছু নেই,
ফেলে দিই পুরাতনে॥

সঞ্চারী।

আপনারে দেয় ঝরনা আপন ত্যাগরসে উচ্ছুলি

লহরে লহরে নূতন নূতন অর্ঘ্যের অঞ্জলি।

আভোগ।

মাধবীকুঞ্জ বার বার করি

বনলক্ষ্মীর ডালা দেয় ভরি

বার বার তার দানমঞ্জরী

নব নব ক্ষণে ক্ষণে॥

২য়-সঞ্চারী।

তোমার প্রেমে যে লেগেছে আমায়

চির নূতনের সুর।

সব কাজে মোর সব ভাবনায়

জাগে চির সুমধুর।

২য়-আভোগ।

মোর দানে নেই দীনতার লেশ,

যত নেবে তুমি না পাবে শেষ—

আমার দিনের সকল নিমেষ

ভরা অশেষের ধনে।

ভিন্ন রীতিতে সুর দেওয়া আর-এক প্রকার ছ-কলির গান রবীন্দ্রসঙ্গীতে আমরা পাই। এ গানের প্রথম কলি আস্থায়ী এবং দ্বিতীয় কলি অন্তরা। তৃতীয় ও পঞ্চম কলির সুর হুবহু আস্থায়ীর ন্যায়। এর চতুর্থ ও ষষ্ঠ কলিতে অন্তরার সুর বসানো আছে। অর্থাৎ আস্থায়ী ও অন্তরার পরবর্তী প্রতি দু'কলি পর পর আস্থায়ী এবং অন্তরার সুরের ন্যায়। মিশ্র যোগীয়া রাগিণীতে রচিত ছ-কলির এই গানটি হলো—"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে"।

আস্থায়ী।

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে

রয়েছ নয়নে নয়নে।

হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে

হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।

অন্তরা।

বাসনার বশে মন অবিরত
ধায় দশ দিশে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত
জাগিছ শয়নে স্বপনে।

২য়-আস্থায়ী

সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন, পথ যার গেহ,
সেও আছে তব ভবনে।

২য়-অন্তরা।

তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর
সমুখে অনন্ত জীবনবিস্তার,
কালপারাবার করিতেছ পার,
কেহ নাহি জানে কেমনে।

৩য়-আস্থায়ী।

জানি শুধু তুমি আছ, তাই আছি,
তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি,
যত জানি তত জানিনে।

৩য়-অন্তরা।

জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর
লোকলোকান্তরে যুগযুগান্তর,
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই,
কোন বাধা নাই ভুবনে।

যে গানটির উল্লেখ এবারে করবো তা হলো দশ-কলির গান, কিন্তু ভিন্ন জাতের। গানটি হলো, প্রাচীন বাউল গান-ভাঙ্গা স্বদেশী সঙ্গীত 'আমার

সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। গানটির প্রথম ও দ্বিতীয় কলি যথাক্রমে আস্থায়ী ও অন্তরা। তৃতীয় কলি হলো সঞ্চারী। চতুর্থ কলিতে অন্তরার ন্যায় সুর বসানো হয়েছে বলে এটিকে বলবো আভোগ। এ-পর্যন্ত গানটি ধ্রুপদের আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের রীতিতে পর পর চারটি কলির বাউল সুরে গঠিত। পরবর্তী ছ'টি কলিকে পর পর দুই কলিতে ভাগ করে সঞ্চারী ও আভোগের রীতিতে সুর বসানো হয়েছে।

আস্থায়ী।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

অন্তরা।

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায়, হায় রে)—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
আমি কি দেখেছি মধুর হাসি ॥

সঞ্চারী।

কী শোভা কি ছায়া গো,
কী স্নেহ কি মায়া গো,
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে,
নদীর কূলে কূলে।

আভোগ।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মত, (মরি হায়, হায় রে)-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে,
আমি নয়নজলে ভাসি ॥

২য়-সঞ্চারী।

তোমার এই খেলাঘরে
শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি'
ধন্য জীবন মানি।

২য়-আভোগ।

তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে

কী দীপ জ্বালিস ঘরে (মরি হায়, হায় রে)—

তখন খেলাধুলা সকল ফেলে,

তোমার কোলে ছুটে আসি॥

৩য়-সঞ্চারী।

ধেনু-চরা তোমার মাঠে,

পারে যাবার খেয়াঘাটে,

সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা

তোমার পল্লীবাটে,

৩য়-আভোগ

তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে

জীবনের দিন কাটে, (মরি হায়, হায রে)—

ওমা, আমার যে ভাই তা'রা সবাই,

তোমার রাখাল তোমার চাষী।

৪র্থ-সঞ্চারী

ওমা, তোর চরণেতে

দিলেম এই মাথা পেতে—

দে গো তোর পায়ের ধূলা, সে যে আমার

মাথার মানিক হবে।

৪র্থ-আভোগ

ওমা, গরীবের ধন যা আছে তাই

দিব চরণতলে, (মরি হায়, হায় রে)—

আমি পরের ঘরে কিনব না আর

ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি॥

শিলাইদহ অঞ্চলের একটি প্রাচীন বাউল গানের সুরের অনুকরণে এ গানটি রচিত হলেও, মূলগানের আরম্ভের কলিবিভাগের সুর যোজনার সঙ্গে এ গানের সামান্য কিছু পার্থক্য আছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাংলা গানের প্রভাব

অষ্টাদশ শতকের শেষ অর্ধ থেকে শুরু করে সমস্ত উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের নতুন করে ব্যাপক চর্চার যে ইতিহাস আমরা পাই, তাতে দেখি পশ্চিম ভারতের বহু বড় বড় ওস্তাদ বাংলাদেশে ঐ সময়ে এসেছেন ধনী জমিদারদের নিমন্ত্রণে। বাঙ্গালীরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের কাছে গান শিখেছেন। আবার অনেকে বাংলাদেশের বাইরেও গেছেন একই কারণে। হিন্দীসংগীত চর্চার মূল কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল বাংলার কয়েকটি বিখ্যাত সহরে। একটি হলো বাঁকুড়া জেলার মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুর ; দ্বিতীয়টি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর ; তৃতীয়টি বর্ধমান ; আর চতুর্থটি গড়ে উঠেছিল কলকাতায়। উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিক্ষায় এই প্রচেষ্টা সবচেয়ে কার্যকরী হয়েছিল কলকাতার ধনী জমিদার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁর সংগীতগোষ্ঠীর চেষ্টায় এবং অযোধ্যার বন্দী নবাব ওয়াজিদ আলি শা'র মেটিয়াবুরুজের বিখ্যাত সংগীত দরবারের প্রেরণায়। কারণ বন্দী নবাবের দরবারে তখনকার দিনের পশ্চিম ভারতের খ্যাতনামা বহু গায়ক ও বাদক নিযুক্ত ছিলেন। সংগীতের এই ক'টি কেন্দ্রের সাহায্যে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে অনেক নামকরা বাঙ্গালী গায়কের উদ্ভব হয়েছিল। কলকাতা সহর ছিল এই সংগীত আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। উপরোক্ত চারটি অঞ্চলের খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ এমন কয়েকজনের নাম করবো যাঁদের কথা আমরা আজও শুনে থাকি। যেমন, বিষ্ণুপুরের রামশংকর ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুভট্ট, বা রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ; কৃষ্ণনগরের বিষ্ণু চক্রবর্তী— ইনি ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ও গুরুদেবের বাড়ীর সঙ্গীত শিক্ষক ; কলকাতায় শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালী-প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।

এই সঙ্গে কলকাতার আরো দুজনের নাম করা উচিত, যাঁদের কথা আজ আমরা বেশী শুনি না। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতার সংগীত জগতে খুবই পরিচিত ছিলেন তাঁরা। এঁরই একজন হলেন কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ; এঁকে ডাকা হতো কালী মির্জা নামে। দ্বিতীয়জন হলেন

রাধামোহন সেন; ইনি ছিলেন গায়ক, গান রচয়িতা এবং বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম উচ্চাঙ্গ হিন্দী সংগীতের উপর বই প্রকাশ করে বাংলার সংগীত ইতিহাসে চিরকালের মত স্থান পেয়ে গেছেন। তাঁর বইটির নাম 'সংগীত-তরঙ্গ'; কিন্তু গদ্যে লেখা নয়, লিখেছিলেন পদ্যে।

এই যুগের মাঝামাঝি সময়ে শৌরীন্দ্রমোহন ও তাঁর গোষ্ঠীর চেষ্টায় ভারতীয় সংগীতের বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও তার ইতিহাসের প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে দেখা দিয়েছিল নতুন করে প্রবল আকাঙ্ক্ষা। প্রকাশিত হলো ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল ও টপ্পা ইত্যাদি হিন্দী গানের সংগ্রহ সমেত স্বরলিপির নতুন নতুন বই; সংগীতের বিদ্যালয় হলো, আলোচনা সভা হতো। সংগীতের সম্মেলন ডেকে ওস্তাদদের ডেকে একত্র করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। সংগীতের বিশ্লেষণমূলক আলোচনার এমন সব বই প্রকাশিত হলো যে তার মূল্য আজও কমেনি। এই ভাবে উচ্চাঙ্গের হিন্দী গানের পুনঃ প্রচারের একটি ব্যাপক আন্দোলন জেগেছিল বাংলা দেশে।

কিন্তু কোন ওস্তাদী গান শিখে বা তার নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে, বাঙ্গালী গায়কেরা খুশি থাকতে পারেননি। তাঁদেব মধ্যে নিজের মুখের ভাষায় সেই সংগীতকে সাজিযে নিয়ে সম্পূর্ণ আপনার করে নেবার জন্যে প্রবল এক উৎসাহ জেগেছিল। একাজে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়েছিল বাংলাদেশে সংগীতের একটি নতুন রূপ। সংগীতের এই নবযুগের প্রথম প্রবর্তক হলেন রামনিধি গুপ্ত বা যাঁকে বাংলাদেশ চিনতো নিধুবাবু নামে। ইনি উনিশ শতকের প্রথম দিকে হিন্দী টপ্পা গানের সাহায্যে বাংলা ভাষায় নতুন ভাবে যখন গান রচনা শুরু করলেন, তখন তা শুনে বাঙ্গালী রসিকসমাজ মুগ্ধ হলো। সেই থেকে শুরু করে সমগ্র উনিশ শতকে যাঁরাই গান রচনা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই নিধুবাবুর পথের পথিক। এমন কি যাত্রা ও পাঁচালি গানও ঢং বদল করলো সেই উৎসাহে। উনিশ শতকেব বিখ্যাত কীর্তনীয়া মধুসূদন কিন্নর বা মধুকান, মুসলমান ওস্তাদের কাছে ভাল করে হিন্দী গান শিখে ঢপ্ কীর্তনের যে নতুন একটি ঢং-এর প্রবর্তন করেছিলেন, তাতেও পড়েছিল বাংলা টপ্পার ছাপ। নিধুবাবু বাংলা টপ্পা গানে হিন্দী রাগরাগিণীকে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করেছিলেন। বাংলায় সে যুগের প্রচলিত দেশী সংগীতের সুর তিনি একেবারেই নেননি। তাঁর গানের সুরে শুদ্ধ রাগিণী ছাড়া মিশ্র রাগিণীও ছিল প্রচুর। গান রচনার সময় তিনি হিন্দী গানের প্রচলিত মিশ্ররাগিণীরই কেবল অনুকরণ

করেননি, বহু মিশ্ররাগিণীর সৃষ্টিও করেছিলেন নিজে গান রচনার আবেগে। এঁরই মিশ্রসুরের গানে উৎসাহিত হয়ে পরবর্তী রচয়িতারা তাঁদের গানে মিশ্র রাগরাগিণীর ব্যবহার প্রচুর করে গেছেন।

নিধুবাবুর টপ্পাগানের প্রতি তখনকার দিনের ধনী ও শিক্ষিত সমাজের খুবই আকর্ষণ ছিল। এর একটি বড় কারণ হলো গানের বিষয়বস্তু। নিধুবাবু রচনা করেছিলেন প্রেমের গান। কিন্তু যে প্রেমের রূপ তিনি তাঁর গানে এঁকেছিলেন তাতে আমরা পাই সে-যুগের নরনারীর প্রেমজীবনের খবর। পূর্ব যুগের কবিদের মত প্রেমের চিত্র তিনি রাধা ও কৃষ্ণের মাধ্যমে আঁকলেন না। নিধুবাবু খুবই সাহসের সঙ্গে ঐ প্রচলিত প্রথার পরিবর্তন ঘটিযেছিলেন। তিনি এর প্রথম পথপ্রদর্শক। পরবর্তী বাংলা প্রেমের গানের রচয়িতারা বহু গান রচনা করেছেন, নিধুবাবুর প্রদর্শিত পথে, অবলীলাক্রমে।

বাংলা গানের বাণী ও রাগিণীর মিলনের ধারাটিকে বিশ্লেষণ করে গুরুদেব বলেছিলেন, আমাদের দেশে সংগীতের দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সংগীত আকারে, আর হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে, সেই ভেদ অনুসারে সঙ্গীতের এই দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় বাংলার বাইরে আর বাংলাদেশে। কোন সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশে সঙ্গীত কবিতার অনুচর না হোক, সহচর বটে। বাংলাদেশে সঙ্গীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন। এই জন্যে গানের বাণীকে সুরের খাতিরে কিছু আপোস করতে হয়, তাকে সুরের উপযোগী হতে হয়।

সংগীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিরাজ করে, সেখানে তার নিয়ম-সংযমের শুচিতা প্রকাশ পায়। বাণীর সহযোগে গান রূপে তার সেই শুচিতা তেমন তেমন করে বাঁচিয়ে চলা যাবে না বটে, কিন্তু পরম্পরাগত সংগীতের রীতিটিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয় সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে।

গুরুদেব তাঁর এই ক'টি কথার ভিতর দিয়ে উনিশ শতকের বাংলা গান ও তার রচয়িতা সকলের প্রকৃতিটিকে প্রকাশ করে গেছেন। একথা সত্য যে, উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় গান রচনা করে যাঁরাই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁরা সকলেই সে যুগের কোন না কোন খ্যাতনামা ওস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গের হিন্দী গানের চর্চা করেছিলেন। তাঁরা ওস্তাদী গানের রাগরাগিণীর ও তালের উপর সম্পূর্ণ দখল অর্জন করেছিলেন বলেই রাগিণীর সঙ্গে বাণীকে সহজ সুন্দর

করে মিশিয়ে নিতে পেরেছিলেন এবং রাগিণীর মিশ্রণও সহজ হয়েছিল তাঁদের কাছে একই কারণে।

নিধুবাবুর টপ্পার ভাষা ছিল বাংলা। তাই হিন্দী গানের রাগরাগিণীর নিয়ম ও তার গায়কী এই গানে প্রাধান্য পায়নি। বাণী ও রাগিণীকে সমানভাবে মিশিয়ে নিতে চেয়েছিলেন বলে মূল টপ্পার গায়কীর অনেকখানি তিনি বর্জন করেছিলেন। তাই, তুলনায় বাংলা টপ্পা কিছুটা সহজ হয়েছিল। হিন্দী গানের রাগরাগিণীর নিয়মকে তিনি সহজেই লঙ্ঘন করেছিলেন, বাণীর সঙ্গে রাগিণীর মিলনের দিক চিন্তা করে। তবুও নিধুবাবুর বাংলা টপ্পা গাওয়া খুব সহজ ছিল না। অনেক দিনের চর্চা, রাগরাগিণী ও তালের ভাল জ্ঞান তার জন্যে দরকার হতো। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই ঢংকে জনসাধারণের প্রয়োজনে আরো সহজ করে নেওয়া হতো। এই সহজ রূপটিই যাত্রা, পাঁচালি ও থিয়েটারে ব্যাপক ভাবে স্থান পেয়েছিল। এখনো এই ধরনের সহজ গান, বাংলার নানা জেলার পল্লীর গায়কদের মধ্যে শোনা যায়। উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগরাগিণীর সাহায্যে রচিত এই সহজ পদ্ধতির বাংলা গান গুরুদেবের রচনায় খুবই প্রাধান্য পেয়েছে। মিশ্র রাগরাগিণীর যে গান গুরুদেবের রচনায় আমরা পাই, তাকে আমি কোন আকস্মিক ঘটনা বলব না। বলব, উনিশ শতকের বাংলা গান যে পথে গড়ে উঠেছিল, গুরুদেবের গানে তারই ছাপ পড়েছে। যখন বাংলা টপ্পা, গোপাল উড়ের যাত্রা গান ও দাশুরায়ের পাঁচালি গান বাঙ্গালীর মুখে মুখে—সেই যুগেই গুরুদেবের জন্ম। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল এই ধরনের গানের আওতায়। কেবলমাত্র হিন্দী ওস্তাদী গানের মধ্যেই তিনি বড় হয়েছিলেন বললে খুবই ভুল করা হবে। গুরুদেব নিজেই বলেছেন, শিশুবয়সে তিনি ভৃত্যের মুখে যে পাঁচালি গান শুনতেন, তা নিজে গাইতেও পারতেন। সেই সব গানের সুর ছিল উচ্চাঙ্গ হিন্দী সংগীতের রাগরাগিণীতে বাঁধা। যাত্রাতে, কথকতাতেও সেই একই জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন। বাড়ীতে দাদা ও বয়স্ক আত্মীয়েরা নাটকাদিতে যে গান রচনা করতেন, তাতে ছিল গোপাল উড়ের যাত্রা গানের প্রভাব। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোতে রাগরাগিণী বাজাতেন, এবং যার সঙ্গে গুরুদেবকে বলতেন ভাব অনুযায়ী কথা বসাতে, সেই সব গান শুদ্ধ ও মিশ্ররাগিণীর সহজ ও সরল তালের তখনকার দিনের প্রচলিত বাংলাগানের মত শুনতে হতো। গুরুদেবের জীবনের প্রথম সঙ্গীতগুরু বিষ্ণু চক্রবর্তী গুরুদেবকে ৬ বৎসর বয়সে যে গানের মাধ্যমে সংগীতে হাতেখড়ি দিয়েছিলেন, তা ছিল সহজ ছন্দের বাংলাভাষার

ছড়া গান। রাগরাগিণীতে বাঁধা ছিল তার সুর। এইরূপ একটি সঙ্গীতের আবহাওয়া গুরুদেবের প্রথম জীবনকে ঘিরে রেখেছিল। তাই পরবর্তী জীবনে, বাণী ও রাগিণীকে সমান করে মিশিয়ে এবং রাগরাগিণীর নানা রূপ মিশ্রণের দ্বারা গান রচনা করা, তাঁর পক্ষে এত সহজ হয়েছিল। উনবিংশ শতকের বাংলা গানকে ভাল করে বিচার করে একথা অনায়াসেই বলা চলে যে, গুরুদেব গান রচনায় সেই যুগের সার্থক ও শ্রেষ্ঠ বাহক, যার সূত্রপাত হয়েছিল নিধুবাবুকে দিয়ে।

সন্ধিপ্রকাশ রাগিণী-চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত ভাতখণ্ডে

শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে এযুগের উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, একথা আজ নতুন করে সঙ্গীতজ্ঞদের বলার প্রয়োজন করে না। তাঁর রচিত "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি", "লক্ষ সঙ্গীত", "অভিনব রাগমঞ্জরী" এবং "ক্রমিক পুস্তকমালিকা" বই ক'টি উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে যুগান্তকারী। এই ক'টি বইয়ের জন্য তিনি শার্ঙ্গদেব ইত্যাদি প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীদের দলে চিরকালের মত স্থান পেযে গেলেন, একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে।

ভাতখণ্ডে ছিলেন ইংরেজ যুগের বিশ্ববিত্থালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত। তাই তাঁর চিন্তা ও আলোচনার মধ্যে আমরা পাই, ইয়োরোপের পণ্ডিতদের মত যুক্তিবাদী মনোভাবের পরিচয়। উত্তব ভারতীয় সঙ্গীতকে যুক্তির দ্বারা বিচার করার চেষ্টা, সেই জন্যই বোধহয তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। তিনি যে বিনা বিচারে, বিগত যুগের সঙ্গীতশাস্ত্রীদের ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর মতবাদকে আঁকড়ে থাকেননি, সেটি হলো তাঁর এই মনোভাবেরই বড় পরিচয়। সেই কারণেই তিনি নতুনভাবে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও তাব রাগরাগিণীকে বিচার করে, মূল দশটি ঠাটে ভাগ করতে সাহস কবেছিলেন। এবং প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ উপকারী, "লক্ষণ গীত" নামক সঙ্গীতের বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। এ ছাড়া, কতকগুলি রাগিণীর প্রতি উত্তব ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন যে, সেগুলি হলো "সন্ধিপ্রকাশ" রাগিণী। এই শব্দটি প্রকাশ করে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণীর উৎপত্তির একটি গূঢ়তম রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন বলেই আমরা মনে করি। ভারতীয় রাগরাগিণী যে ভাবতের প্রতিদিনকার, প্রতি-মাসের প্রকৃতি বা ঋতুর অভিব্যক্তির সঙ্গে কি রকম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, "সন্ধিপ্রকাশ" রাগরাগিণীর বিশ্লেষণের দ্বারা সেই পরিচয়টিকে তিনি প্রকাশ করে কথাটিকে আরো ভালো করে বুঝিয়ে গেলেন। "সন্ধিপ্রকাশ" রাগিণী কী,

সংক্ষেপে তার একটু আলোচনা করলে, বোধহয় সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিষয়টা বুঝতে অসুবিধা হবে না।

'সন্ধি' শব্দের অর্থ হলো মিলন। দিন ও রাত নিয়ে ২৪ ঘণ্টা। এর মধ্যে অতি প্রত্যুষে এবং সন্ধ্যায় দিন ও রাত্রি দু'বারে পরস্পরে মেলবার সুযোগ পায়। এই মিলনকালকে বলা চলে সন্ধিকাল। সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের আরম্ভ ও শেষ হতে যেমন সময় লাগে, এই দিবা-রাত্রির মিলনকালটিও সেই প্রকারের। ধীরে ধীরে মিলনের দিকে উভয়ে যেন এগিয়ে আসে। মিলনের পরে আবার তেমনি সময় নিয়ে ধীরে ধীরে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। এইরূপ মিলন ও বিচ্ছেদে সময় লাগে প্রায় তিন ঘণ্টা। প্রত্যুষে ৪টা থেকে ৭টা আর সন্ধ্যায়ও ৪টা থেকে ৭টা। সকাল ও সন্ধ্যার এই তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে উচ্চাঙ্গের হিন্দী সঙ্গীতের যে যে রাগ বা রাগিণী ক'টি গাইবার নির্দেশ আছে, সেই রাগ বা রাগিণীগুলিকে বলা হয়েছে "সন্ধিপ্রকাশ" রাগিণী। এগুলি প্রথম শ্রেণীর রাগিণীর পর্যায়ে পড়ে। সকালের সন্ধিকালে গাইবার রাগিণীগুলি সবই নাকি ভৈরব ঠাটের, অর্থাৎ ভৈরব, কালেংড়া, রামকেলী, যোগিয়া ও বিভাস। আর সন্ধ্যাকালের মধ্যে পড়ে পূর্বী ও মারবা ঠাটের রাগিণীগুলি। যথা, শ্রী, পূর্বী, পুরিয়া, ধানেশ্রী, বসন্ত, পরজ, সোহিণী, ললিত ও মারবা। ভৈরব, পূরবী ও মারবা ঠাটের মোট ১৪টি রাগরাগিণীতে কোমল ঋ, শুদ্ধ গা ও না স্বরগুলি একইভাবে থাকে। তার কোন পরিবর্তন হয় না।

"সন্ধিপ্রকাশ" রাগিণীর এই চিন্তা, পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মনে প্রথম কিভাবে এসেছিল, তার সঠিক সংবাদ আমরা জানি না। কিন্তু ঠিক এইরূপ একটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছিল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মনে, তাঁর যৌবনে। সঙ্গীতের উপর লেখা তাঁর একটি পুরাতন প্রবন্ধ, নাম হলো "সঙ্গীত ও ভাব", ভারতী পত্রিকার ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। প্রবন্ধটির বিষয়ে গুরুদেব তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন যে, ১২৮৮ সালের বৈশাখের ৮ তারিখে (ইং ১৮৮১, ১৯ এপ্রিল) বেথুন সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজের একটি সভায়, এই প্রবন্ধটি তিনি প্রথম পড়েন। দৃষ্টান্ত হিসেবে, নানা প্রকার সুর দিয়ে গানও শুনিয়েছিলেন তিনি নিজে। সভাপতি ছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুরুদেবের বক্তৃতার মূল বিষয় ছিল "গেয় সঙ্গীত"। তাতে তিনি বলেছিলেন, ভারতীয় "রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা মাত্র। কিন্তু

এখন তাহা কি হইয়া দাঁড়াইয়াছে? এখন রাগরাগিণীই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে রাগরাগিণীর হস্তে ভাবটিকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে রাগরাগিণী আজ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক ভাবটিকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আজ গান শুনিলেই সকলে দেখিতে চান, জয়জয়ন্তী, বেহাগ বা কানাড়া বজায় আছে কিনা··· ।"

"এখন সঙ্গীতবেত্তারা যদি বিশেষ মনোযোগ সহকারে আমাদের কি কি রাগিণীতে কি কি ভাব আছে তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, তবেই সঙ্গীতের যথার্থ উপকার করেন। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে একটা ভাব আছে, তাহা যাইবে কোথা বল? ··সঙ্গীতবেত্তারা সেই ভাবের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করুন। কেন বিশেষ বিশেষ এক এক রাগিণীতে বিশেষ বিশেষ এক একটা ভাবের উৎপত্তি হয় তাহার কারণ বাহির করুন। এই মনে করুন, পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে, আর ভৈরোঁতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে? পূরবীতে কোমল স্বরের বাহুল্য, আর ভৈরোঁতেও কোমল স্বরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহা কি কেবল প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? তাহা নহে। তাহার গূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথমতঃ প্রভাতের রাগিণী ও সন্ধ্যার রাগিণী উভয়েতেই কোমল স্বরের আবশ্যক। প্রভাত যেমন ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশঃ নয়ন উন্মীলন করে, সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে ধীরে ক্রমশঃ নয়ন নিমিলিত করে। অতএব কোমল স্বরগুলির অর্থাৎ যে স্বরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, যে স্বরগুলি অতি ধীবে ধীরে অতি অলক্ষিতভাবে পরস্পরের উপর মিলাইয়া যায়, সন্ধ্যা ও প্রভাতের রাগিণীতে সেই স্বরের আধিক্য। তবে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কি বিষয়ে প্রভেদ থাকা উচিত? না, একটাতে স্বরের মশঃ উত্তরোত্তর বিকাশ হওয়া আবশ্যক, আর একটাতে অতি ধীরে ধীরে স্বরের ক্রমশঃ নিমীলন হইয়া আসা আবশ্যক। ভৈরোঁতে ও পূরবীতে সেই বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে, এই জন্যই প্রভাত ও সন্ধ্যা উক্ত দুই রাগিণীতে মূর্তিমান।"

বক্তৃতার এই অংশটুকু পড়ে মনে হয় যেন পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সন্ধিপ্রকাশ রাগিণীর চিন্তা গুরুদেবের উপরোক্ত প্রশ্নেরই জবাব। গুরুদেব সঙ্গীতবেত্তাদের যে বিষয়ে আবিষ্কারের জন্যে সে সময় আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার বহু বছর পরে, অর্থাৎ ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে, ভাতখণ্ডে যেন সেই আহ্বান স্বীকার করলেন। যেন গুরুদেব যে সূত্রটির ইঙ্গিত করেছিলেন,

তাতখণ্ডে যেন সেই সূত্রটি ধরে বিচার-বিশ্লেষণী বুদ্ধির দ্বারা তাকে প্রত্যক্ষভাবে সকলের সামনে প্রকাশ করে ধরলেন। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, একজনের চিন্তার সঙ্গে আর একজনের কাজের মধ্যে এই ঐক্য দেখা দিল কি করে? এ কি উভয়ের ভিন্নভাবে একই পথে চিন্তার ফল, না, একই চিন্তার কোন মূল উৎস অন্য কোথাও আছে, যার কথা এখনো পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি!

গুরুদেবের স্মৃতি

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আরম্ভের কয়েক বছর গুরুদেব নিজেই ছাত্রদের গান শেখাতেন। সঙ্গে ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ, এবং কয়েক বছর পরে যোগ দিলেন অজিত চক্রবর্তী।

১৯১২ সালের পর বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যখন বাড়লো, তখন গুরুদেব গান শেখানোর সময় খুবই কম পেতেন। কিন্তু উৎসব বা অনুষ্ঠানের গান প্রায়ই তিনি নিজে শেখাতেন। ছাত্র ও শিক্ষকদের, একসঙ্গে।

আমি যখন ৫।৬ বছর বয়সের বালক, তখন থেকেই দিনেন্দ্রনাথের কাছে গুরুদেবের গান শিখতে শুরু করি, একসঙ্গে ছোট-বড় অনেকে মিলে। সন্ধ্যাবেলায় এই ক্লাসটিতে গীতাঞ্জলির গানগুলি শিখতাম। প্রায়ই গুরুদেব আসতেন, বসতেন, নতুন গান থাকলে সেইখানেই সকলকে একসঙ্গে শেখাতেন। পরে সেই গানটি দিনেন্দ্রনাথ আমাদের আলাদা তালিম দিয়ে, ভাল করে গলায় তুলে দিতেন। নানা উৎসব, অনুষ্ঠান ও নাটকের বহু নতুন গান এইভাবে সকলে মিলে, গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের পরিচালনায় আমরা শিখেছি। বেশ খানিকটা বয়েস যখন বেড়েছে, নতুন গান শেখাবার সময় গুরুদেব যখন দিনেন্দ্রনাথকে খবর দিতেন, দিনেন্দ্রনাথ তখন প্রায়ই আমাদের ডাকতেন গানগুলি একসঙ্গে শিখে নেবার জন্যে। ১৯৩০ সালের কিছু আগে থেকে মাঝে মাঝে গুরুদেবের কাছে একলা, নতুন গান শেখার প্রথম সুযোগ পাই। পরে, ১৯৩৫ সাল থেকে তাঁর কাছে সম্পূর্ণ একলা, একটানা গান শিখেছি তাঁর মৃত্যুর মাস দু-এক আগে পর্যন্ত। এযুগে আমার এই গান শেখার মধ্যে একবার মাত্র মাসখানেকের মত ছেদ পড়েছিল, বিদেশ ভ্রমণকালে, কিন্তু ফিরে আসার পর, তিনি নিজেই আমাকে সে-ক'টি নতুন গান শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সাল থেকে সাধারণ গান, নৃত্যনাট্যের গান এবং গীতিনাট্যের গানের সবই তাঁর কাছে আমার শেখা। অন্যদের তা শিখিয়েছি পরে, তাদের দিয়ে গুরুদেবকে সে গান শুনিয়েছি, নিজেও গেয়েছি। কখনো কখনো অনেককে নিয়ে নতুন গান গুরুদেব এযুগেও শিখিয়েছেন, আগের দিনের মত।

গুরুদেবের কাছে যখনি একলা গান শিখতাম—বিশেষ করে নতুন গান—তখন তাঁরই হাতে লেখা গানগুলির একটি করে কপি আমি পেতাম তাঁর কাছ থেকে। নানা প্রকার ভালমন্দ কাগজে এই গানগুলি তিনি আমার জন্যে আগে থেকেই নিজের হাতে লিখে রাখতেন। অনেক গানে তিনি নিজের নামও সই করে দিয়েছিলেন। সেই গানের কাগজের উপরেই সংক্ষেপে সুর ও তালের নানা চিহ্ন দিতাম গানটি তাড়াতাড়ি শেখার ও তার সুর মনে রাখবার জন্যে। পরে বাড়ী ফিরে এসে সেই পাণ্ডুলিপি থেকে ভাল করে তা খাতায় লিখে রাখতাম।

নতুন নৃত্যনাট্য "চণ্ডালিকা"র পুরো গান শেখা শেষ করে, কাগজগুলি পর পর ঠিকমত আগে থেকে সাজিয়ে না নেওয়ার জন্য, তাঁকে গান শোনাবার সময় আমার অসুবিধা হয়েছিল। গুরুদেব তা দেখে নৃত্যনাট্যটি একটি ভালো খাতায় নিজের হাতে লিখে পরের দিন আমাকে দিয়ে বললেন, "একজায়গায় গানগুলি পর পর সাজানো না থাকায় তোর অসুবিধা দেখে আমি গত রাত্রে এই খাতায় সব ঠিকমত সাজিয়ে লিখে দিয়েছি। এটি দেখে পর পর গাইতে এখন আর তোর কোন অসুবিধা হবে না।" সেই খাতাটি এখনো আছে। এইভাবেই তাঁর কাছে নানাপ্রকার নতুন গান শিখতে গিয়ে, সব মিলিয়ে একশ'র বেশী তাঁরই হাতে লেখা গান আমার পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। যত্ন করে তা রেখেছি। মাঝে মাঝে তা দেখি, আর ভাবি সেই সব দিনের কথা।

গুরুদেবের কাছে একলা গান শেখার আমার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। দিনে ও সন্ধ্যায় যখনি তিনি গান রচনা করেছেন, তখনি ডেকে পাঠিয়েছেন গানগুলি শিখে নেবার জন্যে। অতি প্রত্যূষেও যেতে হয়েছে, রাত ১০টার পরও তাঁর ডাক পেয়েছি, বহুবার। তাঁর ভয় ছিল, যদি সুর ভুলে যান।

"তাশের দেশ" রচনার একদিনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। সেদিন তিনি একসঙ্গে পাঁচটি গানে সুর দিয়েছেন, সমস্ত দুপুর ধরে। বিকেল তিনটে নাগাদ তাঁরই এক ভৃত্য গিয়ে আমাকে খবর দিল, এখনি একবার গুরুদেবের কাছে যেতে হবে নতুন গান শিখে নিতে। সে সময়ে আমি আগের দিনে তাঁর কাছে শেখা নতুন গানগুলি গাইয়েদের শেখাচ্ছিলাম। কারণ, সন্ধ্যায় মহড়ায় গুরুদেবকে তা শোনাবার কথা ছিল; ভৃত্যটিকে বললাম, আমি একটু পরে যাচ্ছি। সে সময় তিনি কোণার্ক বাড়ীটিতে থাকতেন। যেতে আমার প্রায় আধ ঘণ্টা দেরী হয়েছিল। গিয়ে দেখি, তিনি যে ঘরে বসে

এবার বুঝি ভোলার বেলা হোলো—
ক্ষতি কি তাহে যদি বা তুমি ভোলো।
যাবার রাতি ভরিল গানে
সেই কথাটি রহিল প্রাণে,
ক্ষণেক তরে আমার পানে
করুণ আঁখি তোলো।
সন্ধ্যা তারা এমনি ভরা সাঁঝে
উঠিবে দূরে বিরহাকাশ মাঝে।
এই যে সুর বাজে বীণাতে
যেখানে যাব রহিবে সাথে,
আজিকে তবে আপন হাতে
বিদায় দ্বার খোলো॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৯৩০ সালে, শেষবার ইয়োরোপ যাত্রার পূর্ব দিনের রচনা।)

আমার নয়ন তোমার নয়নতলে
মনের কথা খোঁজে।
সেথায় কালো ছায়ার মায়ার ঘোরে
পথ হারালেই ও যে।
নীরব দিঠে শুধায় যত,
পায় না সাড়া মনের মত,
অবুঝ হয়ে রয় যে চেয়ে
অশ্রুধারায় মজে॥

তুমি আমার কথার আভাসখানি
পেয়েছ কি মনে?
এই যে আমি মালা আনি
ওর মানে কেউ জানে?
পথ দিয়ে যাই যেতে যেতে
হাওয়ায় তাহা দিয়ে গেছে,
হাসি বিছায় বিষাদ ছায়ায়
ওর ভাষা কেউ বোঝে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(প্রচলিত গানটির সঙ্গে এর পাঠান্তর লক্ষণীয়)

একদিন চিনে নেবে তারে,

~~তারে চিনে~~

তারে চিনে নেবে

অনাদরে যে রয়েছে গোপনে।

নবারুণ আলো দেখে সবাই, কালো অবগুন্ঠন।

ঢেকে রেখোনা রেখোনা মায়া কুহেলির মলিন আবরণ

আজ গাঁথুক মালা সে গাঁথুক মালা

তার দুঃখ রজনীর অশ্রুমালা।

কখন অতিথি দুয়ারে আসিবে

নিবে জয়মালা তার ললাটে।

তু

আছে তোমার প্রদীপ চির অপরিচিতা

পরিচয়ের শুভ লগন লাগি॥

(শ্যামা নৃত্যনাট্যের গান)

দই চাই গো দই চাই, দই চাই গো।

শ্যামলী আমার গাই। তুলনা তাহার নাই নাই গো

কঙ্কনা নদীর ধারে

ভোর বেলা নিয়ে যাই তারে

দূর্বাদলঘেরা মাঠে, নদীর ধারে তীরে,

তারে সারা বেলা চরাই, চরাই গো।

দেহ কাজল চিক্কণ কালো

যত দেখি লাগে ভালো।

কাছে বসে যাই ডেকে

উত্তর দেয় সে চেয়ে,

পিঠে দেয় নাড়া

গায়ে তার হাত বুলাই, হাত বুলাই গো।

ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছি,

ওর চণ্ডালিনী ঝি,

নষ্ট হবে যে দই

সে কথা জান না কি।

(চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের গান)

রচনা অন্ধকারে
এসেছি তোমারি এ দুয়ারে
পথিকেরে লহ ডাকি
ঐ মন্দিরের এক ধারে।
বন পথ হতে সুন্দরী
এনেছি মল্লিকা মঞ্জরী, বেণীবন্ধে
তুমি লবে নিজ
মনে রেখেছি এ দুরাশারে।
কোনো কথা নাহি বলে
ধীরে ধীরে ফিরে যাব চলে।
ঝিল্লি মুখর নিশীথে
পথে যেতে যেতে বাঁশরীতে
শেষ গান পাঠাব তোমা পানে
শেষ উপহারে॥

(জীবনের শেষ দিককার রচনা)

যাক্ ওরা যাক্, এ খেলা যাক্।
বৃক্ষ মঞ্জ এ বলেছে।
সংসার তোরি শূন্য, শুষ্ক লাগে জীবনরে॥

— । —

অ। অহো দুঃসাহস এ কি তোমাদের দুর্বিনয়!
অর্জুনে যে করে অপমান তাহার প্রাণ মুহূর্ত নাহি রয়
দুরাশায়।

চি। অর্জুন তুমি অর্জুন?

অ। হাহা হাহা হাহা হাহা, বালকের দল
মার কোলে যাও ফিরে নাই ভয়!
আহা কি অদ্ভুত কৌতুক!

চি। অর্জুন, তুমি অর্জুন?
ফিরে এসো ফিরে এসো,
ক্ষমা দেবে কোমলের অসম্মান,
যুদ্ধে করো আহ্বান,
বীর হাতে মৃত্যুর গৌরব
করি যেন অনুভব;
অর্জুন, অর্জুন?
হা হতভাগিনী, এ কি অভ্যর্থনা মহতের
এলো দেবতা তোর দ্বারেতে
গেল চলি,
গেল তোরে, গেল ছলি
অর্জুন, তুমি অর্জুন।

(চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের প্রারম্ভিক রূপ)

লিখতেন সেখানেই গানের খাতাটি খুলে চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন। মুখ গম্ভীর। অনুমান করলাম, কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু কি যে হতে পারে তা বুঝতে পারলাম না। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, উনিও কিছু বলছেন না, আমার দিকে তাকাচ্ছেনও না। প্রায় ৮।১০ মিনিট এই ভাবে কাটলো। তারপর নিজের হাতে লেখা গান ক'টি আমার হাতে দিয়ে বললেন, পাশে মোড়া নিয়ে বসতে। বিরক্ত হয়েছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু কারণ জিজ্ঞাসা করতে সাহস হচ্ছে না। পাশে বসে আমি গানের কথাগুলি একটি একটি করে মনে মনে পড়ছি, তখন গম্ভীর কণ্ঠে যা বললেন তা হলো, সারা দুপুর এই পাঁচটি গানের সুর তৈরী করে, তা মনে রাখবার জন্য ক্রমাগত গেয়ে তিনি ক্লান্ত। এ বয়সে তাঁর পক্ষে এভাবে পরিশ্রম করে সুর মনে রাখা অসম্ভব। আমাকে সংবাদ দেওয়া হলো, কিন্তু আমি এলাম দেরী করে। কাজ থাকলে তা বন্ধ করে চলে এলাম না কেন, ইত্যাদি। তখন বুঝলাম, গুরুদেবের রাগের কারণ। আমার মন কিন্তু ঐ কথা শুনে সম্পূর্ণ হালকা হয়ে গেল। বললাম, 'সত্যি আমার অন্যায় হয়েছে দেরী করে আসায়, কিন্তু গান ক'টি আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিখে নেবো, শেখবার সময় একটুও কষ্ট দেবো না।' আধ ঘণ্টার মধ্যে সব ক'টি গান শিখে, তাঁর হাতে লেখা গানের কাগজ ক'টিতে সুর ও চিহ্নাদি দিয়ে বেশ কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গানগুলি তাঁকে গেয়ে যখন শুনিয়ে দিলাম, তখন তিনি অত্যন্ত খুশি। খুশি মনে বনমালীকে ডেকে বললেন যে, আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হয়েছে, ভাল করে খাইয়ে দিতে। সঙ্গে সঙ্গেই খাবার এসে গেল। পাশে বসে খেতে খেতে নানা কথা চলল দুজনের মধ্যে। তার মাঝেই গানের এ কলি সে কলি গাইতে লাগলাম। গুরুদেব মন দিয়ে শুনলেন। খাওয়া শেষ করে তাঁকে বললাম, 'হয়তো আজই আপনাকে গানগুলি ভাল করে গেয়ে শোনাতে পারবো, সন্ধ্যাবেলায়।' সন্ধ্যায় তা শুনিয়ে, তাঁকে খুশি করতেও পেরেছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসংস্কৃতি

ভাবত-সভ্যতার ধাত্রীভূমি ছিল গ্রাম। এইখানেই প্রাণের নিকেতন। মনুষ্যত্বচর্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে সর্বত্রই রক্ষিত ছিল। এমন গ্রাম ছিল না, যেখানে সর্বজনসুলভ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালা না ছিল। চার-পাঁচটি গ্রামের মধ্যে, অন্তত একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, যাঁর ব্রত ছিল বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদান করা। এমনি ভাবে, সর্বাঙ্গীণ প্রাণশক্তি গ্রামে-গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। মানুষের চিত্তকে উপবাসী থাকতে হয়নি। তখনকার সমাজ বিদ্যার যে-কোনো বিষয়কেই শিক্ষণীয, রক্ষণীয় বলে জানত। শিক্ষার বিশেষ চর্চা ছিল টোলে, চতুষ্পাঠীতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তীর্ণ ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানেব নিত্যই ছিল চলাচল। দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না, যেখানে রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণকথা, ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমনকি, যেসকল তত্ত্বজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত, তারও সেচন চলেছিল সর্বক্ষণ জনসাধারণের চিত্তভূমিতে। যাত্রাগানের পালায়, বাউল-বৈরাগীদের গানে, কথকতায় শোনা যেত দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ও মুক্তিতত্ত্ব। তারই সঙ্গে থাকত নাচ-গান-কৌতুকের দ্রুত মুখরিত ঝংকার। বিচিত্র রসের যোগে লোকে শুনেছে ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বত্যাগ ইত্যাদি কাহিনী। এ ছাড়া গ্রামে গ্রামে নানাপ্রকার ব্রত, পার্বণ, পূজা, জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহাদি উৎসবের মাধ্যমে, নানা প্রকার শিল্প ও নৃত্যগীতবাদ্য ছিল স্বতঃ উৎসারিত। গ্রামে-গ্রামে মন্দির তৈরি হয়েছে, তা আজ ভগ্নপ্রায় হলেও, তার স্থাপত্য ও পোড়ামাটির শিল্পকলার উৎকর্ষ, আজও আমাদের মনে বিস্ময় সঞ্চার করে। এ-সবের শিল্পীদের বাস ছিল গ্রামে। গ্রাম-সমাজের প্রতিদিনকার ব্যবহৃত বস্ত্র ও নানা প্রকার দ্রব্যে আমরা সে-যুগের একটি অতি-উন্নত শিল্পরুচির প্রকাশ দেখি।

তখনও দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে, কিন্তু সেইসঙ্গে এমন একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল, যাতে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যে মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে, মানুষের যে

শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতায় হেয় করতে পারে না, তার পরিচয় উজ্জ্বল করেছে।

গ্রামসমাজের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল স্বৈচ্ছিক। তার পিছনে কোনো আইন ছিল না, বাইরের কোনো তাগিদ ছিল না। তার স্বতঃসঞ্চার ছিল ঘরে-ঘরে, যেমন রক্তচলাচল হয সর্বদেহে। এই ভাবে গ্রামবাসীরা কর্মে ও কৃষিকাজের সঙ্গে জ্ঞান ও আনন্দের আবেষ্টনে, গ্রামগুলিতে সংস্কৃতির একটি পরিপূর্ণ প্রাণবান আবহাওয়া রচনা করতে পেরেছিল।

কেউ কেউ মনে কবেন, প্রাচীন গ্রামসমাজের যে চিত্র আমরা আজ আঁকি, প্রকৃতপক্ষে গ্রামগুলি নাকি সেইরূপ ছিল না। জাতিভেদ ও সর্ববিষয়ে কূপমণ্ডুকতার দূষণীয় মনোভাব আঁকড়েই গ্রামসমাজ কোনো রকমে বেঁচে ছিল; অর্থাৎ, সে সমাজ ছিল প্রবাহহীন বদ্ধ জলাশয়ের মত দূষিত। এ কথার সত্যতা ইংরেজ-যুগেব গ্রামগুলির অবস্থা দেখে আমরা হয়তো স্বীকার কবে নিতে পারি। কিন্তু তার পূর্ববর্তী যুগের গ্রামসমাজেব পক্ষে তা সত্য বলে মানতে পারি না। মুসলমান-যুগের শেষ পর্যন্ত, ভারতীয় সভ্যতার ধাত্রীভূমি যে ছিল গ্রাম, এ কথার সমর্থনে কযেকটি কথা বলতে ইচ্ছা করি।

ভারতীয সভ্যতা মূলে চিরকালই ধর্মকেন্দ্রিক। ভারতীয় সমাজকে অতি প্রাচীনকালে চালনা করেছেন বর্ণাশ্রমের মুনি-ঋষিরা। বৌদ্ধযুগে করেছেন —বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদেব দ্বাবা পবিচালিত বৌদ্ধবিহাব নামক বড ও ছোট শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি, মধ্যযুগে করেছেন—হিন্দু ও মুসলমান সন্ত ও সুফী সাধকেরা, বড় বড় তীর্থকেন্দ্রেব গুরুবা। ইংরেজ-যুগে সমাজকে চালনা করেছেন যাঁরা, তাঁরা সকলেই প্রায কোনো-না-কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের গুরু বা ধর্মমতের প্রকৃত ভক্ত। যাব শেষ উদাহরণ এ যুগে হলেন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী। দেখা গিয়েছে যে, ধর্মাত্মা মহাপুরুষেরা যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজকে চালিয়েছেন; সমাজের নানা সমস্যাব সুরাহা করবার চেষ্টা করেছেন। ইংরেজপূর্ব যুগ পর্যন্ত, প্রায সব ধর্মাত্মাই ছিলেন গ্রামীণ সংস্কৃতির সৃষ্টি। এঁদের জন্ম ও শিক্ষা গ্রামের পবিবেশে। একমাত্র বুদ্ধদেব জন্মেছিলেন নগরে, বড়ও হযেছিলেন সেই আবহাওযায। কিন্তু তাঁকে সেই শহরের আবহাওয়া থেকে পালিয়ে যেতে হলো গ্রামাঞ্চলে। তিনি নিজে তাঁর সাধনার প্রচার করলেন গ্রামে ও তীর্থে, যা ছিল উচ্চস্তরেব সাধনার কেন্দ্র। ধর্মকে কেন্দ্র করেই নানা শিল্পকলা, সংগীত, নৃত্য, অভিনযের চর্চা হয়েছে প্রাচীন যুগে, গ্রামে-গ্রামে। তাই সে যুগে রাজাদেব আনতে হতো জ্ঞানী, গুণী ও শিল্পীদের, নিজেদের দরবার

সাজানোর জন্যে, গ্রাম থেকে। কৃত্তিবাস ফুলিয়া গ্রামের কবি। তিনি গৌড়েশ্বরের দরবারে যখন গেলেন, তখন তাঁর নাম কবি হিসেবে গ্রামসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। গ্রাম যদি কূপমণ্ডুক হতো, তাহলে গ্রামের কবি চণ্ডিদাস লিখতে পারতেন না—'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। চৈতন্যদেবের জন্ম গ্রামে, শিক্ষা তীর্থক্ষেত্রে, ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র তীর্থে ও গ্রামে। অদ্বৈতবাদী ধর্মপ্রচারক শংকরাচার্যের জন্ম ও শিক্ষা গ্রামে, তার প্রচার রাজধানীতে নয়, তীর্থে ও গ্রামে। ভক্তিমার্গের গুরু মাধবাচার্যের জন্ম ও কর্ম গ্রামে। আসামের বৈষ্ণবাচার্য শংকরদেব জন্মেছিলেন গ্রামে, তাঁর প্রচারস্থান মঠগুলিও ছিল রাজাদের রাজধানীর বহু দূরে; তিনি নৃত্য-গীত, অভিনয় ও চিত্রকলার প্রচার করেছিলেন ঐ মঠের সাহায্যে, গ্রামের শিল্পীদের দিয়ে। কবীর, নানক প্রভৃতি সন্তদের আবির্ভাব গ্রাম থেকে, গ্রামই ছিল এঁদের কর্মস্থল। ধর্মনেতারা যুগের প্রয়োজন সাধনের জন্যেই এসেছিলেন। গ্রামসমাজের সাহায্যেই তাঁদের কাজ এগিয়েছিল।

এইভাবে বিচার করে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, প্রাচীন গ্রামসমাজের যে চিত্র গুরুদেব এঁকেছেন, এ নিছক ভাববিলাস বা প্রাচীনের প্রতি মোহবশে নয়। সে সমাজ জীবন্ত ছিল বলেই, যখন যেভাবে যুগের প্রয়োজনে তার পরিবর্তন দরকার হয়েছে, তখনি বিনা দ্বিধায় তা করেছে। মুসলমান-যুগের শেষ পর্যন্ত এই ছিল গ্রামজীবনের প্রকৃত স্বরূপ। প্রথম বাধা পেল, যখন থেকে ইংরেজরা নগরকে কেন্দ্র করে তাদের সভ্যতাকে ভারতের উপর আরোপ করল। নতুন সভ্যতার সঙ্গে যোগ রক্ষার সুযোগ না পেয়ে, স্থাণুবৎ হয়ে রইল গ্রামগুলি। এত যুগ ধরে যা পেয়েছিল, তাকে কোনো মতে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা ছাড়া, গ্রামের যেন আর কোনো কাজই রইল না।

ইংরেজ-শাসনের যুগে, শহরে ইয়োরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশের যে অবস্থা দাঁড়াল, তাতে দেখা গেল, গ্রামগুলি শহরকে চারিদিকে যদিও ঘিরে আছে, তবু শত যোজন দূরে। মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে শহরবাসী আমরা যা বুঝি, সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি ছোটলোক, ছোটলোকের পক্ষে সকল প্রকার মাপকাঠিই ছোট। ছোটরা ভদ্রলোকের ছায়াচর, তাদের প্রকাশ অনুজ্জ্বল; অথচ দেশের অধিকাংশই তারা, সুতরাং দেশের অন্তত বারো আনাই অনালোকিত। ভদ্রসমাজ তাদের স্পষ্ট করে দেখতেই পায় না। মোট কথা হচ্ছে, দেশের যে অতিক্ষুদ্র অংশে

বুদ্ধি বিদ্যা মান, সেই সব লোকের সঙ্গে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের দেশ এক নয়। গ্রামের ঠিকমত পরিচয় নেবার উপযুক্ত কৌতূহল পর্যন্ত আমাদের নেই। ওরা ছোটলোক; আমাদের মনে মানুষের প্রতি যেটুকু দরদ আছে, তাতে করে ওরা আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। আমাদের জনসাধারণের মধ্যে নানা আন্দোলন চলে আসছে, কিন্তু সে আমাদের শিক্ষিত সাধারণের অগোচরে। জানবার জন্যে কোনো ঔৎসুক্য নেই—কেননা তাতে পরীক্ষা পাসের মার্কা মেলে না। এই কারণেই—দেশ থেকে সৌন্দর্য গেল, স্বাস্থ্য গেল, বিদ্যা গেল, আনন্দের প্রবাহ ক্ষীণ, প্রাণও অবশিষ্ট আছে অতি অল্পই। পল্লীর জলাশয় শুষ্ক, বায়ু দূষিত, পথ দুর্গম, ভাণ্ডার শূন্য, সমাজবন্ধন শিথিল, ঈর্ষা কলহ কদাচার লোকালয়ের জীর্ণতাকে প্রতি মুহূর্তে জীর্ণতর করে তুলছে।

উপরের কথাগুলি গুরুদেবই বলেছিলেন। বলতে পাবার কারণ হলো, বারো বৎসরের উপর একটানা পূর্ববাংলার পল্লী-অঞ্চলে বাস ও পল্লীর সমাজ-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা ও তার আনন্দের জীবনের সঙ্গে ভালোবাসার দ্বারা ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ। সেই পরিচয়েই, ইংরেজ-সভ্যতা ভারতের নগরসমাজ ও গ্রামসমাজের কতখানি ক্ষতি করেছে, সহজেই তা তিনি বুঝতে পারলেন। ভাবতে লাগলেন উপায়। এবং বুঝলেন যে, এ যুগের বিদেশী সভ্যতা যতই উজ্জ্বল বা নিজেদের দেশের পক্ষে যতই প্রাণবান হোক-না কেন, আমাদের দেশে তার অনুকরণ বৃথা হয়েছে। আমরা তাদের সাজ পরেছি, বুলি শিখেছি, কিন্তু খাঁটি ইংরেজ বনে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ইংরেজ জাতির চরিত্রের গুণগুলির কিছুই আমরা নিতে পারিনি। ভাবলেন, যে সমাজব্যবস্থার প্রভাবে আমাদের প্রাচীন সভ্যতা বা সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করেছিল, সেই দিকেই আমাদের ফিরে তাকাতে হবে। নতুন যুগের সভ্যতা গড়ে তোলবার কথা চিন্তা করেই শহরবাসী ভদ্রলোকদের ডাক দিয়ে, 'স্বদেশী সমাজ' (১৩১১) ও 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (১৩১২) বক্তৃতার মাধ্যমে বলেছিলেন গ্রামের দিকে ফিরে তাকাতে, তার হৃদয়টিকে সহানুভূতির সঙ্গে অনুভব করতে। শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, ধনে-মানে গ্রামবাসী যতই ক্ষুদ্র হোক-না কেন, তাদের মধ্যেই ভারতের প্রকৃত স্বরূপটি এখনো বেঁচে আছে। সেইখানেই আসল ভারতবর্ষ। বলেছিলেন, নগরের মুষ্টিমেয় ভদ্রসমাজই একমাত্র ভারতবর্ষ নয়। যদি দেশের মুক্তিসাধন

করতে হয়, তবে পল্লীসমাজের আত্মশক্তিকে জাগাতে হবে। গ্রামকে অবহেলা করে নয়, তার সঙ্গে ভালোবাসার দ্বারা এক হয়ে। শহর ও গ্রাম সকলেই যেন এক হয়ে বলতে পারে—আমরা বিদেশীর মুখাপেক্ষী হয়ে বাঁচতে চাই না, আমাদের যা প্রয়োজন আমরা নিজেদের শক্তিতেই তা গড়ে নেব। দেশনেতারা তাঁর পরামর্শ বুঝি গ্রহণ করলেন না। কিন্তু গুরুদেব নিজে দেশবাসীকে উদ্দেশ করে যখনই যা বলেছেন সে কথা দেশ গ্রহণ করল কি না-করল, তার অপেক্ষায় তিনি কখনো বসে থাকেননি। নিজে হাতে-কলমে কাজ করে সেই চিন্তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করতেন। এ পথেও তিনি কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন একলা গুটিকতক অনুরাগী সহচর নিয়ে নিভৃতে, পূর্ববাংলার পল্লীতে। ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশ যে পদ্ধতিতে ঘটেছিল, স্থির করলেন, সেই প্রকার একটি আদর্শ কেন্দ্র ভারতের কোথাও তাঁকে গড়তে হবে—যা হবে ভারতীয় সাধনার বিকাশ-কেন্দ্র, প্রাচীনের অন্ধ অনুকরণ নয়। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ একটি চিন্তা থেকেই শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের উদ্ভব। এবং এ দুইয়ের সমষ্টি হলো বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ইংরেজ-যুগে প্রবর্তিত স্কুল-কলেজের রুটিন ও সিলেবাসের সাহায্যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত। শহরের প্রয়োজনে তাকে অস্বীকার করা সম্ভব হলো না। কিন্তু ছাত্রছাত্রী ও কর্মী-সমাবেশে যে এক মানবসমাজ বিশ্বভারতীতে দেখা দিল তার জীবনধারার প্রতি একবার ধীর ভাবে সকলে চেয়ে দেখতে পারেন। এখানে বিভিন্ন জ্ঞান কর্ম মানবসেবা ও নানা প্রকার আনন্দচর্চার যে সম্মিলিত পরিবেশ রচিত হয়েছে, তার সঙ্গে এ সমাজ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আপনা থেকেই এ সমাজ নানা দিকে শক্তি সঞ্চয় করে। নিত্য চেষ্টা হচ্ছে নিজের প্রয়োজনের সব-কিছুই যেন নিজের চেষ্টায় মেটাতে পারে। এবং তা যেন হয় স্বেচ্ছিক। তিনি চেয়েছিলেন, স্কুল-কলেজের পড়া ছাড়াও এখানকার নানাপ্রকার সভাসমিতি উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জ্ঞানের চর্চা নানা শাখায় এই সমাজে বিকশিত হয়ে উঠুক, বিচিত্র পথে কর্মের সাধনা সমাজের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাক, আয়োজন বিচিত্র পথে বিস্তারিত হয়ে এই সমাজ ভারতের কাছে দৃষ্টান্তরূপে খাড়া হোক। তাঁর এই চিন্তা ভারতের ইংরেজ-যুগে প্রবর্তিত সভ্যতার কাছ থেকে পাওয়া নয়। কোনোদিক থেকেই সে সমাজের সঙ্গে এর মিল নেই। পুরাতন গ্রামীণ সমাজের যে চিত্র তিনি মনে এঁকেছিলেন এ হলো তারই রূপান্তর। যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছি। বিশ্বভারতী গড়ে

উঠেছে প্রকৃত দেশজ আদর্শকে অবলম্বন করে। গুরুদেব যে কেবল ভাববিলাসী কবি নন, সত্যকার দেশপ্রেমিক কর্মী, এর দ্বারাই তিনি তা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রমাণ করে গেলেন।

বহুদিন পর্যন্ত আমাদের ভদ্রসমাজের বিশ্বাস ছিল—পল্লীজীবন মৃতপ্রায়, পূর্বের মত সচল প্রাণপ্রবাহ তার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার পক্ষে নতুন যুগকে সাহায্য করা বা নতুন যুগের সঙ্গে নিজেকে মানিযে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। কিন্তু এই চিন্তার প্রতিবাদ কার্যকরভাবে প্রথম গুরুদেবই করলেন। এবং প্রমাণ করে দেখালেন যে, এখনো গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যে যে শক্তি ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগাতে পারলে সমগ্রভাবে এ যুগের ভারতবর্ষ লাভবান হবে। এই কথার সত্যতা প্রমাণেব জন্যে কযেকটি মাত্র উদাহরণ উপস্থিত করছি।

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবের প্রধান অঙ্গ হলো মেলা। ভারতের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সেসব জায়গার প্রধান উৎসবে এইরূপে মেলাকে স্থান দিয়েছেন বলে শুনিনি। এ বিষয়ে বিশ্বভারতী একক। এই মেলা-প্রচলনেব ধারণা গুরুদেব পেয়েছিলেন আমাদের এই দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত মেলাগুলি দেখে ও তার কথা শুনে। 'মেলা' যুগে যুগে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজকে যে কত দিক থেকে সমৃদ্ধ করে এসেছে, তা বুঝেই তার কথা বলেছিলেন স্বাধীনতাকামী দেশনেতাদের কাছে, বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' নামে লিখিত ভাষণে। তাঁরই ইচ্ছায় বিশ্বভারতীর প্রধান দুটি উৎসবসূচীর প্রধান অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হয়েছে মেলা। 'ভদ্রলোক' ও 'ছোটলোক'দের মিলনের ক্ষেত্র রচনা করে জ্ঞান কর্ম ও আনন্দের আদানপ্রদান করে যাচ্ছে এই মেলা। 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতায় মেলাগুলিকে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির বড় উপায় হিসেবে সাজাবার যে প্রস্তাব গুরুদেব করেছিলেন, বিশ্বভারতীর এই মেলা দুটি সেই আদর্শেই গঠিত হয়ে কতখানি কার্যকর হযেছে আজ আমরা তা চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি।

গুরুদেবের গানের কথা সকলেই জানেন। এদিক থেকে দেশকে তিনি দিয়ে গিয়েছেন অনেক। তাঁর এই বিরাট সৃষ্টির পথে যে দুটি প্রাচীন ভারতীয় সংগীতধারা তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল, তার একটি হলো ভারতের উচ্চাঙ্গ হিন্দী সংগীত আর দ্বিতীয়টি হলো বাংলার পল্লীসমাজে প্রচলিত নানা প্রকার সহজ সরল গান—যার মধ্যে বাউল সম্প্রদায়ের গান বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ভাবে ভাষায় সুরে ও ছন্দে বাউলদের গানের প্রভাব গুরুদেবের

গানে নানা ভাবে ছড়িয়ে আছে। এ ছাড়া নতুন পথেও গুরুদেবের গান এগিয়ে গেছে এই সম্প্রদায়ের গানের সাহায্যে। নাটকে এই বাউলদের জীবনকে খাড়া করলেন আদর্শ চরিত্র হিসেবে। তাঁদের অধ্যাত্মচিন্তা, গুরুদেবের অধ্যাত্মজীবনে যে গভীর সাড়া জাগিয়েছিল তার কথাও আমাদের অজানা নয়।

বিশ্বভারতীর যাবতীয় উৎসব-অনুষ্ঠান, সভাসমিতির সাজসজ্জার একটি বিশেষ ধারা আছে। সেই সজ্জার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে আলপনা। এ শিল্পচর্চা গ্রামের মেয়েদের মধ্যে যুগে-যুগে চলে এসেছে। এর প্রাণশক্তিকে গুরুদেবই প্রথম অনুভব করলেন এ যুগে। এবং বিশ্বভারতীর যাবতীয় উৎসব ও সভাসমিতিকে এই আলপনা দ্বারা সাজানোর জন্য উৎসাহিত করলেন। শিল্পাচার্য নন্দলালের নেতৃত্বে সেই অজ্ঞাত অখ্যাত গ্রামীণ শিল্প আজ দেশের প্রায় সর্বত্র পরিবেশিত।

এ যুগের শিক্ষিত সমাজের নৃত্য-আন্দোলনের গুরু হলেন গুরুদেব স্বয়ং। তাঁর এই আন্দোলনের পিছনে নানা দেশের পল্লীসমাজের সহজ সরল নাচের প্রভাব আছে। বাংলার বাউলদের নাচের আদর্শও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে 'ফাল্গুনী'তে (১৯১৬) অন্ধ বাউলের চরিত্র রচনা করে সেই চরিত্রের অভিনয় করলেন তিনি নিজে। নাচে গানে ও অভিনয়ে গুরুদেব দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন।

'রায়বেশে' নাচ যখন নতুন করে শিক্ষিত সমাজে পরিচিত হলো তখন আমাদের শেখাবার জন্যে গুরুদেব 'রায়বেশে' নর্তকদের আনালেন। নাচ হিসেবে এ হলো পুরুষদের অতি সাধারণ দলবদ্ধ নাচ। কিন্তু গুরুদেবের দৃষ্টিতে তার মূল্য ধরা পড়েছিল।

তিনি বললেন, বাংলার গ্রামাঞ্চলের যাত্রা তাঁর ভালো লাগে। তার একটি বড় কারণ হলো যাত্রার চিত্রপটহীন মঞ্চ। চিত্রিত দৃশ্যপট যে নাটকের অভিনয়ে না হলেও চলে, এ চিন্তা গুরুদেবের মনে জাগে এই যাত্রা দেখে। বিশ্বভারতীতে তাঁর নাটকের অভিনয়ে চিত্রিত দৃশ্যপটের ব্যবহার তাই তিনি তুলে দিলেন।

তাঁর নাটকে কথার সঙ্গে বহুল পরিমাণে গান যোজনার রীতিটি তিনি গ্রহণ করলেন যাত্রা থেকে।

এই ভাবে গুরুদেবের প্রেরণায় পল্লীসংস্কৃতি বিভিন্ন দিকে প্রবল শক্তিতে নিজেকে বিকশিত করবার সুযোগ পেয়ে প্রমাণ করল যে, সে রক্ষণশীল নয়, সেও জানে যুগের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যেতে।

এই পথে আমরা যদি না যাই, তাদের কাছে উপস্থিত হই শহরের ভদ্র-

লোকরূপে কেবল উপদেশবাক্য দানের উদ্দেশ্যে, তবে এতদিন তারা আমাদের যেমন দূরের মানুষ বলে জেনেছে, আজও তাই জানবে। মনে করবে, তারা ছোটলোক, তাদের সব কিছুই ছোট। এই মনোভাবের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সুযোগ পেলেই তারা চেষ্টা করবে তাদের ছোটলোকত্ব দূর করে ভদ্রলোক হতে। এবং নিজের সমাজকে ভুলতে ও অবহেলা করতে।

এমন অনেক পল্লীবাসীর কথা জানি যাঁদের পূর্বপুরুষ বংশপরম্পরায় নিজেদের সমাজের প্রয়োজনে নৃত্য-গীত, অভিনয় ইত্যাদি নানা কলার চর্চা করে এসেছেন, কিন্তু তাঁদেরই এ যুগের বংশধরেরা স্কুল-কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোক হয়ে, গ্রামে ফিরে নিজেদের উৎসবাদিতে অন্যদের সঙ্গে একত্রে নাচ গান ও বাজনায় যোগ দিতে লজ্জা বোধ করেছেন। স্বাধীনতার পরেও এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। চাষীর ছেলে লেখাপড়া শিখে হাল-লাঙল ধরতে লজ্জা পায়, এ ঘটনা আমরা সর্বদাই দেখছি। সাঁওতাল-সমাজের ছেলে বর্তমানে শহরে বিদ্যালয় থেকে সামান্য লেখাপড়া শিখে বিদ্যালয়ের ছুটির দিনে নিজের বাপ-মা'র কাছে যেতে চায়নি, এমন ঘটনাও ঘটেছে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে আমরা দরিদ্র পল্লীবাসীর সেবার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছি তাতে কোথাও গলদ আছে। ধাপে ধাপে এগিয়ে, পল্লী-সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে যদি এ কাজ করা হতো তবে তার ফল হতো অন্যরকমের। নিজেদের ছোট করে ভাববার যে সংস্কার গত প্রায় দু' শতাব্দী ধরে তাদের মনে বসে গিয়েছে সেটিকে দূর না করা পর্যন্ত কাজ সফল হবে না।

প্রায়ই দেখা যায় যে, গ্রামের আনন্দ ফিবিয়ে আনার জন্য ভদ্রলোক-সমাজ নিজেরাই নাচ গান ও অভিনয়ের আসর সাজান গ্রামে গ্রামে। জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে এ ধরনের কাজের প্রয়োজন আছে, কিন্তু প্রাণের যোগ এর দ্বারা ঘটে না। কারণ তারা ছোট হয়ে ভদ্রলোকের জিনিস দেখছে।

গুরুদেবের গান এদের মধ্যে প্রচার করার কথা উঠেছে। কিন্তু এই গান যদি গ্রামের সামনে আভিজাত্যের গর্ব নিয়ে উপস্থিত হয় তবেই সর্বনাশ। গুরুদেবের গান উচ্চস্তরের, তবুও গুরুদেবের মত সেও চায় গ্রামের গানের সঙ্গে এক-মাটিতেই বসতে। পংক্তিভোজনে যেন তাকে যোগ দিতে দেওয়া হয়। এর জন্যে আলাদা করে টেবিল-চেয়ার এনে পৃথক ভোজনের ব্যবস্থা যেন না হয়।

শহরের নবপ্রবর্তিত কিছু কিছু উৎসব গ্রামাঞ্চলে প্রবর্তনের চেষ্টা চলছে।

কিন্তু যাঁরা সে কাজে নিযুক্ত তাঁরা গ্রামে প্রচলিত উৎসবগুলিকে তেমন মর্যাদা দেন না। সে সময়ে তাদের কাছ থেকে একটু দূরে দূরে থাকবারই তাঁরা চেষ্টা করেন। এর জন্যেই নবপ্রবর্তিত উৎসবগুলিকে গ্রামবাসীরা যে খুব আপনার করে নিতে পারছে তা মনে হয় না। এখনো পর্যন্ত যতটুকু দেখেছি তাতে বুঝেছি তা হয়নি। ভদ্রলোকদের খুশি করবার জন্যে সন্তোষ জানিয়েছে তারা, ধন্যবাদ জানিয়েছে ভদ্রতা করে। কিন্তু আপনার করে নেয়নি।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার বাউল

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে এক সময়ে পূর্ববঙ্গের পদ্মানদীর তীরবর্তী নিজের জমিদারির পল্লী অঞ্চলে প্রায় ১০।১২ বছর থাকতে হয়েছিল। বাংলাদেশের গ্রামসমাজ, তার সংস্কৃতি ও সেখানকার প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় তাঁর সেইখানেই প্রথম ঘটে। ধীরে ধীরে এক গম্ভীর ভালবাসায় তা পরিণত হয়। সে ভালবাসা যে কতখানি সত্য ছিল, তা জানা যায় সেখান থেকে লেখা তাঁর বিপুল সংখ্যার চিঠিপত্রের স্বীকৃতি থেকে, নানা গল্প, কাব্য ও তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের ভিতর দিয়ে। আরম্ভে আমি তাঁরই একটি স্বীকৃতি উদ্ধৃত করছি। তারপরে আসবো অন্য কথায়।

বাংলাদেশের শিলাইদহে থাকাকালীন একটি বিশেষ দিনের কথা মনে করে গুরুদেব লিখছেন :—

"বর্ষার সময় খালটা থাকত জলে পূর্ণ। শুকনোর দিনে লোক চলত তার উপর দিয়ে। এ পারে ছিল একটা হাট, সেখানে বিচিত্র জনতা। দোতলার ঘর থেকে লোকালয়ের লীলা দেখতে ভালো লাগত। পদ্মায় আমার জীবন-যাত্রা ছিল জনতা থেকে দূরে। নদীর চর, ধূ-ধূ বালি, স্থানে স্থানে জলকুণ্ড ঘিরে জলচর পাখী। সেখানে যে সব ছোট গল্প লিখেচি তার মধ্যে আছে পদ্মাতীরের আভাস। সাজাদপুরে যখন আসতুম, চোখে পড়ত গ্রাম্য জীবনের চিত্র, পল্লীর বিচিত্র কর্মোদ্যম। তারই প্রকাশ 'পোষ্টমাষ্টার', 'সমাপ্তি', 'ছুটি' প্রভৃতি গল্পে। তাতে লোকালয়ের খণ্ড খণ্ড চলতি দৃশ্যগুলি কল্পনার দ্বারা ভরাট করা হয়েচে।

"সেই সময়কার একদিনের কথা মনে আছে। ছোট শুকনো পুরানো খালে জল এসেচে। পাঁকের মধ্যে ডিঙিগুলো ছিল অর্ধেক ডোবানো, জল আসতে তাদের ভাসিয়ে তোলা হলো। ছেলেগুলো নতুন জলধারার ডাক শুনে মেতে উঠেচে। তারা দিনের মধ্যে দশবার ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়চে জলে।

"দোতালার জানালায় দাঁড়িয়ে সে দিন দেখলুম, সামনের আকাশে নববর্ষার জলভারনত মেঘ, নীচে ছেলেদের মধ্যে দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত কল্লোল।

আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে সুদূরে। অত্যন্ত নিবিড় ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল, সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করচি, যা ভোগ করচি, চার দিকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্তে মুহূর্তে যা-কিছু উপলব্ধি চলেচে, সমস্ত এক হয়েচে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে।

"এমনি ক'রে আপনা থেকে বিবিক্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খণ্ডকে স্থাপন করবামাত্র নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল। তখন জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোনো রসিকের সঙ্গে এক হয়ে। আমার সেদিনকার এই বোধটি নিজের কাছে গভীর ভাবে আশ্চর্য হয়ে ঠেকল।

"একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম। স্নানের ঘরে যাবার পথে একবার জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম ক্ষণকাল অবসর যাপনের কৌতুকে। সেই ক্ষণকাল এক মুহূর্তে আমার সামনে বৃহৎ হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে জল পড়চে তখন, ইচ্ছে করচে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ক'রে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি কাউকে। কে সেই আমার পরম অন্তরঙ্গ সঙ্গী যিনি আমার সমস্ত ক্ষণিককে গ্রহণ করচেন তাঁর নিত্যে। তখনি মনে হ'ল আমার একদিক থেকে বেরিয়ে এসে আর একদিকেব পরিচয় পাওয়া গেল। এষোহস্য পরম আনন্দঃ, আমার মধ্যে এ এবং সে,—সেই এ যখন সেই সে-র দিকে এসে দাঁড়ায় তখন তার আনন্দ।"

নিত্যকালের এই সঙ্গীকে গুরুদেব যৌবনের প্রারম্ভেও একদিন প্রত্যুষে কলিকাতায় প্রথম অনুভব করেছিলেন। তাঁর নাম দিয়েছিলেন "জীবন-দেবতা"। এই জীবন-দেবতার আনুকূল্যেই সবের মধ্যে নিজের সত্তার অনুভূতির উন্মেষ হয়েছিল সেদিন। মন থেকে সব প্রকার ভেদাভেদ দূর হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর কাছে তখন কেউই এবং কিছুই অপ্রিয় ছিল না। মুটে-মজুরদের রাস্তায় চলাব ভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাদেব মুখশ্রী তাঁর কাছে ভারি আশ্চর্য সুন্দর মনে হয়েছিল। রাস্তা দিয়ে যুবকদের কাঁধে হাত রেখে হাসতে হাসতে যাওয়াটিকেও অসামান্য ঘটনা বলে মনে করেছিলেন। বাড়ীর সামনে দেখেন, একটি গাধার বাচ্চার ঘাড় চাটছে একটি বাছুর। সেই পশুশাবকটির ভাষাহীন স্নেহ সম্ভাষণ দৃশ্যে একটি বিশ্বব্যাপী রহস্যবার্তা গুরুদেবের বুকের পাঁজরে বেজে উঠেছিল। এই ভাবে সেদিন মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত কিছুর চলনের সঙ্গীতে গুরুদেব মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের

উৎসব চারিদিকে হাসির ঝরনা ঝরাচ্ছে সেটিকে যেন দেখতে পেয়েছিলেন।

গুরুদেব এই রকমের একদল প্রেমিক সাধকদের সঙ্গ পেয়েছিলেন শিলাইদহেরই পল্লী অঞ্চলে। যাঁরা আজকে বাংলা দেশে বাউল নামে বিখ্যাত। এঁরা একটি বিশেষ সম্প্রদায়। সংখ্যার দিক থেকে এ সম্প্রদায়ের অতি সামান্যই তখনো পর্যন্ত বর্তমান। এতে হিন্দুও ছিল মুসলমানও ছিল। তবুও ধর্মে এঁরা না হিন্দু না মুসলমান, এঁদের অধ্যাত্মজীবন গড়ে উঠেছিল এই দুই ধর্মের সামঞ্জস্যের মধ্য দিযে। এঁরা প্রেমের সাধক। অজানা অচেনা কায়াহীন বিশেষ এক প্রেমের বস্তুকে ভালবেসেই এঁদের আনন্দ। যাঁকে তাঁরা বলেছেন 'মনের মানুষ'। কিন্তু সে মনের মানুষ অন্যসব দেবদেবীর মত কোন শক্তির প্রতীক নন। তিনি মানুষের বাস্তব জীবনের ভালমন্দ কিছুই করেন না। তিনি আছেন। প্রতিটি মানুষের মধ্যে গোপনে। সেই গোপনবাসী মনের মানুষের খবর প্রেমের সাধনায় তাঁরা পান। কিন্তু ধরতে পারেন না। তাই এঁদের গানের ভাষায় সর্বদাই প্রকাশ পেয়েছে সেই অন্তরবাসী মানুষকে জেনেও না জানার অসীম বেদনা। তাঁকে জানার পথে যতই তাঁরা এগিযে চলেছেন ততই তাঁরা অনুভব করেন যে, না জানার দূরত্ব যেন বেড়েই চলেছে। কোথায় যে তার শেষ তার কোন নিশানা পান না। বাউলরা মনে করেন, একমাত্র না-পাওয়ার ও না-জানার বেদনার দ্বারাই সে-পথের সন্ধান মেলে। বেদনার গভীরতায় না-জানাকে জানার অনুভূতির আনন্দে মন ভরে ওঠে। তাই না-জানার দুঃখ নিবৃত্তির কোন আকাঙ্ক্ষা তাঁদের মধ্যে নেই। শিলাইদহ অঞ্চলের বাউলদের সাধনা হলো এইরূপ এক দুঃখ ও আনন্দের অঙ্গাঙ্গিভাবে মেশা প্রেমের সাধনা, ভালোবাসার সাধনা, যার জন্যে বাইরের কোন বিশেষ আধারের প্রয়োজন হয় না। বাউলদের কাছে এই মনের মানুষের প্রতি প্রেমের বেদনা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে তখন এই জগতের কোন কিছুর প্রতি ভেদাভেদের জ্ঞান থাকে না। এই জন্যেই বোধ হয় তাঁদের বলে 'সহজিয়া'। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সংসারের সকলের সঙ্গেই তাঁদের ঘটে সহজ মিলন। বিশ্বের সঙ্গে তাঁদের একটি গভীর ঐক্যতানের সৃষ্টি হয়।

গুরুদেব এদিক থেকে বাউলদের সঙ্গে মিল অনুভব করেই তাঁর জীবন-দেবতার পরিচয় দিতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন :—

"বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহ-চন্দ্র-তারায়। জীবনদেবতা বিশেষ ভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেচে মনের মানুষ। এই,

মনের মানুষ, এই সর্ব মানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি 'Religion of man' বক্তৃতাগুলিতে।"

জীবন-দেবতা ও মনের মানুষের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পেয়েই গুরুদেব বাউল ও তাঁদের সাধনার প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হন। এই আকর্ষণ যে কতখানি সত্য ছিল এবং তাঁর নিজের জীবনে সেই ভাবধারাকে কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন তার সাক্ষ্য পাব গুরুদেবেরই চিঠি থেকে। তিনি বলছেন :—

"আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হ'ত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি; এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেচে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, শিলাইদহ অঞ্চলেই এক বাউল একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল :—

কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। অপণ্ডিতের মুখে শুনলুম, তার গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায় —যাকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না-জানবার বেদনা তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠেছে। "অন্তরতর যদয়মাত্মা", উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন "মনের মানুষ" বলে শুনলুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল। এমন বাউলের গান শুনেচি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না; তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্য রচনা, তেমনি ভক্তিরস মিশেচে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে।"

১৩১৭ সালে প্রদত্ত ব্রহ্মোৎসবের বক্তৃতায় বাউলদের প্রসঙ্গে গুরুদেব বলেছেন :—

"কয়েকদিন হ'ল পল্লীগ্রামে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের ধর্মের বিশেষত্বটি কি, আমাকে বলতে পার?' একজন বললে, 'বলা কঠিন, ঠিক বলা যায় না।'

আর একজন বললে, 'বলা যায় বৈ কি—কথাটা সহজ। আমরা বলি এই যে, গুরুর উপদেশে গোড়ায় আপনাকে জানতে হবে। যখন আপনাকে জানি তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের এই ধর্মের কথা পৃথিবীর লোককে সবাইকে শোনাও না কেন?' সে বললে, 'যার পিপাসা হবে, সে গঙ্গার কাছে আপনি আসবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই কি দেখতে পাচ্ছ? কেউ কি আসচে?' সে লোকটি অত্যন্ত প্রশান্ত হাসি হেসে বললে, 'সবাই আসবে! সবাইকে আসতে হবে।"

১৯২২ সালে শ্রীনিকেতনে পল্লীসেবা বিভাগের কাজের প্রারম্ভে গ্রামসেবার কাজ কোন আদর্শ ধরে চলবে তা নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে গুরুদেব বাউলদেব সঙ্গে তাঁব যোগাযোগের বিষয়ে যা বলেছিলেন, আমার পিতৃদেবের শ্রুতিলিখন থেকে সেই অংশটি উদ্ধৃত করছি।

গুরুদেব বলেছিলেন :—

'তুমি তো দেখেছ শিলাইদহতে লালন সা ফকিরের শিষ্যগণের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কিরূপ আলাপ জমত। তাবা গরীব। পোষাক-পরিচ্ছদ নাই। দেখলে বোঝবার জো নাই তাবা কত মহৎ। কিন্তু কত গভীর বিষয় কত সহজ ভাবে তারা বলতে পারত। তেমন করে আলোচনা করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এম এ বি এ-কেও দেখি নাই। আমার গল্পের সেই বৈষ্ণবীর সম্বন্ধেও তাই। -দের দেখলে মনে হয় যেন কত হীন। কিন্তু বাহ্যিক দৈন্যের অন্তরালে প্রাচীন culture-এর একটা ধারা এদের মধ্যে ফল্গুর মত প্রবাহিত রয়েছে। তাহা উপলব্ধি করতে হবে। প্রীতির সহিত এদের টেনে নিতে হবে, তবেই দেখবে তোমাদের নিকট এরা নিজেদের হৃদয়ের কপাট উন্মুক্ত করবে। চাই সেই আত্মীয়তার সম্বন্ধ।"

এতক্ষণ গুরুদেবের ব্যক্তি-জীবনে বাউলদেব প্রভাবের কথা শোনা গেল, এবারে বাংলায় উন্নততর সমাজ গড়ার পথে বাউলদের জীবন ও সাধনা কি ভাবে কাজে লেগেছিল তার বিবরণ গুরুদেবের ভাষাতেই শোনা যাক। তিনি লিখেছেন :—

"আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন ক'রে এসেচে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি,—এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান

উভয়েরই, একত্র হয়েচে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরাণ-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাংলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল-কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ ক'রে এসেচে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেচে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।"

গুরুদেব ও বাউলদের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে, তাঁর গানগুলো স্পষ্টতর রবীন্দ্র-বাউলেরই রচনা। তা বানানো নয়। কথাটিকে পরিষ্কার করে বোঝানোর চেষ্টা করি।

দেখা যায়, গুরুদেব তাঁর প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায়ের বহু গানে বাউলদের মতনই কোন এক আপনজনের অভাবের গভীর বেদনাকে বারে বারে প্রকাশ করেছেন। সেই কারণেই কত সহজে বলতে পারলেন গানের ভাষায়—

'আমার কী বেদনা সে কি জানো, ওগো মিতা
সুদূরের মিতা।"

এইরূপ বেদনার আবেগে এমন বহু গান তাঁর মনের গহন থেকে উপচে উঠেছিল, যাতে প্রকাশিত হয়েছে নতুন করে বাউলদেরই মর্মকথা। তা শুনলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হবে যে, রবীন্দ্র-বাউলের গান কতখানি আন্তরিক আবেগ থেকে লেখা। সখ করে বানিয়ে লেখা নয়। যেমন :—

১। আমি তাঁরেই খুঁজে বেড়াই,

২। আমি কান পেতে রই,

৩। সে যে মনের মানুষ, কেন তারে বসিয়ে রাখিস,

৪। আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে।

এই গান ক'টিতে গুরুদেবের চিন্তাব ও রচনার স্বকীয়তা থাকা সত্ত্বেও ভাবে সুরে ও রচনা-পদ্ধতিতে বাউলদের প্রভাব সুস্পষ্ট।

গানের সাহায্য ছেড়ে এবারে নাটকের সাহায্য নেওয়া যাক। গুরুদেবের রচিত প্রায়শ্চিত্ত, ফাল্গুনী ও ডাকঘর নাটকেব প্রধান চরিত্র ক'টি বাউলের আদর্শে সৃষ্ট। নাটকের এই চরিত্র ক'টির দ্বারা এবং নিজে সেই চরিত্রের সার্থক অভিনয় করে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, বিংশ শতাব্দীর মানবসমাজের কল্যাণে ধনঞ্জয় বৈরাগী, অন্ধবাউল ও ফকিরের মত আদর্শ মানুষের একান্ত প্রয়োজন।

কারণ এঁরাই মানুষের ক্ষুদ্র মনের সবরকমের বন্ধন থেকে মুক্তির পথ দেখাতে সক্ষম।

শিলাইদহের সেই মহৎ-প্রাণ বাউল সম্প্রদায়কে হয়তো আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাই বলে তাঁদের সেই মহান বাণীর আজও মৃত্যু ঘটেনি। এ যুগে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে তাঁদের সেই বাণীতে নতুন এক প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। পূর্ববঙ্গে মুসলমান সাধকদের মুর্শীদা ও মারফতী গানে তারই জের বয়ে চলেছে। তা না হলে এ যুগে তাঁরা কি মুর্শীদা গানের মাধ্যমে বলতে পারতেন :—

"মানুষে মানুষ বিবাজে খুঁজে নেওয়া বড় দায়।
মানিক চিনে দু-এক জনে সে মহাজনের কৃপায়॥
মানুষ আছে প্রতি ঘটে, দূরে নয় অতি নিকটে,
ফুলের কলি আপনি ফুটে ভ্রমর ছুটে কাছে যায়।"

পশ্চিম বাংলার বৈষ্ণব-ধর্মানুরাগী একদল বৈরাগী আজও সেই ভাবধারাটিকে পল্লীর জনগণের কাছে পৌঁছে দেয গান গেয়ে। তাদেরই একটি গান হলো :—

"যাঁর তরে প্রাণ কেঁদেছে সে তো তোমার হৃদে আছে।
বাইরে থেকে ডাকৃছ কাকে, পাবে না তারে খুঁজ্‌ছো মিছে।
নাম-ধাম না জান্‌লে পরে কেমন করে ধরবে তাঁরে।
দেখ্‌তে সাধ হয় অন্তরে, ঠিকানা তার সাধুর কাছে॥"

বাংলা দেশ আজ জাতি ও ধর্মের বিরোধে বিভক্ত ও জর্জরিত। এ যুগের বাঙ্গালীর এইটিই হলো মূল সমস্যা। বাঙ্গালী এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে পারতো, যদি বাউলদেব মত বলিষ্ঠ উদার দৃষ্টিতে সব জীবের মধ্যে এক বিশেষ মানুষের অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারত।

আজ এই বলে শেষ করবো যে, এযুগের বাঙ্গালীর কাছে পূর্ব যুগের শিলাইদহ অঞ্চলের বাউল ও রবীন্দ্র-বাউলের যুক্ত সাধনার অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই সাধনার দ্বারাই নানা ভাগে বিচ্ছিন্ন বাঙ্গালী আজ ঐক্যবদ্ধ হোক এবং সমগ্র দেশেব সামনে মহৎ একটি দৃষ্টান্ত খাড়া করে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করুক।

রবীন্দ্রসংগীত সমীক্ষা

আমার পিতৃদেব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ১৯০৭ সালে।

১৯১০ সালে, আমার জন্মের প্রায় ছ-মাস পরেই আমরা শান্তিনিকেতনে আসি। সেই থেকেই একটানা শান্তিনিকেতনেই আছি। আমার যখন বয়স ৫ কিংবা ৬ তখন থেকেই আমি শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ও অভিনয়ের আবহাওয়ায় মানুষ হবার সুযোগ পেয়েছি। সে সময়ের কথা এখনো মনে পড়ে; তখন দিনেন্দ্রনাথ থাকতেন 'দেহলী' বাড়ীর নিচের তলায়। উপরে থাকতেন পূজনীয় গুরুদেব নিজে, আর 'দেহলীর' গায়ে লাগা সে-যুগের অতিপরিচিত "নতুন বাড়ীতে" যে কয়জন অধ্যাপক সপরিবারে থাকতেন তার মধ্যে ছিলাম আমরা। তখন দেখেছি, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ নতুন গান রচনা করেই দিনেন্দ্রনাথকে শেখাচ্ছেন, দিনেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের বয়স্ক থেকে শুরু করে শিশুদেরও সে গান শেখাতেন সন্ধ্যাবেলায়, বিনোদন পর্বে। সেই শিশুদলে ছিলাম আমিও একজন। প্রায়ই গুরুদেব নিজে থাকতেন সেখানে, গান শুনতেন, নতুন গান শেখাতেন একসঙ্গে সকলকে। সেই বিরাট দলে ছিল নানা প্রকৃতির শিক্ষার্থী। অধিকাংশেরই ছিল না সঙ্গীতের কোন শিক্ষা। সকলেরই যে সুরেলা গলা ছিল, তাও নয়। অন্য প্রদেশবাসীরাও থাকতেন এই ক্লাসে। তাঁদের মধ্যে বাংলা ভাষা কেউ কেউ শিখেছেন, কেউ কেউ শিখতে আরম্ভ করেছেন, উচ্চারণে এবং গাইবার ঢং-এ নিখুঁত ছিলেন না কেউই। কিন্তু তাঁদের রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার উৎসাহ ছিল বলে গুরুদেব এবং দিনেন্দ্রনাথ এই ক্লাসে যোগ দিতে বারণ করেননি তাঁদের কাউকে।

মনে পড়ে পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর কথা। তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রবাসী, সংস্কৃত পণ্ডিত। হিন্দী সঙ্গীতের ধ্রুপদ-ধামার, খেয়াল, টপ্পা ইত্যাদি গান এবং তবলা ও পাখোয়াজ বাজনায় সমান পারদর্শী ছিলেন। ইনি এসেছিলেন (১৯১৪) শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের হিন্দীগানের অধ্যাপকরূপে। প্রায় ১৪।১৫ বছর একটানা অধ্যাপনার কাজ করে গেছেন। প্রথমে এসেই

তিনি বাংলা ভাষা এবং গুরুদেবের গান শিখতে আরম্ভ করেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। বহু গান তিনি শিখেছিলেন, গাইতেও পারতেন। বহু উৎসব অনুষ্ঠানে গুরুদেব তাঁকে একক গান গাওয়াতেন। গুরুদেবের গানের স্বরলিপিও করেছিলেন তিনি। হিন্দী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গাইয়ে ও মারাঠাবাসী বলে বাংলা উচ্চারণ সব সময়ে যে যথাযথ হতো তা নয়। তাঁর কণ্ঠে গুরুদেবের গান শুনলেই বোঝা যেত যে, অবাঙ্গালী কেউ গাইছেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে বা ছাত্রছাত্রীদের সে গান শেখাতে দিতেন গুরুদেব স্বয়ং।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শান্তিনিকেতনের উপাসনার মন্দিরে প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় গুরুদেব ও তাঁর পরিবারের অন্য সকলের রচিত ধর্মসঙ্গীত গাইবার জন্ত মাসিক বেতনে নিযুক্ত ছিলেন শ্যাম ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি যে ঢং-এ এবং যে সুরে গুরুদেবের ধর্ম-সঙ্গীতগুলি গাইতেন, প্রচলিত স্বরলিপির সঙ্গে তার খুবই তফাত ছিল। কিন্তু ভট্টাচার্য মহাশয়কে সেই গান গুরুদেব কোনদিন স্বরলিপি অনুসরণে গাইতে বলেননি বা তাঁকে গানের কাজ থেকে বিচ্যুত করেননি। বৃদ্ধ বয়সে, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত (১৯৪০) একইভাবে গান গেয়ে গেছেন।

বিংশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভকালে গুরুদেবের গান রেকর্ডে গাইতে শুরু করেন তখনকার দিনের পেশাদার গায়ক ও গায়িকারা। সে যুগে স্বরলিপি দেখে সেই সুরে গাইবার চেষ্টা বড় একটা দেখা যেত না। রেকর্ডের শিল্পীরা প্রায় সকলেই নিজেদের ইচ্ছামত সুরে ও ঢং-এ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। গুরুদেব শুনেছেন এঁদের অনেকেরই রেকর্ডের গান, সে যুগে। বহুদিন তিনি এ নিয়ে কিছুই বলেননি রেকর্ড কোম্পানীর কর্তৃপক্ষদের। বিশ্বভারতী হবার পর ১৯২৬ সালে গুরুদেব প্রথম এদিকে দৃষ্টি দিলেন। ইচ্ছামত সুরে ও ঢং-এ গাওয়া পুরানো রেকর্ডগুলির বিক্রী বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। কোম্পানীর সঙ্গে স্থির হলো, যিনিই গান করুন তাঁকে সুরটি ঠিকমত শিখে গাইতে হবে। এর পর থেকে অন্য গানের রেকর্ড-শিল্পীরা গুরুদেবের গান ঠিকমত সুরে শিখে গাইতে চেষ্টা করেছেন, গুরুদেবও উদারমনে তাঁদের রেকর্ডগুলি বাজারে প্রচারের অনুমতি দিয়েছেন। গুরুদেবের এই উদারতার সাক্ষ্য স্বরূপ অন্ত প্রকৃতির প্রখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ডে গেয়ে গুরুদেবের অনুমোদন পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনেরই নাম আমি উল্লেখ করব। যেমন—কুন্দন সাইগল, কাননদেবী, পঙ্কজ মল্লিক, কে সি দে, নীহারবালা, শান্তা আপ্তে, রেণুকা দাশগুপ্তা, রাধারাণী ইত্যাদি। এঁদের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত

উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত, এ নিয়ে কোন চিন্তা গুরুদেবকে কখনো করতে দেখিনি।

১৯৩১ সালে গুরুদেবের ৭০ বৎসর জন্মোৎসবের কথা আজও মনে পড়ে। উৎসবটি হয়েছিল কলকাতায়। সেই উপলক্ষে ক'দিন ব্যাপী রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি অনুষ্ঠানও হয়। কলকাতার নানা প্রকৃতির গাইয়েরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ এবং ইন্দিরা দেবীর উপর এই সঙ্গীতানুষ্ঠানের গান শেখানোর এবং পরিচালনার দায়িত্ব ছিল। পুরুষ ও মহিলায় মিলে ৭৫ জনের মত গাইয়ে নিয়ে দলটি গঠিত হয়। একক ও সমবেত সঙ্গীত গাইবার জন্মে গাইয়েদের তৈরী করেছিলেন তাঁরা। গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথ এই গানের দলের অনেকেরই গান আগে শোনেননি। অনুষ্ঠানের আগে—গুরুদেবের কাছে তো নয়ই, দিনেন্দ্রনাথ বা ইন্দিরাদেবীর কাছেও তাঁরা গান শেখেননি। তা' সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই গানের দলে ছিলেন। বাদ পড়েননি কেউই। ৭০ বৎসরের জয়ন্তী উৎসবে যাঁরা গান গেয়েছিলেন, উল্লেখিত তাঁদের নামগুলিতেই আমার বক্তব্যটি পরিষ্কার হবে বলে আমি আশা করি। নামগুলি হলো :—

গায়কগণ—

১। শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য।
৫। শ্রীগোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত।
৬। শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার।
৭। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়।
৮। শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য।
৯। শ্রীসুশীলকুমার বসু।
১০। শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক।
১১। শ্রীঅনিলকুমার বাগচি।
১২। শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ।
১৩। শ্রীকাননকুমার মুখোপাধ্যায়।
১৪। শ্রীহরিপদ রায়।
১৫। শ্রীরবি বসু।
১৬। শ্রীশশিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

১৭। শ্রীপ্রভাত দেব মুখোপাধ্যায়
১৮। শ্রীসাগর লাহিড়ি।
১৯। শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
২০। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষ।
২১। শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল।
২২। শ্রীদীপক চৌধুরী।
২৩। শ্রীঅজিতকুমার মল্লিক।
২৪। শ্রীঅশোক মিত্র।
২৫। শ্রীসুধীর কর।
২৬। শ্রীপিনাকিন ত্রিবেদী।
২৭। শ্রীশৈলেন হোম।

গায়িকাগণ—

১। শ্রীমতী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়।
২। শ্রীমতী মালতী বসু।
৩। শ্রীমতী কনক দাস।
৪। শ্রীমতী রমা কর।
৫। শ্রীমতী সাবিত্রী গোবিন্দ।
৬। শ্রীমতী জে. বেগম।
৭। শ্রীমতী লতিকা রায়।
৮। শ্রীমতী সুজাতা মুখোপাধ্যায়।
৯। শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়।
১০। শ্রীমতী বাণী চট্টোপাধ্যায়।
১১। শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্তী।
১২। শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুর।
১৩। শ্রীমতী অমিতা সেন (খুকু)
১৪। শ্রীমতী পূর্ণিমা চৌধুরী।
১৫। শ্রীমতী দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়।
১৬। শ্রীমতী সরস্বতী দত্ত।
১৭। শ্রীমতী অরুন্ধতী ঘোষ।
১৮। শ্রীমতী উমা চট্টোপাধ্যায়।

১৯। শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়।
২০। শ্রীমতী শেফালিকা পালিত।
২১। শ্রীমতী সুলেখা ঘোষ।
২২। শ্রীমতী অঞ্জলি দাস।
২৩। শ্রীমতী গীতা দাস।
২৪। শ্রীমতী অমিয়মুকুল চৌধুরী।
২৫। শ্রীমতী ইলা রাণী ঘোষ।
২৬। শ্রীমতী লীলা মিত্র।
২৭। শ্রীমতী করুণা চৌধুরী।
২৮। শ্রীমতী অমলা দত্ত।
২৯। শ্রীমতী মনিকা ধর।
৩০। শ্রীমতী গীতা রায়।
৩১। শ্রীমতী ললিতা সেন।
৩২। শ্রীমতী কল্যাণী সরকার।
৩৩। শ্রীমতী মন্দিরা গুপ্ত।
৩৪। শ্রীমতী সুধা দাস।
৩৫। শ্রীমতী অনুভা ঠাকুর।
৩৬। শ্রীমতী অরুণা সেন।
৩৭। শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়।
৩৮। শ্রীমতী ঈষিতা চট্টোপাধ্যায়।
৩৯। শ্রীমতী মালা দাস।
৪০। শ্রীমতী সংযুক্তা সেন।
৪১। শ্রীমতী গায়ত্রী বাগচী।
৪২। শ্রীমতী রুবি চট্টোপাধ্যায়।
৪৩। শ্রীমতী শিবানী সরকার।
৪৪। শ্রীমতী মঞ্জু বসু।
৪৫। শ্রীমতী হাসি বসু।
৪৬। শ্রীমতী উষা মজুমদার।
৪৭। শ্রীমতী আভা চন্দ্র।

উপরিউক্ত মহিলা ও পুরুষ গাইয়ের দলে, শান্তিনিকেতন থেকে গিয়েছিলেন

প্রায় ২০ জনের মত, বাকিরা সকলেই ছিলেন কলকাতার।

বিদেশী সঙ্গীতের পণ্ডিত ডাঃ আর্নল্ড বাকে, একটানা বহু বছর শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে (১৯২৫ থেকে ১৯৩৪), দিনেন্দ্রনাথের কাছে বহু গান শিখে, বহু গানের স্বরলিপি করেছিলেন। য়ুরোপের গাইয়েদের মত কণ্ঠস্বরে তিনি গুরুদেবের গানগুলি পিয়ানো যন্ত্র সহযোগে সর্বদাই গাইতেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর একটি পিয়ানো ছিল। বাংলা গানের উচ্চারণও ছিল য়ুরোপীয়দের মত বিকৃত। গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের উৎসাহে তিনি শান্তিনিকেতনে ও শান্তিনিকেতনের বাইরে কলকাতায় এবং ভারতের বহু সহরে গুরুদেবের গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বরের বিকৃতি সত্ত্বেও কোনদিন গুরুদেব বা দিনেন্দ্রনাথের মুখে এঁর গানের নিন্দা শুনিনি।

গুরুদেবের নৃত্যনাট্য অভিনযের যুগের আর একটি ঘটনার কথা বলি। বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনে দক্ষিণ ভারতীয় একটি ছাত্র ছিল। তাঁর নাম কোণ্ডামুনি রেড্ডি। তাঁর গলা ছিল অত্যন্ত ভারী ও সুরেলা। কিন্তু উচ্চারণ-দোষ তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি কোনও দিনই। একমাত্র সুরেলা ভারী গলার গুণে গুরুদেব তাঁকে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের গানের দলে স্থান দিলেন এবং কলকাতা, দিল্লী, পাটনা, লাহোর পর্যন্ত তিনি নৃত্যনাট্য দলের সঙ্গে গান গেয়েছেন; গুরুদেব স্বয়ং ছিলেন এই দলের দলপতি।

শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের শেষ ২৫ বছরের সঙ্গীত ও অভিনয়ের জীবনকে খুবই কাছে থেকে দেখেছি ও জেনেছি। তাঁর জীবনের এই দিকটিতে আমার সাধ্যমত একটু স্থান করে নিতে পেরেছিলাম বলেই তাঁর সঙ্গীত-জীবনের এই চিত্রটিকে তুলে ধরবার সুযোগ পেলাম। তাঁর জীবনের এই দিকটির প্রতি এখনো কেউই নজর দেননি। কিন্তু আজকের দিনে এর প্রয়োজন খুবই দেখা দিয়েছে। কারণ, গুরুদেবের গান কে গাইবেন বা কা'র গাইবার অধিকার আছে, তা নিয়ে নানা প্রকার বাদানুবাদ শুরু হয়েছে। আজকাল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অধিকারী ও অনধিকারী নিয়ে অনাবশ্যক যে তর্ক উঠেছে, এর অবসান হওয়ার খুবই দরকার এবং তা সহজেই হতো, যদি গুরুদেবের উদার মনের এই চিত্রটি সকলের কাছে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠতো।

"বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত" নাম দিয়ে এক বিশেষ ধারার গানের কথা এখন প্রায়ই শোনা যায়। অর্থাৎ কেবল "রবীন্দ্রসঙ্গীত" বলতে আমরা যা বুঝি, "বিশুদ্ধ রবীন্দ্র-সঙ্গীত" যেন তা নয়। "বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীতের" প্রচারকেরা গুরুদেবের গানে বিশেষ

এক ধরনের গায়কীর প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন। তাঁরা মনে করেন, হিন্দীতে তো নয়ই, অন্য কোনো বাংলা গানের গায়কীর সঙ্গেও নাকি এ গায়কীর মিল নেই। এর জাত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই অন্য গানের সঙ্গে এর এক পংক্তি হতে পারে না, ভিন্ন জাতের গাইয়েদের রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে দিলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জাত যাবে। ভারতে বেদ পাঠে যেমন অব্রাহ্মণদের অধিকার ছিল না, এও প্রায় সেই রকমের হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে এ ধরনের উচ্চনীচ ভেদের চিন্তার সত্যিই কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। কেননা, গুরুদেবের গানে ভিন্ন প্রকৃতির গায়কীর যদি কিছু থাকতো এবং তার প্রয়োজন আছে বলে যদি গুরুদেব সত্যিই মনে করতেন, তাহলে নিশ্চয় তা নিয়ে কিছু-না-কিছু লিখে যেতেন। কিন্তু তা নিয়ে লিখিতভাবে কোন আলোচনা তাঁর পাই না। তাঁর গানের অধিকারী-অনধিকারী নিয়েও তিনি কোন নির্দেশ দিয়ে যাননি। তাঁর কার্যকলাপের পরিচয়েও দেখা যায় তার উল্টোটাই। তিনি নির্বিচারে সকলকেই গাইতে উৎসাহিত করতেন। তিনি চেয়েছিলেন, যারা খেটে খায়, অফিসে যায়, যাদের পক্ষে ওস্তাদের মতো গলার সাধনা করে গান গাওয়ার সুযোগ নেই—সাদাসিধে রূপে গেয়ে যারা মনে আনন্দ পেতে চায—তারা সকলেই তাঁর গান গাইবে। তাই বলেছিলেন :—

"I do not hesitate to say that my songs have found their place in the heart of my land, along with her flowers that are never exhausted, and that the folk of the future, in days of joy or sorrow or festival, will have to sing them."

অন্যত্র বলেছেন :—

"আমার গান বাঙালী জাতিকে নিতেই হবে, আমার গান গাইতেই হবে সকলকে, বাংলার ঘরে ঘরে, প্রান্তরে, নদীতীরে।"

এইরূপ ব্যাপক প্রচারে, সংখ্যায় ভালর চেয়ে মাঝারী বা নিম্নশ্রেণীর শিল্পীই যে বেশী দেখা দেয়, সে কথা কি গুরুদেব জানতেন না? খুবই জানতেন, তবে তিনি এও জানতেন যে, ভাল গাইয়েরা নিজের ক্ষমতাতেই উঠবে এবং টিকে যাবে, খারাপেরা আপনা থেকেই হবে লুপ্ত।

একথাও ঠিক যে, একান্তভাবেই তিনি চেয়েছিলেন, নিজে তিনি যে রসে মজে বা যে হৃদয়াবেগের প্রেরণায় গানগুলি রচনা করেছিলেন, সে দিকটির প্রতি ভাল ও মন্দ সব গাইয়েরাই যেন লক্ষ্য রাখে—গানের ভাবলোকে

প্রবেশের চেষ্টা করে। তাই তাঁকে বলতে হয়েছিল :—

"একটু দরদ দিয়ে, রস দিয়ে গান শিখিয়ো। এইটেই আমার গানের বিশেষত্ব। তার উপর (দরদ, রস) যদি তোমরা স্টীম্ রোলাব চালিয়ে দাও, আমার গান চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।"

অর্থাৎ গুরুদেবের কাযকলাপের সাক্ষাৎ পরিচয় ও তাঁর লিখিত উক্তি থেকে যেটুকু বুঝেছি তা হলো, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার অধিকার সকলেরই আছে, সকলেই গাইবার চেষ্টা করবে, নিজের সুখ-দুঃখের প্রয়োজনে। কিন্তু কেবল পোষা পাখীর মত মুখস্থ করে গেয়ে যাওযাটাই মুখ্য হবে না। উদ্দেশ্য হবে, নিজে গান গেয়ে গানেব রসে মনকে মজিয়ে তোলা। এই ভাবে নিজেকে গানের রসে বসিযে নেবার সামর্থ্য থেকেই রসিক শ্রোতারা তা শুনে পাবে তৃপ্তি। এই হলো সব গানেরই শেষ কথা। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না থাকাতেই দেখা দেয় নানা প্রকার জটিল তর্ক। রবীন্দ্রসঙ্গীতে সম্প্রতি তাই দেখা দিয়েছে।

শ্রোতার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত

"রবীন্দ্রসঙ্গীত" শব্দটিকে কি অর্থে ব্যবহার করা উচিত, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রচলিত মত অনুযায়ী আমি বলবো যে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ কৃত গান মাত্রই "রবীন্দ্রসঙ্গীত"। যে অর্থে আমরা বাউলসঙ্গীত, রামপ্রসাদী, নিধুবাবুর টপ্পা, দাশুরায়ের পাঁচালি, ডি এল রায়ের গান, অতুলপ্রসাদী ও নজরুল গীতি শব্দগুলি ব্যবহার করি।

সাহিত্যিকেরা গুরুদেবের প্রথমযুগ, মধ্যযুগ ও শেষযুগের কাব্য ও সাহিত্যকে ভিন্ন নামের দ্বারা পৃথক করেননি। তাঁদের কাছে সবই রবীন্দ্রকাব্য বা রবীন্দ্ররচনা রূপে পরিচিত। এখানে তাঁরা যখন তা স্বীকার করেছেন, তখন গানের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম কেন হবে? গুরুদেবের প্রথম জীবনের রচনাগুলি বেশী বয়সের তুলনায় তেমন পাকা হাতের নয়, তবুও তাকে রবীন্দ্রকাব্য বা রবীন্দ্রসাহিত্য নয় বা তার ভিন্ন নাম দিতে হবে, একথা কেউই বলেন না।

নদীর ক্ষুদ্র জলধারা পর্বতকন্দর থেকে, ছোট আকারে প্রকাশিত হয়ে, নিজেকে বিস্তৃত করতে করতে বিশাল সমুদ্রে গিয়ে মিশে যায়। তার সেই প্রথমকার জলধারাকে কি কেউ স্বীকার না করে পারে? যদি তা না করতো তো "গঙ্গোত্রী" তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হতো না। গুরুদেবের কাব্য ও গানকে, আমাদের সেই একই দৃষ্টিতে দেখতে হবে ও জানতে হবে। আরম্ভের ক্ষুদ্র জলধারার মত হলেও, বৃহতের অংশ হিসেবে তারও একটি মূল্য আছে। গুরুদেবের গানের আদিযুগ থেকে অন্তযুগ, সেই একই ভাবধারার অঙ্গ।

গুরুদেবের প্রথম জীবনের গানে, সহজ সরল হৃদয়াবেগের যে পরিচয় পাই, তার মাধুর্যও অবহেলার বস্তু নয়। সহজ সরল লোকসঙ্গীতের মত, গানগুলি প্রকৃত গীতরসিকদের মনে রসের সঞ্চার করে।

বাল্মীকি-প্রতিভা প্রভৃতি গীতনাটকের গানকে, নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে, অন্যান্য লিরিক আবেগের গানের মত গাওয়া যায় না। কিন্তু সাধারণ নাটকে ব্যবহৃত সব গানের বেলায় একথা খাটে না। এমন অনেক গান আছে, যা নাটকে যুক্ত হবার বহু আগে তিনি নিজের আবেগে রচনা করেছিলেন; পরে

নাটকে জুড়েছেন। প্রথম রচনার সময় গানগুলি ছিল গুরুদেবের নিজের হৃদয়াবেগের প্রকাশ, পরে নাটকের প্রয়োজনে সেগুলি দেখা দিল পাত্রপাত্রীর গান হিসেবে। এই সব গানকে গীতিনাট্য বলা যাবে না।

গুরুদেব এমন বহু গান রচনা করেছেন, যার অর্থ করলে দেখা যাবে যে, তা কোন নারীর মনের কথা। এইসব গান পুরুষের কণ্ঠেও গাওয়া হয়। গুরুদেব নিজেও গেয়েছেন, দিনেন্দ্রনাথও গাইতেন। কিন্তু এতে যদি আপত্তি থাকে, তবে এর থেকে কয়েকটি জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হবো। যেমন, পুরুষের পক্ষে কি নারীর মন নিয়ে কোন কথা বলা সম্ভব? যথাযথভাবে নারীহৃদয়ের সুখদুঃখের কথা কি পুরুষেরা প্রকাশের অধিকারী? দু'দলের মানসিক ও দৈহিক ব্যবধানের বিচারে তা সম্ভব নয় বলেই তো মনে হবে। কিন্তু তা হলেও, যুগে যুগে পুরুষেরা নারীর হৃদয়ের কত কথাই না গানে ও কবিতায় প্রকাশ করে গেছেন। পুরুষদের মত এতখানি মর্মস্পর্শী করে কোন নারী কি নিজেদের কথা বলতে পেরেছেন? গুরুদেবের এই রকমেব গান ও কবিতা প্রচুর আছে। সে গান যদি পুরুষেরা গায়, তার মর্মটি উদ্ঘাটন করে, তবে তা অস্বাভাবিক হবে কেন? হিন্দী খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী গানে দেখি, নারীহৃদয়ের বিরহের বিচিত্র বেদনা। এ গানের শ্রেষ্ঠ গাইয়ে ও শ্রেষ্ঠ রচয়িতারা সকলেই কিন্তু পুরুষ। বড়ে গোলাম আলি খাঁ যখন "বাজু বন্ধ খুল খুল যায়" গানটি ভৈরবী রাগিণীর ঠুংরিতে গাইতেন, তখন তাঁর গানে কিশোরী রাধার বিরহের আবেগ-টিকে অনুভব করে অনেক শ্রোতারই চোখে জল এসেছে। তাঁরা তো খাঁ সাহেবের মত গুম্ফধারী বিরাটবপু পুরুষে তা গাইছেন বলে শুনতে আপত্তি বা রসহানির অভিযোগ তোলেননি। এ থেকেই বোঝা যায় যে, গান যখন আমরা শুনি তখন কে গাইছেন বা গানের কথা নারী বা পুরুষের কিনা, এ চিন্তা আমাদের মনে একেবারেই বড় স্থান পায় না। গানের মূল আবেগটি যথাযথভাবে প্রকাশিত হচ্ছে কিনা, আমাদের কান ও মন সেইদিকেই উন্মুখ হয়ে থাকে।

"মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে" গানটি গুরুদেবের একটি অতি প্রিয় গান। যৌবনে এ গানটি তিনি খুবই গাইতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে আবেগের সঙ্গে গানটি গাইতে শুনেছি। তাঁর মত পুরুষের পক্ষে শ্রীমতী রাধার বিরহের গান রচনা করা ও গাওয়া যে অস্বাভাবিক হয়েছে, শুনে কিন্তু পূর্বে কেউ তা মনে করেনি। পুরুষ কীর্তনীয়ারা কিশোরী রাধার মিলন ও

বিরহের নানা পদ ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেয়ে ভক্ত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখেন। শ্রোতাদের কাছে যদি তা স্বাভাবিক না হতো, তবে যুগ-যুগ ধরে কি করে তাঁরা এ গান কীর্তনের আসরে গেয়ে এসেছেন! মহিলা শ্রোতারাও তা নিয়ে কখনো আপত্তি করেননি।

"মেঘের কোলে রোদ হেসেছে" গানটি বালকদের জন্য হলেও, বড়দের দিয়ে গাওয়ানোর যুক্তি একই। আগেকার দিনে নাটকের অভিনয়কালে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের মত বালকের দলকে নিয়ে একসঙ্গে গানটি গাইতেন। যদি এ যুক্তি না মানি, তবে গুরুদেবের "শিশু" কাব্যটির দশা কি হবে? একথা ঠিক যে, গুরুদেব শিশুদের কথা মনে রেখে অনেক গান ও কবিতা রচনা করেছেন। তা হলেও শিশুদের পক্ষে তার পূর্ণরস আহরণ করা কখনই সম্ভব নয়। গুরুদেব তাঁর এ ধরনের গান, কবিতা ও নাটকের বিষয়ে বলেছেন যে, শিশুদের মনে আনন্দদানের উদ্দেশ্যে তিনি এগুলি রচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু সেই রচনার ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর নিজের হৃদয়াবেগকেই মূলত প্রকাশ করে ধরতে চেষ্টা করেছেন।

গুরুদেবের গান গাইতে হলে, গানের সেই সেন্টিমেণ্টের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় থাকা দরকার, শ্রদ্ধেয় পরিমলবাবুর একথার সঙ্গে আমি একমত। এই পথে শিল্পীরা যতখানি এগুতে পারবেন, গানের রসসৃষ্টির পথ তাঁদের কাছে ততখানি সুগম হবে। কিন্তু এ পথে অগ্রসর হবার জন্যে কি একমাত্র গলার সাধনা ও উচ্চারণের বিশুদ্ধতাই দরকার? তা নয়। এর জন্য প্রয়োজন আরো একটি জিনিসের, যা ঐ দুয়ের অনেক উর্ধ্বে। সে হলো গানের রস ও দরদ। সেখানে পৌছতে হলে শিল্পীর পক্ষে দরকার—গুরুদেবের মত বিশ্বজোড়া প্রেম ও আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা। প্রকৃতি ও বস্তুজগতের সবেতেই ছিল তাঁর অগাধ ভালবাসা। তাই সবের মধ্যেই শুনেছেন তাদের আনন্দ ও বেদনার নানা সুর। সেই সুর গুরুদেবের হৃদয়কে বারে বারে আঘাত করেছে। প্রকাশ পেয়েছে তা তাঁরই গানে ও কবিতায়। বিচিত্ররূপে গুরুদেবের শত শত গান ও কবিতায় তা ছড়িয়ে আছে। এই সব অসংখ্য ছোট ছোট লিরিক আবেগকে হৃদয়ঙ্গম করে গাইতে হলে, যে প্রকার সঙ্গীতের সাধনা ও কাব্যচর্চার প্রয়োজন, তার পরিচয় এখনো দেশে তেমন দেখা দেয়নি। আমরা কেবলমাত্র তাঁর গানের কাঠামোর উপরেই আছি। সেটি নিয়েই আমাদের যা কিছু আনন্দ ও উল্লাস। তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য যে দরদভরা শিল্পীর স্তরে নিজেদের

তুলে ধরা দরকার, তা এযুগের ক'জনের মধ্যে আমরা পেয়েছি? মাস্টারমশায়ের কাছে শিখে ও পড়ে এ রসের প্রকৃত রসিক হওয়া যায় না, কেউ কাউকে পিটিয়ে রসিক করে তুলতেও পারে না। নিজেকেই নিজের ক্ষমতানুযায়ী তৈরী করে নিতে হয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের শব্দবিকৃতি বা ভুল শব্দে গাওয়া কিংবা অমার্জিত উচ্চারণ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সব গানের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। বাঙালী শিল্পীরা যখন হিন্দী উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের চর্চা করেন, তখন হিন্দী বা উর্দু শব্দের নিখুঁত উচ্চারণের দিকে স্বভাবতই তাঁদের মনোযোগ দিতে হয়। তা সত্ত্বেও উচ্চারণ বিকৃতি কখনো যে হয় না তা নয়। অনিচ্ছাকৃত বলে শ্রোতারা সেটুকু মার্জনা করেন।

বাংলাভাষায় গান রচনা করেছেন গুরুদেব। অতি সরল সহজ কথার ভাষায় তা রচিত। এ ভাষা এযুগের বাঙালী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ব্যবহার করেন তাঁদের পঠনে, বলনে, শ্রবণে ও পরস্পরের সঙ্গে আলাপে আলোচনায়। তাঁরা গুরুদেবের গানের বেলায় জেনেশুনে বা স্বেচ্ছায় শব্দবিকৃতি, ভুল শব্দ বা অমার্জিত উচ্চারণে তা গাইবেন একথা আমি ভাবতেই পারি না। আমি রেডিয়ো ও রেকর্ডের গানে এ ধরনের অভিযোগের কোন নমুনা এখনো শুনিনি। তবুও যদি তা কখনো ঘটে থাকে, তবে শিল্পীকে তা জানালে নিশ্চয়ই তার সংশোধন সে করবে। কেউ অবাধ্য নয়।

বাংলার কতগুলি জেলার উচ্চারণের নিজস্ব ঢং আছে। কখনো কখনো সেই জেলার গাইয়েদের মধ্যে তার ছাপ অজ্ঞাতে এসে পড়ে। আজকের দিনের শ্রোতাদের সতর্ক দৃষ্টির চাপে শিল্পীরা এর সংশোধন না করে পারেন না। যদি কেউ ইচ্ছামত চলতে চান, তবে বাংলাদেশের শ্রোতারা তাঁকে গাইয়ে বলে কখনই স্বীকার করবে না।

রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের ক্রমবিকাশ

রবীন্দ্রনাথের জীবনে লক্ষ্য করার মত একটি দিক হলো, তিনি যে বিষয়ে যা ভাবতেন, সে বিষয়ে নিজের হাতে কাজের দ্বারা তা দশের বা দেশের সামনে উদাহরণ হিসেবে খাড়া করতেন। কেবল বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতদের মত বড় বড় আদর্শের বাণী প্রচার করেই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করতেন না। হাতে-কলমে তা করে প্রমাণ করতেন যে, তিনি যা ভাবেন, যা বলেন তা অবাস্তব নয়, তার মধ্যে সত্য আছে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ললিতকলা, সঙ্গীত ও নৃত্যের যে বিশেষ স্থান থাকা দরকার, একথা তিনি কেবল একটা বড় আদর্শ হিসেবেই প্রচার করলেন না, শান্তিনিকেতনের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে তার সম্মানজনক স্থান করে দিয়ে মানুষের সমাজে তার প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ দিলেন। তাঁর এই চিন্তাকে কার্যকর করে তুলতে তিনি প্রথম থেকেই যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। নিজে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নেচেছেন, নাচে উৎসাহিত করেছেন, নাচের উপযোগী নাটকাদি রচনা করে দিনের পর দিন ধৈর্য ধরে মহড়া পরিচালনা করেছেন। একাজে তাঁর একটুও অবসাদ বা অবহেলা ছিল না। তিনি নাচ অত্যন্ত ভালবাসতেন। নির্মল আনন্দ উপভোগের একটি বড় অবলম্বন রূপে তিনি এটিকে দেখতেন বলে অন্যরাও যাতে সেই আনন্দ উপভোগ করে, সেই দিকেই ছিল তাঁর বিশেষ চেষ্টা। এবিষয়ে নিজেই এক জায়গায় লিখছেন :—

"আমি বিচিত্রের দূত। নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি ছবি আঁকি, যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহৈতুক আনন্দে অধীর আমরা তারই দূত।···যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে নৃত্যে চিত্রে বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে, সুখদুঃখের আঘাতে সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি। এই আশ্রমের নীলাকাশ উদয়াস্তের প্রাঙ্গণে এই সুকুমার বালক-বালিকাদের লীলা-সহচর হতে চেয়েছিলাম। লীলাময়ের লীলার ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে, এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ, আমার স্বার্থকতা।"

বিশেষ ভাবে নৃত্যকলাকে গুরুদেব কিভাবে দেখতেন, সে দিকটি ভাল করে বোঝাবার জন্যে তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছেন—

"নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহচাঞ্চল্যের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবল ছন্দের আনন্দ।

"আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালনা করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবেগ, এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পর মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানাভঙ্গীতে বিচিত্র করে—জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য।

"নৃত্যের কোনো একটি ভঙ্গীও স্থির হয়ে থাকে না, কেবলই তা নানা-খানা হয়ে উঠছে। তবু, যে দেখছে সে আনন্দিত হয়ে বলছে, আমি নাচ দেখছি। নাচের সমস্ত অনিত্য ভঙ্গীই তালে মানে বাঁধা একটি নিরবচ্ছিন্ন সত্যকে প্রকাশ করছে। আমরা নাচের ভঙ্গীকেই মুখ্য করে দেখছিনে, আমরা দেখছি তার সত্যটিকে, তাই খুশী হয়ে উঠছি।

"মেয়েরা অঙ্গভঙ্গিমার লতানে রেখা দিয়ে গানের সুরের উপর নকশা কাটতে থাকে। মনে মনে ভাবি, এর অর্থটা কী। আমাদের প্রতিদিনটা দাগ-ধরা, ছেঁড়াখোঁড়া, কাটাকুটিতে ভরা, তার মধ্যে এর সংগতি কোথায়।···প্রতিদিনের দৈন্যটাই যদি একান্ত সত্য হতো তাহলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভালো লাগত না, এটাকে পাগলামি বলতুম। কিন্তু ছন্দের এই সুসম্পূর্ণ রূপলীলাটি যখন দেখি তখন মন বলতে থাকে, এই জিনিসটি অত্যন্ত সত্য—ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছিন্ন ভাবে চারিদিকে যা চোখে পড়তে থাকে তার চেয়ে অনেক গভীর ভাবে, নিবিড় ভাবে।"

গুরুদেবের কাছে নৃত্যকলা মর্যাদা পেয়েছিল দেহের চলমান একটি শিল্পরূপে। তাঁর মনকে আমোদিত করেছে এই ছন্দের আনন্দ। এই কারণেই বিনা সংকোচে শান্তিনিকেতনে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন নাচের একটি প্রাণবান আন্দোলন। শান্তিনিকেতনের পরিপূর্ণ জীবনের শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে ভাবে তা রূপ নিয়েছিল, তার প্রতি লক্ষ্য করে গুরুদেব বললেন—

"আমি পূর্ব দেশের নানা স্থানে বেড়াবার কালে নৃত্যকলা দেখবার সুযোগ পেয়েছি। জাভায়, বালীতে, শ্যামে, চীনে, জাপানে; আমাদের দেশে কোচিন মালাবার মণিপুরে। য়ুরোপের ফোক্‌ডান্স্ এবং অন্যান্য নাচের সঙ্গে আমি

পরিচিত। এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে, বলবার অধিকার আছে। এই কথা আপনাদের বলতে দ্বিধা করব না যে, আমাদের আশ্রমে নৃত্যকলার ভিতরে সকল ধারা মিলেছে, তার পিছনে যে সাধনা, যে শিল্পবোধ রয়েছে এবং সমগ্রের সৌন্দর্য বিকাশ আছে তা যে-কোনখানেই দুর্লভ।"

গুরুদেবের এই উক্তি ক'টি থেকে বেশ বোঝা যায় যে, নৃত্যকলাকে তিনি একটি সম্মানজনক শিক্ষনীয় বিদ্যারূপে অনুভব করতেন। বাংলাদেশে এর অভাব উনবিংশ শতক থেকে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল নগরবাসী শিক্ষিত সমাজে। সেখানে নৃত্যকলা ছিল কেবলমাত্র বিলাসের সামগ্রী। তাই, পেশাদার বাঈজী, খেমটাওয়ালী, যাত্রা ও থিয়েটারের নর্তক-নর্তকীদের মধ্যে এর চর্চা ছিল নিবদ্ধ। নিম্নস্তরের বিলাসের বাইরে মানবচিত্তে নাচের যে আর কোন স্থান থাকতে পারে, সে বোধও নগরের শিক্ষিত সমাজ সম্পূর্ণ হারিয়েছিল। যে কারণে, সে যুগের নগর-সমাজের নরনারীদের মধ্যে কোনরূপ নৃত্যকলার চর্চা ছিল বলে জানা যায় না। কিন্তু, নৃত্যকলার সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল, এবং আজও আছে গ্রাম-সমাজে। ভারতীয় লোকনৃত্যের ব্যাপক প্রচলনের পরিচয়ে তার প্রমাণ মেলে। নগরের শিক্ষিত সমাজের অবহেলায় গ্রামের নানাপ্রকার সামাজিক নৃত্য ক্রমশই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। তবুও এখনো যা আছে, তার বৈচিত্র্য গর্বের বিষয়। নির্মল আনন্দ উপভোগের উপযোগী এই নৃত্যকলার প্রতি শিক্ষিত সমাজের এই অবহেলা, সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের দিক থেকে গুরুতর ত্রুটি বলেই গুরুদেব মনে করেছিলেন। এবং তিনি বেশ বুঝেছিলেন যে, মুখে তিনি যতই বলুন না কেন, শহরবাসী শিক্ষিতদের কাছে এ কথার সমর্থন তিনি পাবেন না। তাই তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপদের মধ্যে নৃত্যচর্চার বিস্তারের প্রতি মন দিলেন।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের মাধ্যমে গুরুদেব নতুন যে নৃত্য-আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন এবং যার পরিণতি আমরা দেখতে পাই তাঁর জীবনের শেষ দিকে রচিত পূর্ণাঙ্গ নৃত্য-নাট্যগুলিতে, তার পিছনে গুরুদেবের একনিষ্ঠ চেষ্টা ও পরিশ্রমের যে ইতিহাসটি আছে, তার সঠিক ইতিহাস কারুরই জানা নেই। তার বিবরণ প্রকাশিত হলে আমরা দেখতে পাব যে, নৃত্য বিষয়ে তিনি মুখে বা লিখিতভাবে যা বলতেন, সেসব কেবল তাঁর কবিমনের ক্ষণিক হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস মাত্র নয়, এ তাঁর নিজের জীবনবিকাশের একটি আবশ্যকীয় সত্য।

তপতী নাটক

রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটকটি অভিনীত হয় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে, বাংলা ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসে, জোড়াসাঁকোর বাড়ীর পুরাতন পুজোর দালানের দক্ষিণ প্রান্তে মঞ্চ বেঁধে। নাটকটির রচনা ও অভিনয়ের পিছনে একটি ইতিহাস আছে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে গুরুদেবকে উত্তর আমেরিকার কেনেডা ভ্রমণে বেরিয়ে প্রায় চার মাস বিদেশে কাটাতে হয়। দেশে ফেরেন ৪ঠা জুলাই। কেনেডার যাত্রা-পথ ছিল জাপান হয়ে। সামনের মার্চ মাসে শান্তিনিকেতনে যে বসন্তোৎসব আসছে, সেকথা বিদেশ-যাত্রা পথে তিনি ভুলতে পারেননি। তাঁর পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না। কারণ, শান্তিনিকেতনের সারা বৎসরের নানা উৎসবগুলি এখানকার শিক্ষার জীবনের একটি অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ রূপেই তিনি প্রচলন করেছিলেন। সেই কারণে উৎসবগুলি যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, সর্বদাই তার চেষ্টা তিনি করতেন। তার মধ্যে কোনো শিথিলতা বা অমনোযোগ দেখলে, তিনি তা একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তাঁকে সর্বদাই থাকতে হতো উৎসবগুলির কেন্দ্রে। নিজে উৎসবে থেকে তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন খুবই উৎসাহ এবং আগ্রহের সঙ্গে। এই কারণে, বিদেশ-যাত্রা পথে আগত দোল উৎসবের কথা তিনি ভুলতে পারেননি। জাহাজটি সাংহাই পৌছবার পূর্বেই সেখান থেকে বসন্তোৎসবের কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবীকে ওরা চৈত্রের এক চিঠিতে জানাচ্ছেন:

"পাঁজিতে দেখলুম ১১ই চৈত্র দোল পূর্ণিমা। আর তো দেরী নেই— এবারে তোমাদের উৎসব থেকে বঞ্চিত হলুম। তোমরা কি কিছু অভিনয়ের চেষ্টা করচ? নতুন মেয়েদের নিয়ে নটির পূজা যদি করতে পারো তো ভালো হয়। 'রাজা ও রানী' অভিনয় কি তোমরা দেখেচ? আমার আপসোস হচ্ছে ওটা আমরা করতে পারলুম না।"

এ চিঠিতে গুরুদেবের মনের ইচ্ছাটি জানা গেলেও, প্রতিমা দেবী সেবারের দোলপূর্ণিমাতে সময়াভাবে কোনটারই আয়োজন করতে পারেননি। দোল

উৎসবের রাত্রির জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কার্যসূচী স্থির হয়ে গিয়েছিল, আগে থেকেই।

আষাঢ় মাসের শেষে বিদেশ থেকে ফেরার পরই গুরুদেবকে 'রাজা ও রানী' নাটকের অভিনয়ের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়। ৭ই শ্রাবণ সন্ধ্যায় কিছু অধ্যাপক ও বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের কাছে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত পুরানো নাটকটি পড়ে শোনালেন। শ্রোতার দলে আমিও ছিলাম। সেদিন 'রাজা ও রানী' নামেই নাটকটি তিনি পড়ে শোনালেন।

ঐ সময়ে দিনেন্দ্রনাথের পরিচালনায় বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ উৎসবের প্রস্তুতি চলছিল। শ্রীযুক্তা প্রতিমাদেবী প্রস্তুত হচ্ছিলেন নতুন মেয়েদের নিয়ে 'নটীর পূজা' নাটকের অভিনয়ের জন্যে। ২৫শে শ্রাবণ সন্ধ্যায় সিংহসদনে 'নটীর পূজা' অভিনীত হলো সংক্ষিপ্তাকারে। সেই দিনেই ছিল শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব। পরের দিন শান্তিনিকেতনে সম্পন্ন হলো বৃক্ষরোপণ ও বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠান। এরই অবসরে গুরুদেব 'রাজা ও রানী'-কে গদ্যের ভাষায় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কাজ করে যাচ্ছিলেন। ২২শে শ্রাবণ সন্ধ্যায় পরিবর্তিত 'রাজা ও রানী' নাটকটি পড়ে শোনালেন। প্রবীণ অধ্যাপকদের সঙ্গে নাটকের পুরানো নামটির পরিবর্তন করা নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল। স্থির হয়, 'রাজা ও রানী' নামটির পরিবর্তে 'সুমিত্রা', 'সাবিত্রী', 'তপতী' ও 'কালভৈরব' নাম ক'টি থেকে একটিকে বেছে নেবেন। ২৩শে শ্রাবণের এক চিঠিতে নাটকটির বিষয়ে গুরুদেব লিখছেন :

"গতকাল আমার লেখনী একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নাটকের জন্ম দিয়েছে··· বোধকরি দিন দশেকের বেশী সময় নেয় নি।···খুব জোরের সঙ্গেই বলব, নাটকটা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে।···আমার নতুন রচনা। রাজা ও রানীর রূপান্তরীকরণ। সেই নামই রইল, সেই রূপই রইল।···'সুমিত্রা' নামই ঠিক করেছি।"

বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসবের শেষে গুরুদেব খুব উৎসাহের সঙ্গে নতুন নাটকটির মহড়ায় মন দিলেন। নাটকের কোন চরিত্রে কে অভিনয় করবেন, তার জন্যে লোক নির্বাচনের কাজ শুরু হলো। ৩রা ভাদ্রের আর একটি চিঠিতে এরই আভাস দিয়ে বলেছেন :

"সুমিত্রা সংশোধন ও পরিমার্জন শেষ করে কাল পড়ে শোনালুম। লোকে ভালো বলবে বলা বাহুল্য। কিন্তু ধাঁ করে অভিনয় হতে পারবে এ আশা

করতে পারিনে। অজিন বিক্রমের পার্ট পারবে না। কে পারবে? লোক কোথায় পাব? এই তর্ক চলেছে।"

৭ই ভাদ্র আমার কাছে নাটকটির পাণ্ডুলিপির প্রথম অঙ্ক দিয়ে গুরুদেব বললেন, সবটা তাড়াতাড়ি কপি করে নিতে। অবিলম্বে অভিনয়ের জন্তে লোক নির্বাচন করে মহড়া শুরু করবেন। পাণ্ডুলিপিতে নাটকটির তখনকার মত নাম ছিল 'সুমিত্রা'। ৮ই ভাদ্র থেকে শুরু হয়ে গেল নিয়মিত মহড়া। কিন্তু 'সুমিত্রা'-র পার্টের জন্তে কাকে নির্বাচন করবেন, তা নিয়ে গুরুদেবকে বেশ ক'দিন বেগ পেতে হলো। 'সুমিত্রা'-র চরিত্রের জন্তে অধ্যাপিকা ও ছাত্রীদের কয়েকজনকে নিয়ে পরীক্ষা করলেন। অনেকেই অকৃতকার্য হলেন। ইতিমধ্যে 'সুমিত্রা' নামটির পরিবর্তন করে নাম দিলেন 'তপতী'। প্রধান চরিত্রে কে কোনটির অভিনয় করবেন তা একরকম স্থির হয়ে গেল ২১শে ভাদ্রের পূর্বেই। গুরুদেব নিজে গ্রহণ করলেন মহারাজ বিক্রমের পার্ট আর দিনেন্দ্রনাথ দেবদত্তর পার্টে অভিনয় করবেন বলে স্থির হলো। শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর—সুমিত্রা, শ্রীঅজিন ঠাকুর—নরেশ এবং বিপাশা হলেন শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্তী। জনতা ও নারীচরিত্রের কিছু নির্বাচন তখনো বাকি রইল।

৭ই ভাদ্র যখন গুরুদেবের হাতে-লেখা 'সুমিত্রা' নামে নাটকের প্রথম অঙ্কের পাণ্ডুলিপিটি আসে, তখন তার আরম্ভটি ছিল এইরূপ :—

সুমিত্রা

প্রথম অঙ্ক।

দেবদত্ত ও বিক্রম।

দেবদত্ত।

মহারাজ, অনঙ্গদেবের পূজা! এই রুদ্রভৈরবদেবের পূজার উদ্যানে!

বিক্রম।

হাঁ—নাগকেশরতলায় বেদী প্রস্তুত।

দেবদত্ত।

সাহস তো কম নয়। পঞ্চশর দগ্ধ হয়েছেন যাঁর তপোবলে তাঁরই পূজার বনে!

বিক্রম।

কন্দর্প সেবার এসেছিলেন অপরাধীর মতন লুকিয়ে—এবার তাঁকে ডাকচি প্রকাশ্যে, আসবেন দেবতার যোগ্য অসঙ্কোচে—মাথা তুলে, ধ্বজা উড়িয়ে।

দেবদত্ত।

মহারাজ, আদিকাল থেকেই ঐ দুই দেবতার মধ্যে বিরোধ।

বিক্রম।

ক্ষতি তাতে মানুষেরই। এক দেবতা আর এক দেবতার প্রসাদ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করেন।

দেবদত্ত।

অনঙ্গদেব যে ঘরকে তাঁর পায়ের ধূলি দিয়ে চিহ্নিত করে নেন, সে ঘরে অন্য কোন দেবতাকে প্রবেশ করতে দেন না। তাতেই পূজনীয়দের মনে ঈর্ষা জন্মায়।

বিক্রম।

মনে হচ্ছে কথাটা আমাকেই লক্ষ্য করে। সাহস বাড়চে।

দেবদত্ত।

রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব দুঃসাহসের চরম। ভাগ্যদোষেই রাজার বন্ধু দুর্মুখ। ইচ্ছাক্রমে নয়।

বিক্রম।

তবে মুখ খোলো। স্পষ্ট করেই বলো প্রজারা আমার নামে কি বলচে!

দেবদত্ত।

তারা বলচে, অন্তঃপুরের অবগুণ্ঠনতলে সমস্ত রাজ্যে আজ প্রদোষান্ধকার। রাজলক্ষ্মী রানীর ছায়ায় ম্লান।

বিক্রম।

দুর্মুখ, প্রজারঞ্জনে আর একবার সীতার নির্বাসন চাই নাকি?

দেবদত্ত।

নির্বাসন তো তুমিই দিতে চাও তাঁকে অন্তঃপুরে, প্রজারা তাঁকে চায় রাজ-সিংহাসনে। তাঁর হৃদয়ের সম্পূর্ণ অংশ তো তোমার নয়, এক অংশ প্রজাদের। শুধু কি তিনি রাজবধূ? তিনি যে লোকমাতা।

বিক্রম।

দেবদত্ত, অংশ বিভাগ নিয়েই যত বিরোধ। ঐ যে তিনি আসছেন, রাজবধূর অংশ নিয়ে, না লোকমাতার?

দেবদত্ত।

আমি তবে বিদায় হই মহারাজ। (প্রস্থান)

মহড়া নেবার সময়ে গুরুদেব এই নাটকের পাত্রপাত্রীর কথাবার্তার বহু পরিবর্তন করেছিলেন। অধিকাংশ স্থলে তাঁকে তা করতে হয়েছিল অভিনেতাদের কথা বলা বা তাঁদের অভিনয়ের ক্ষমতার কথা চিন্তা করে। মহড়ার প্রয়োজনে পরিবর্তিত নাটকটি বই আকারে তাড়াতাড়ি ছাপাবার জন্যে তিনি নির্দেশ দিলেন। শান্তিনিকেতনের প্রেসে ছাপার কাজও শুরু হয়ে গেল। ভাদ্র মাসের শেষ দিকে শেষ প্রুফের ক'টি কপি আনিয়ে প্রধান চরিত্রের অভিনেতাদের মধ্যে বিতরণ করলেন, আমাকেও একটি দিলেন। আমার দায়িত্ব ছিল প্রম্‌ট্‌ করার এবং গানের দলে গান করার। এ ছাড়া আরো একটি গুরু দায়িত্ব আমার উপরে গুরুদেব দিলেন। মাঝে মাঝে গুরুদেবের কাছে গিয়ে বিক্রমের পাঠ মুখস্থর কাজে তাঁকে সাহায্য করা। গুরুদেব বিক্রমের পার্ট বলে যেতেন, আমি অন্য চরিত্রের কথাগুলি পড়তাম।

তপতী নাটকে শেষ প্রুফ-কপির আরম্ভের অংশটি পাণ্ডুলিপি থেকে পরিবর্তিত হয়ে যা দাঁড়িয়েছিল, তা হলো :—

তপতী

১

জলন্ধরপতি বিক্রম ও সখা দেবদত্ত।

দেবদত্ত।

মহারাজ, অনঙ্গদেবের পূজা? এই রুদ্রভৈরবদেবের পূজার উদ্যানে?

বিক্রম।

হাঁ, নাগকেশর তলায় বেদী প্রস্তুত।

দেবদত্ত।

সাহস তো কম নয়। পঞ্চশর দগ্ধ হ'য়েচেন যাঁর তপোবলে, তাঁরি পূজার বনে?

বিক্রম।

কন্দর্প সেবার এসেছিলেন অপরাধীর মতো লুকিয়ে—এবার তাঁকে ডাকবো প্রকাশ্যে, আসবেন দেবতার যোগ্য নিঃসঙ্কোচে—মাথা তুলে, ধ্বজা উড়িয়ে।

দেবদত্ত।

মহারাজ, আদিকাল থেকেই ঐ দুই দেবতার মধ্যে বিরোধ।

বিক্রম।

ক্ষতি তাতে মানুষেরি। এক দেবতা আর এক দেবতার প্রসাদ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করেন। ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র মিলিয়ে চিরদিন তোমরা দেবপূজার

বকলা ক'রে এসেচো তাই দেবতার তোমরা কিছুই জানো না।

দেবদত্ত।

সে-কথা ঠিক, দেবতার সঙ্গে আমার পরিচয় পুঁথির থেকে। লোকের ভিড় ঠেলে মরি ; দক্ষিণা পাই, কিন্তু ওদের কাছে ঘেঁষবার সময় পাই নে।

বিক্রম।

আমার মীনকেতু অশাস্ত্রীয় ; অনুষ্টুভ ত্রিষ্টুভের বন্ধন মানে না। রুদ্র-ভৈরবের সঙ্গেই তাঁর অন্তরের মিল—পিনাক ছদ্মবেশ ধ'রেচে তাঁর পুষ্পধনুতে।

দেবদত্ত।

শুনে ভয় হয়। কিন্তু যা নিয়ে বিপদ ঘটে তা'র কারণ হচ্ছে অনঙ্গদেব যে-ঘরকে তাঁর পায়ের ধূলিলেপনে চিহ্নিত ক'রে নেন, সে-ঘরে অন্য কোনো দেবতাকে প্রবেশ ক'রতে দেন না। তাতেই পূজনীয়দের মনে ঈর্ষা জন্মায়।

বিক্রম।

মনে হচ্চে কথাটা আমাকেই লক্ষ্য ক'রে। সাহস বাড়চে।

দেবদত্ত।

রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব দুঃসাহসের চরম। ভাগ্যদোষেই রাজার বন্ধু দুর্মুখ। ইচ্ছাক্রমে নয়।

বিক্রম।

তবে মুখ খোলো। স্পষ্ট ক'রেই বলো প্রজারা আমার নামে কী ব'লচে।

দেবদত্ত।

তা'রা ব'লচে অন্তঃপুরের অবগুণ্ঠনতলে সমস্ত রাজ্য আজ প্রদোষান্ধকার। রাজলক্ষ্মী রাজ্ঞীর ছায়ায় ম্লান।

বিক্রম।

দুর্মুখ, প্রজারঞ্জনে আর একবার সীতার নির্বাসন চাই নাকি ?

দেবদত্ত।

নির্বাসন তো তুমিই দিতে চাও তাঁকে অন্তঃপুরে, প্রজারা তাঁকে চায় সর্বজনের রাজসিংহাসনে। তাঁর হৃদয়ের সম্পূর্ণ অংশ তো তোমার নয়, এক অংশ প্রজাদের। শুধু কি তিনি রাজবধূ ? তিনি যে লোকমাতা।

বিক্রম।

দেবদত্ত, অংশ বিভাগ নিয়েই যত বিরোধ। ঐ নিয়েই কুরুক্ষেত্র। ঐ তিনি আসচেন, রাজবধূর অংশ নিয়ে, না লোকমাতার ?

দেবদত্ত।

আমি তবে বিদায় হই, মহারাজ। (প্রস্থান)

কলিকাতায় অভিনয়ের কিছু আগে গুরুদেব বড় রকমের একটি পরিবর্তন করলেন নাটকের প্রথমেই—আরম্ভের দ্বিতীয় পাতায়। তপতীর প্রথম সংস্করণের ৫১ পৃষ্ঠা থেকে ৫৫ পৃষ্ঠায়, যেখানে রাজপুরাঙ্গনা কালিন্দীর সঙ্গে মহারাজ বিক্রমের বেশ খানিকটা কথাবার্তা আছে, সেখানে কালিন্দীর 'ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু' বাংলা শ্লোকটি আবৃত্তি করার কথা ছিল। কালিন্দী আবৃত্তিতে তেমন সুবিধা করতে পারছিল না দেখে, গুরুদেব তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী ঐ কথাবার্তার সবটাই বাদ দিলেন। কিন্তু 'ভস্ম অপমান শয্যা' শ্লোকটি তিনি রাখলেন নাটকের আরম্ভে—দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়—বিক্রম ও দেবদত্তর মধ্যে কথা প্রসঙ্গে। তপতীর প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায, মহারাজ বিক্রমের :

"আমার মীনকেতু অশাস্ত্রীয , অনুষ্টুভ ত্রিষ্টুভের বন্ধন মানে না। রুদ্র-ভৈরবের সঙ্গেই তাঁর অন্তরের মিল, পিনাক ছদ্মবেশ ধ'রেছে তাঁর পুষ্পধনুতে।" বাক্যটির শেষে খানিকটা নতুন অংশ যুক্ত হলো। যেমন—

দেবদত্ত।

এই দেবতাটিকে ভালো বুঝিনে মহারাজ, কিন্তু বেশভূষায় ভৈরবের সঙ্গে ওঁর যথেষ্ট মিল তো দেখিনে।

বিক্রম।

তার কারণ, রতি একদিন ওঁকে সাজিয়েছিলেন, উনি রমণীর লালিত, নারীর লালিত্যে আচ্ছন্ন আবিষ্ট, তাই তো সুরসভায় উনি লজ্জিত। রুদ্রের পৌরুষের আগুন তাই তো ওঁকে দগ্ধ করেছিল।

দেবদত্ত।

সেই ইতিহাস তো চুকে গেছে, আবার সেই পোড়া দেবতাকে নিয়ে কেন এই উপসর্গ? পুনর্বার ওঁকে পোড়াতে হবে নাকি?

বিক্রম।

না, তাঁকে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে নূতন প্রাণে বাঁচতে হবে। আজ আমার উৎসবের অর্থই তাই। বীরের শক্তি চাই তাঁকে বাঁচিযে তুলতে। তোমাদের ভৈরবের স্তব সম্পূর্ণ হবে না আমার মীনকেতুর স্তব যদি তার সঙ্গে যোগ করে না দিই।

ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্র অগ্নি হ'তে লহো জলদর্চি তনু !
যাহা মরণীয় যাক্ ম'রে,
জাগো চির-স্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধ'রে ।
যাহা স্থূল, যাহা ক্লান্ত তব,
অঙ্গ সাথে দগ্ধ হোক্, হও নিত্য-নব !
মৃত্যু হ'তে জাগো, পুষ্পধনু
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু ॥

বন্ধু তব দৈত্যজয়ী দেব বজ্রপাণি,
পুষ্পচ্ছলে তাঁরি অগ্নি দাও তুমি আনি' ।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
অন্তরে করুক্ ক্ষুব্ধ দুঃখের প্রবাহ ।
মিলনেরে করুক্ প্রখর,
বিচ্ছেদেরে ক'রে দিক্ দুঃসহ সুন্দর ।
মৃত্যু হ'তে ওঠো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু ॥

তিমির তোরণ রজনীর
স্পন্দিবে আহ্বানে মোর নির্ঘোষ-গম্ভীর ।
যাক্ দূরে দ্বিধা লজ্জা ত্রাস—
আয় বক্ষে সর্বনাশা প্রচণ্ড উল্লাস ।
মৃত্যু হ'তে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু ॥

মহড়া চলা কালেই উপরোক্ত বাংলা শ্লোক ক'টি সামান্য পরিবর্তনের পর দাঁড়ালো এই রূপে :—

ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্র বহ্নি হ'তে লহো জলদর্চি তনু !
যাহা মরণীয় যাক্ ম'রে,

জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধ'রে।
যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,
যাহা স্থূল দগ্ধ হোক্‌, হও নিত্য-নব।
মৃত্যু হ'তে জাগো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

মৃত্যুঞ্জয় যে মৃত্যুরে দিয়েছেন হানি,
অমৃত সে পাত্র হতে দাও তুমি আনি'।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
উন্মুক্ত করুক্‌ অগ্নি-উৎসের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক্‌ প্রখর,
বিচ্ছেদেরে ক'রে দিক্‌ দুঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হ'তে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

দুঃখ সুখে বেদনায় বন্ধুর যে পথ—
সে-দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ!
তিমির প্রাঙ্গণে, হে রাত্রির
যাত্রী; আনো অর্ঘ্যদীপ নৈশ আরতির।
উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জা ত্রাস—
আয় বন্যা আত্মহারা উদ্বেল উল্লাস।
মৃত্যু হ'তে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

কলকাতায় অভিনয়ের আগেও প্রথম সংস্করণের বহু কথা তিনি সম্পূর্ণ বাদ দিলেন, কিছু নতুন কথাও জুড়লেন। এই সব পরিবর্তনের একটি তালিকা স্বতন্ত্রভাবে তুলে দিচ্ছি:—

—: প্রথম অঙ্ক :—

২ পৃষ্ঠায় — শংকর ও বিক্রমের নতুন কথা বসালেন

৯ পৃষ্ঠায় — বিক্রম ও সুমিত্রার কথা সামান্য বাদ দিলেন।

৩২ পৃষ্ঠা থেকে ৩৪ পৃষ্ঠা — রত্নেশ্বর ও দেবদত্তর কথা বাদ দিলেন।

৩৬ পৃষ্ঠায় — দেবদত্ত ও সুমিত্রার সামান্য কথা বাদ দিলেন।

৪৬ „ — বিপাশা ও নরেশের কথা বাদ দিলেন।

৫০ পৃষ্ঠা থেকে ৫১ পৃষ্ঠা — বিপাশা ও নরেশের কথা বাদ দিলেন।

৫২ পৃষ্ঠা থেকে ৫৫ পৃষ্ঠা — বিক্রম ও কালিন্দীর কথা বাদ দিলেন।

—: দ্বিতীয় অঙ্ক :—

৬৩ পৃষ্ঠায়—সুমিত্রা ও প্রতিহারীর কথা বাদ দিলেন।

৬৬ পৃষ্ঠা থেকে ৭৩ পৃষ্ঠা—নারায়ণী, দেবদত্ত, বিপাশা ও সুমিত্রার অনেক কথা বাদ দিলেন।

১১৩ পৃষ্ঠা থেকে ১১৭ পৃষ্ঠা—দেবদত্ত ও নারায়ণীর অনেক কথা বাদ দিলেন।

—: তৃতীয় অঙ্ক :—

১২০ পৃষ্ঠা থেকে ১২৮ পৃষ্ঠা—জনতার অনেকখানি কথা বাদ দিলেন এবং আরম্ভে সামান্য নতুন কথা জুড়লেন।

১৩৬ পৃষ্ঠা থেকে ১৩৭ পৃষ্ঠা—জনতা ও নরেশের খানিকটা কথা বাদ দিলেন।

১৫০ পৃষ্ঠা থেকে ১৫৪ পৃষ্ঠা—নরেশ, বিপাশা ও জনতার কথার সঙ্গে 'যমের দুয়ার খোলা পেয়ে' গানটি বাদ গেল।

১৫৬ পৃষ্ঠা থেকে ১৬০ পৃষ্ঠা—জনতা ও দেবদত্তর কথা বাদ দিলেন।

১৬৩ পৃষ্ঠা থেকে তৃতীয় অঙ্কের শেষে—বিক্রম, চর ও চন্দ্রসেনের কথা নতুন যুক্ত হলো।

—: চতুর্থ অঙ্ক :—

১৬৪ পৃষ্ঠা থেকে ১৬৫ পৃষ্ঠা—তীর্থযাত্রী ও ভার্গবের কথা বাদ দিলেন।

১৭২ পৃষ্ঠা থেকে ১৭৩ পৃষ্ঠা—নরেশ ও বিপাশার কথা বাদ দিলেন।

১৮২ পৃষ্ঠায়—দেবদত্ত, শংকর ও সুমিত্রার নতুন কথা বসালেন।

কলকাতায় অভিনয় আরম্ভ হবার সপ্তাহখানেক আগে, অর্থাৎ ২রা আশ্বিন তারিখে "সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ" গানটি রচিত হয়। রচনার পিছনের ঘটনাটি হলো :-

তপতী নাটকটি নতুন করে রচনা কালে বিপ্লবী যতীন দাস লাহোর জেলের কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারে মৃত্যুবরণের সংকল্পে প্রায় দু'মাস ধরে অনশন করছিলেন। তাঁর এই মরণপণ অনশনের সংবাদে দেশবাসীর মন তখন খুবই চঞ্চল। যতীন দাসকে বাঁচাবার জন্যে সকলেই অধীর। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাদের জেদ বজায় রেখে গেলেন। যতীন দাস তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে প্রাণত্যাগ করলেন। এই সংবাদ শান্তিনিকেতনে এল ২রা আশ্বিন। গুরুদেব থেকে শুরু করে সকলেই এ সংবাদে মর্মাহত। যতীন দাসের এই আত্মাহুতির বেদনায় গুরুদেব 'সর্ব খর্বতারে দহে' গানটি রচনা করেন এবং তপতী নাটকের উদ্বোধন সঙ্গীত হিসেবে গানটি রাখবেন বলে স্থির করলেন। তপতী পুস্তকাকারে ছাপা হয়ে যাবার পরের ঘটনা বলে গানটি প্রথম সংস্করণে স্থান পায়নি। কিন্তু অভিনয়ের সময়ে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রে ভৈরব মন্দিরের ভৈরবের উপাসক দলের গান হিসেবে এটিকে প্রথমেই রাখা হয়।

অভিনয়ের দ্বিতীয় রাত্রিতে তপতী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের বিপাশার 'দিনের পরে দিন যে গেল' গানটি বাদ গেল। পরিবর্তে গাওয়ালেন নতুন রচিত গান 'আমার অন্ধ প্রদীপ'। ক্রোড়পত্রে 'যমের দুয়ার খোলা পেয়ে' গানটি বইয়েতে থাকলেও অভিনয়ের সময় গানটি গাওয়া হয়নি। পরিবর্তে অন্য কোন গানও রাখেননি। তপতীর প্রথম সংস্করণে মোট এই ক'টি গান ছিল।

১। মন যে বলে চিনি চিনি।
২। আলোক-চোরা লুকিয়ে।
৩। জাগো হে রুদ্র জাগো।
৪। বকুল গন্ধে বন্যা এল।
৫। প্রলয় নাচন নাচলে যখন।
৬। দিনের পরে দিন যে গেল।
৭। তোমার আসন শূন্য আজি।
৮। যমের দুয়ার খোলা পেয়ে।
৯। জাগ' আলসশয়ন।
১০। শুভ্র নব শঙ্খ তব।

বিপাশার সব ক'টি গান নৃত্যভঙ্গীতে অভিনীত হয়, গানগুলি গেয়েছিলেন পিছন থেকে মেয়েরা।

তপতী অভিনীত হয় পর পর ১১ই, ১২ই, ১৩ই এবং ১৫ই আশ্বিন এবং যাঁরা যে চরিত্রে অভিনয় করেন তাঁরা হলেন :—

বিক্রম—জলন্ধরের রাজা—গুরুদেব।

সুমিত্রা—জলন্ধরের রাণী—শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর।

নরেশ—বিক্রমের বৈমাত্র ভাই—শ্রীঅজীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিপাশা—সুমিত্রার সখী—শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্তী (বর্তমানে সুমিতা বাহাদুর সিং)।

দেবদত্ত—রাজার সখা—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গৌরী —শ্রীমতী রমা মজুমদার (কর)।

কালিন্দী —শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

মঞ্জরী —শ্রীমতী চিত্রা ঠাকুর (বুজু)।

কুমারসেন—কাশ্মীরের যুবরাজ—শ্রীকালীমোহন ঘোষ।

চন্দ্রসেন—কুমারের পিতৃব্য—শ্রীনলীন মিত্র।

ত্রিবেদী—জলন্ধরের রাজপুরোহিত—শ্রীনিতাইবিনোদ গোস্বামী।

তরুণীগণ —শ্রীমতী রমা মজুমদার, শ্রীমতী চিত্রা ঠাকুর, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, শ্রীমতী অমিতা সেন (খুকু) এবং শ্রীমতী নীহারকণা।

ভার্গব—কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দিরের পুরোহিত—শ্রীকালীমোহন ঘোষ।

মন্ত্রী —শ্রীসত্যেন বিশী।

শঙ্কর —শ্রীকণক ঠাকুর।

সেনাপতি —শ্রীনীতেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (নিতু)।

শিখরিণী —শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

কুঞ্জলাল ও রত্নেশ্বর —শ্রীঅনাথনাথ বসু।

দ্বারী —শ্রীআর্য্যনায়কম, শ্রীবিনায়ক মাসোজী।

তীর্থযাত্রী ব্রাহ্মণ —শ্রীসত্যেন বিশী।

দূত —শ্রীবিনায়ক মাসোজী, শ্রীসাগরময় ঘোষ।

জনতা —শ্রীসাগরময় ঘোষ, শ্রীঅনাথনাথ বসু, শ্রীসন্তোষ মিত্র, শ্রীসচ্চিদানন্দ রায় (আলু), শ্রীনিশিকান্ত রায়চৌধুরী (পণ্ডিচারী), শ্রীদেবেন ঘোষাল, শ্রীবনবিহারী ঘোষ, শ্রীককো ঠাকুর, শ্রীনিতাইবিনোদ গোস্বামী।

গানের দল —শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীসুধীরচন্দ্র কর, শ্রীসাগরময় ঘোষ, শ্রীবনবিহারী ঘোষ, শ্রীমণি রায়চৌধুরী, শ্রীদেবেন ঘোষাল, শ্রীমতী রমা মজুমদার (কর), শ্রীমতী অমিতা সেন (খুকু), শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, শ্রীমতী চিত্রা ঠাকুর (বুজু), শ্রীমতী নীহারকণা, শ্রীমতী সাবিত্রী কৃষ্ণান।

তপতী নাটকের অভিনয়ের দু-একটি ঘটনা বিশেষভাবে যা মনে পড়ে তা আজ বলি।—

শান্তিনিকেতন থেকে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকের বিরাট দল কলকাতায় পৌছলেন অভিনয়ের কয়েকদিন আগে। মহড়া চলছে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিয়মিত। অভিনয়ের দু-একদিন আগে গুরুদেবের কাছে বিশেষ অনুরোধ এল, নাটকেব ত্রিবেদীর চরিত্রটি শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথকে দিয়ে অভিনয় করাবার জন্য। এর জন্যে তৈরী হয়ে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীনিতাইবিনোদ গোস্বামী। অভিনয় আরম্ভের দিন দুই আগে এধরনের বদলের ইচ্ছা গুরুদেবের একেবারেই ছিল না, কিন্তু প্রস্তাবকদের একান্ত আগ্রহে তিনি অবনীন্দ্রনাথকে ডেকে নাটকে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। সময় অল্প জেনেও অবনীন্দ্রনাথ গুরুদেবের ইচ্ছাকে অবহেলা করতে পারেননি। মুখস্থ করার জন্যে অবনীন্দ্রনাথ আমার কাছ থেকে স্টেজ্ কপিটি নিয়ে নিজের হাতে ত্রিবেদীর কথাগুলি কাগজে লিখে নিলেন, কিন্তু ভাল করে মুখস্থ না কবতে পারায় মহড়ার সময় তিনি তেমন সহজে এবং সাহসের সঙ্গে অভিনয় করতে পারছিলেন না বলে শ্রীনিতাইবিনোদ গোস্বামীই ত্রিবেদী রয়ে গেলেন।

আমার দায়িত্ব ছিল প্রধানত গুরুদেবকে অভিনয়ের সময় প্রম্‌ট করায়, আর গানের সময় গান গাইতে হতো গানের দলের সঙ্গে। অভিনয়ের সময় গুরুদেব মঞ্চের দক্ষিণে বা বাঁয়ে গিয়ে যখন তাঁর কথাগুলি বলতেন, তখন তাঁরই কাছাকাছি উইংসের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি প্রম্‌ট্ করে যেতাম। এই কারণে আমাকে মঞ্চের এপাশ থেকে ওপাশে প্রায়ই দৌড়তে হতো। প্রথম রাত্রির অভিনয়ের সময় গুরুদেব আরম্ভে অনেকক্ষণ বেশ ভালভাবেই তাঁর কথা বলে গেলেন কিন্তু প্রথম দৃশ্যে নরেশ ও বিপাশা প্রথমবার মঞ্চে প্রবেশ করার পরে তাঁদের দেখে গুরুদেব যে কথা বলবেন, তা না বলে প্রায় দেড় পাতার মত কথা তিনি বাদ দিয়ে বলে গেলেন। এর উত্তরে নরেশ যে কি বলবেন তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না,

কিন্তু পিছন থেকে প্রম্‌ট্‌ কানে যাওয়া মাত্রই ভুলের বিষয়টি গুরুদেবের খেয়ালে আসে। তিনি তৎক্ষণাৎ নতুন কথা মুখে মুখে তৈরী করে বাদ পড়া অংশের আরম্ভে ফিরে এসে সেখান থেকে ঠিকমত সবটা বলে গেলেন। এর পরে বিনা বাধায় পর পর কথাবার্তা চললো। শেষ পর্যন্ত আর কোন গোলযোগ হয়নি।

তপতী নাটকের যাবতীয় সাজসজ্জার পুরো দায়িত্ব ছিল শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের উপর। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথও এবিষয়ে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় গুরুদেবের সাজের বিষয়ে যে বর্ণনাটি রেখে গেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করি। তিনি লিখছেন :—

"তপতী অভিনয় হবে—রবিকাকা সেজেছেন রাজা। সাজগোজ রবিকাকা বরাবর যতখানি পারেন নিজেই করতেন।

'তপতী'র ড্রেস রিহার্সেল হবে। সুরেন, রথী—ওরা বাক্সভর্তি রং-কালি এনেছে। রবিকাকা তা থেকে কয়েকটা কালো রং তুলে নিয়ে ঢুকলেন ড্রেসিংরুমে। নিজেই দাড়ি কালো করবেন।

রবিকাকা করেছেন কী, আচ্ছা করে গালের উপর কালো রং ঘুষেছেন—তাতে দাড়ি কালো হয়ে অতি বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার হলো দেখতে।

ড্রেস রিহার্সেল তো হলো। রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে ভাবছি, কী করা যায়। সকালে উঠে প্রতিমাকে বললুম, তোঁরা মেয়েরা যে অনেক সময়ে মাথায় কালো রঙের গজের কাপড় দিস—তাই গজখানেক আনা দেখি। ওই যে মেমসাহেবরা চুল আটকাবার জন্যে পরে। পাতলা, অনেকটা চুলেরই মতো দেখতে লাগে দূর থেকে। সেই কাপড় তো এল—আমি অভিনয়ের আগে রবিকাকাকে বললুম, তুমি আজ আর রং মেখো না দাড়িতে। আমি তোমার দাড়ি কালো করে দেবো। বলে সেই কাপড় বেশ করে কেটে দাড়িতে গেলাপের মত লাগিয়ে কানের দুপাশে বেঁধে দিলুম। গোঁফেও ঐরকম করে খানিকটা কাপড় লাগিয়ে মুখের কাছটায় কেটে দিলুম।

স্টেজ থেকে যা দেখাল, সবাই অবাক। বললে, চমৎকার কালো দাড়ি হয়েছে। রবিকাকারও আর কোন ঝঞ্চাট রইলো না—অভিনয়ের পরে কাপড় গেলাপটি খুলে ফেললেই হলো।

অভিনয়ের ঠিক আগেই 'তপতী' নাটকটির প্রথম সংস্করণ কিছুদিনের ব্যবধানে দু'বার দু'আকারে প্রকাশিত হয়, কেবল মলাটের পরিবর্তন এবং স্বরলিপির

অন্তর্ভুক্তির দ্বারা। প্রথম যেটি ছাপা হয়েছিল তার মলাটে ছিল 'তপতী' নামটি গুরুদেবের নিজের হাতে কালো কালিতে আঁকা নক্সাতে। ভিতরের তৃতীয় পৃষ্ঠায় ছিল প্রকাশক, মুদ্রক ও প্রেসের নাম এবং ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসের তারিখ। মূল্য দেওয়া ছিল দেড় টাকা। চতুর্থ পৃষ্ঠায় নাটকের পাত্রপাত্রীর তালিকা। পরে ভূমিকা। ভূমিকার শেষে ছিল ১৯শে ভাদ্র, ১৩৩৬ তারিখ।

নাটকটি চারি অঙ্কের।

প্রথম অঙ্ক ছিল ১ পৃষ্ঠা থেকে ৬২ পৃষ্ঠা পযন্ত,

দ্বিতীয় অঙ্ক ছিল ৬৩ পৃঠা থেকে ১১৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত,

তৃতীয় অঙ্ক ছিল ১১৮ পৃষ্ঠা থেকে ১৬৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, এবং

চতুর্থ অঙ্ক ছিল ১৬৪ পৃষ্ঠা থেকে ১৮৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। তার পরে পরিশিষ্টে ছিল মন্ত্রের অনুবাদ, এক থেকে তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী।

'তপতীর' প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় বইটির মলাটে 'তপতী' ও 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নাম দুটি গুরুদেব কর্তৃক অঙ্কিত একটি রঙিন চিত্রে মুদ্রিত। পরের পৃষ্ঠা থেকে নাম, তারিখ, নাটকের পাত্রপাত্রী, ভূমিকা, মোট চারিটি অঙ্কের পৃষ্ঠা এবং পরিশিষ্টের মন্ত্র ও তার অনুবাদ সবই প্রথম বইটির মত। কেবল এইটিতে তপতীর গানগুলির স্বরলিপি প্রথম দেওয়া হয়েছিল শেষের দিকে, স্বতন্ত্র ৭ পৃষ্ঠা থেকে ৪২ পৃষ্ঠাতে। কিন্তু স্বরলিপিকারের নামের উল্লেখ ছিল না। স্বরলিপি করা গানগুলি হলো :—

১। মন যে বলে চিনি চিনি,

২। আলোক-চোরা লুকিয়ে এল,

৩। বকুল গন্ধে বন্যা এল,

৪। প্রলয় নাচন নাচলে যখন,

৫। জাগো হে রুদ্র জাগো,

৬। দিনের পরে দিন যে গেল,

৭। তোমার আসন শূন্য আজি,

৮। যমের দুয়ার খোলা পেয়ে,

৯। জাগ' আলসশয়ন,

১০। শুভ্র নব শঙ্খ তব।

কলকাতায় অভিনয়ের সময় দর্শকদের সুবিধার্থে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। যথা :—

॥ তপতী ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মূল্য চারি আনা।

প্রথম অভিনয় ১০ই আশ্বিন, ১৩৩৬

জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

প্রথম অঙ্ক—ভৈরব-মন্দির প্রাঙ্গণে ভৈরবের উপাসকদলের গান—

'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ'

—

জলন্ধররাজ বিক্রম। তাঁহার ব্রাহ্মণ বন্ধু দেবদত্ত। মহিষী সুমিত্রা। রাজার বৈমাত্র ভাই নরেশ ও রাণীর সহচরী বিপাশা। মন্ত্রী, প্রতিহারী, অভিযোগকারী, প্রজা ও রত্নেশ্বর। পুরাঙ্গনাগণ, কালিন্দী, গৌরী, মঞ্জরী। রাজপুরোহিত ত্রিবেদী।

গান

মন যে বলে চিনি চিনি

—

গান

আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ঐ

—

গান

জাগো হে রুদ্র জাগো

—

গান

বকুল গন্ধে বন্যা এল

—

গান

প্রলয়নাচন নাচলে যখন

—

দ্বিতীয় অঙ্ক—কাশ্মীর আখরোটবন

জনতা। কুমারসেন। নরেশ ও বিপাশা।

চন্দ্রসেন। দেবদত্ত।

গান

দিনের পরে দিন যে গেল

—

গান

তোমার আসন শূন্য আজি

—

গান

যমের দুয়ার খোলা পেয়ে

—

তৃতীয় অঙ্ক—কাশ্মীর—মার্তণ্ড মন্দির।

পুরোহিত ভার্গব। তীর্থযাত্রী। বিপাশা। সুমিত্রা। শিখরিণী।

কুঞ্জলাল। নরেশ। কুমার। দেবদত্ত। শঙ্কর। বিক্রম।

গান

জাগ' আলসশয়নবিলগ্ন

—

গান

শুভ্র নব শঙ্খ তব গগন ভরি'

—

নাটকে ব্যবহৃত শ্লোক ও বৈদিক মন্ত্রগুলি সন্নিবেশিত ছিল। ক্রোড়পত্রটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮। মলাটে ছিল শিল্পাচায নন্দলাল বসু কর্তৃক অগ্নিপরিবেষ্টিত একটি নারীর লিনোকাট নক্সা, লাল রং-এ মুদ্রিত।

১৯২৯ সালে 'রাজা ও রানী'-কে বদলে 'তপতী নাটকটি লেখার সময়, সে যুগের ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন গুরুদেবের মনকে যে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা পরিষ্কার বোঝা যায় নাটকের কয়েকটি অংশ থেকে। 'সর্ব খর্বতারে দহে' গানটি রচনার ইতিহাসে সে কথা আগেই বলেছি। এছাড়া প্রথম সংস্করণের ৩০ পৃষ্ঠা থেকে ৪৫ পৃষ্ঠায়—যেখানে রত্নেশ্বর, দেবদত্ত ও সুমিত্রার কথাবার্তা আছে, তাতেও তার পরিচয় সুস্পষ্ট।

'রাজা ও রানী' নাটকে রত্নেশ্বরের চরিত্রটি একেবারেই ছিল না। 'তপতী'-তে

এই ছবিটিকে কেন্দ্র করে প্রজাদের প্রতি বিদেশী শীলাদিত্যের অত্যাচারের যে চিত্রটি তিনি এঁকেছেন, সেটি সে-যুগের ইংরেজ শাসকেরই যে চিত্র তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই অত্যাচারকে রুখতে হলে জনসাধারণকে কী করতে হবে বা তাদের কী করা উচিত, রাণী সুমিত্রার মুখ দিয়ে গুরুদেব সে বিষয়ে যা বলিয়েছেন, তা গুরুদেবের রাজনৈতিক মতবাদেরই প্রতিধ্বনি। বিদেশীর অত্যাচাব প্রসঙ্গে দেবদত্তকে সুমিত্রা বলছেন:

"ঠাকুর, বাধা আছে তো আছে—কিন্তু তা'র সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ ক'র্‌চে কেন, ভীরু মন! বিধাতা যাদের অবজ্ঞা করেন তাদের দয়া করেন না তাও কি এরা জানে না? দ্বার ভেঙ্গে ফেলুক না! বিচার ভয়ে-ভয়ে চায় ব'লেই তো ওরা বিচার পায় না। রাজা যত বড়ো জোরের সঙ্গে ওদের কাছে কর দাবি করে, তত বড়ো জোরের সঙ্গেই ওদের বিচার চা'বার অধিকার। ধর্মের বিধান মানুষের অনুগ্রহের দান নয়।"

রবীন্দ্রনাথের গানে ঠুংরির প্রভাব

শতাধিক বর্ষ পূর্বে বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ হিন্দী গান, তার রাগরাগিণী ও তালের বিস্তারিত আলোচনামূলক বই প্রথম রচিত হয়। সেই থেকে এ পর্যন্ত অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। এই বইগুলি ভালো করে আলোচনা করলে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে বাংলা দেশে উচ্চাঙ্গ হিন্দীগানের রাগরাগিণী ও তালের প্রচলিত নিয়ম কি ছিল তা জানতে কোনো অসুবিধা হয় না। বেশ বোঝা যায় যে, সে যুগের সংগীতের সঙ্গে এ যুগের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গানে ঠুংরির প্রভাব নিয়ে আলোচনার আগে বাংলা দেশের ঊনবিংশ শতকের ঠুংরির গান বলতে কি বোঝাতো এবং বর্তমানে তার কি পরিবর্তন ঘটেছে, এইসব বইয়ের সাহায্যে তা না জানলে, তার সঠিক বিচার করা সহজ হবে না।

আগেকার দিনের ঠুংরিগানের বিষয়ে জানা যায় যে, ঠুংরি নামে একটি তাল তখন খুবই প্রচলিত ছিল ; এবং তখনকার দিনের সংগীতরসিকদের কাছে এই তালটি সুপরিচিত ছিল বলেই সব বইয়ে, ঠুংরি তালের আলোচনা যথাযথ স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের প্রামাণ্য সংগীতের বইগুলিতে সে যুগের ঠুংরির পরিচয় যা পাই তারই কিছু নমুনা এখানে প্রথম তুলে দিই।

রাধামোহন সেন, তাঁর ১২২৫ সালে মুদ্রিত, "সঙ্গীত তরঙ্গ" গ্রন্থে, ঠুংরিকে রাগিণী হিসেবে উল্লেখ কোরে লিখেছেন,—

"ঠুংরি রাগিণীর ধারা।

ঠুংরি নামে শ্যাম-কল্যাণের প্রমোদিনী।
জাতি-লক্ষণেতে সম্পূরণ বিধায়িনী॥
রূপের আধার দুই-বারোয়া বেহাগ।
গানের সময় নিশি কিম্বা দিবা-ভাগ॥"

এই গ্রন্থে গ্রন্থকার, নিজ রচিত ঠুংরি রাগিণী ও আড়া-তেতালার দুটি গান প্রকাশ করেছিলেন।

রামনিধি গুপ্তের (নিধুবাবু) "গীতরত্ন" গ্রন্থে (১২৪৪) ঠুংরি তালের গান পাওয়া যায়, কিন্তু ঠুংরি রাগিণীর কোন গান নেই। দাশরথি রায়ও তাঁর পাঁচালী গানে ঠুংরিকে কেবলমাত্র তাল হিসেবেই ব্যবহার করেছেন।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রাগকল্পদ্রুম' নামে বহুশত হিন্দী ও অন্যান্য গানের সংগ্রহ পুস্তকে নানা রাগরাগিণীযুক্ত ঠুংরি তালের বহু গান পাওয়া যায়; কিন্তু এই বইটিতে ঠুংরি গান বা ঠুংরি তালের উপপত্তিক কোনো বিশ্লেষণ নেই।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ঠুংরির পরিচয় প্রথম প্রকাশ করে বললেন—

"ঠুংরি অতি ক্ষুদ্র রাগে এবং ক্ষুদ্র তালে রচিত হইয়া থাকে, ইহার সুপারিপাট্য এমন মধুর যে, অতি শীঘ্রই লোকের চিত্ত হরণ করে।"

ঠুংরি তালের আলোচনা করতে গিয়ে বললেন—

"ঠুংরি চারিমাত্রার তাল, ইহাতে একটি তাল এবং একটি শূন্য থাকে। ঠেকা যথা—

+		°	
।	।	।	।
"ধাদ্ধা	গে দিন্	তা দ্ধা	গে ধিন্।"

দুই মাত্রার ভাগে মোট চারটি মাত্রার তাল রূপে দেখানো হয়েছে। প্রথম মাত্রার সম্ এবং তৃতীয় মাত্রায় ফাঁক। ক্ষেত্রমোহনবাবু আরো বললেন —"টপ্পা নানা প্রকার। তন্মধ্যে ঠুংরি, গজল, বেক্তা, রুবাই, সোহেলা, হোরি, জিগর ইত্যাদি অধিক প্রসিদ্ধ।" এই উদ্ধৃতি থেকে জানা যাচ্ছে যে, সে যুগে ঠুংরিকে টপ্পারই একটি শাখারূপে মনে হতো।

বাংলার প্রখ্যাত সংগীততত্ত্ববিদ্ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গীতিসূত্রসার' গ্রন্থে ঠুংরি বিষয়ে বলছেন—

"যে সকল গান টপ্পার রাগিণীতে এবং আদ্ধা কাওয়ালী ও ঠুংরি তালে গীত হয় তাহাকে ঠুংরি গান কহে। কাপ্তান উইলিয়ার্ড সাহেব, ঠুংরি নামক পৃথক রাগ আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"হিন্দুস্থানে ঠুংরি নামে একজাতীয় গান প্রচলিত আছে; তাহা নানাবিধ রাগে গীত হইয়া থাকে। লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে ঠুংরি গানের অতিশয় আদর হয়,··· অনেকের বিশ্বাস যে, শোরী, ঠুংরি রাগের না হউক, ঠুংরি গান প্রণালীর উদ্ভাবক। ···এরূপ বিশ্বাস হয় যে, শোরীর টপ্পা আরো সংক্ষেপ করিয়া লওয়াতে, তাহা

হইতে ঠুংরি গানের উদ্ভব হইয়াছে। হিন্দুস্থানের তয়ফাওয়ালী গায়িকায়া ঠুংরি গান সর্বদা গাইয়া থাকে ; এই জন্য কলাবৎ ওস্তাদেরা ঠুংরি গানকে অতিশয় ঘৃণা করেন।···ঠুংরি গানের সুর পর্যালোচনা করিলে, ইহার দুইটি সৌন্দর্য দেখা যায় :—একটি গাইবার রীতি, অপরটি বিচিত্রতা।···ঠুংরি সুরে বিচিত্রতার তাৎপর্য এই যে, ইহার কলেবর যেরূপ সংক্ষেপ, তাহার তুলনায় ইহাতে বিচিত্রতা অধিক। সেই বিচিত্রতাকে চল্‌তি কথায় 'জংলা' বলে, অর্থাৎ এক গানের একই কলিতে দুই-তিন রাগের সংযোগ। এইরূপ আশ্চর্য কৌশলে ঐ যোগ সম্পাদিত হয় যে, তজ্জন্য উহা অসংগত শুনায় না।···সংগীতানভিজ্ঞ লোক, উহার কোন্ স্থানে কোন্ রাগ লাগিতেছে, তাহা কখনই বুঝিতে পারে না···।

"ঠুংরি গানের কয়েক প্রকার ভেদ আছে, যথা—খেমটা, কাহারবা, দাদরা ইত্যাদি। খেমটা, ভরওঙ্গা, কাহারবা প্রভৃতি তালে ঐসকল গান গীত হইয়া থাকে, তজ্জন্যই উহাদের ঐ প্রকার নাম হইয়াছে।"

যদিও ঠুংরি নামে কোন প্রকার রাগ বা রাগিণীর কথা এযুগে আমরা শুনি না, কিন্তু উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে কাপ্তান উইলিয়ার্ড সাহেব ঐ নামের একটি রাগের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং সে যুগের শেষার্ধের সংগীতগুণী দক্ষিণারঞ্জন সেন তাঁর একটি বইতে ঠুংরি রাগের একটি বাংলা গান সুর সমেত ছাপিয়েছিলেন। এই রাগের বিষয়ে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, "ঠুংরি একজাতীয় গীত। ইহাতে দুই বা ততোধিক রাগের সমাবেশ দেখা যায়। এই প্রকার গীতের রাগিণীকে ঠুংরি রাগিণী কহে। দক্ষিণাবাবুর প্রকাশিত গানটি হলো :—

ঠুংরি আদ্ধা।

৩ ০ ১ +
সা পা। মা পা া া। পা র্সা া ণধা। পা া া মা। গা া া া।
সা ধের প্রে মে ০ ০ ০ না ০ পূ রি ০ ০ ল সা ০ ০ ০

৩ ০ ১ +
। সা গা মা পা। মা া জ্ঞা জ্ঞা। সা া ঋা ণ্া। সা া া া।
০ ০ ০ ০ ধ ০ এ কি রে ০ ০ বি ষা ০ ০ ০

৩ ০ ১ +
। সা া মা পা। না া া না। র্সা র্সা া া। না া র্সা া।
দ ০ অ প রা ০ ০ ধী নি র ০ ০ ব ০ ধি ০

ঠুংরি তাল বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণধনবাবু লিখেছেন—

"এই তাল কাওয়ালীর প্রকারভেদ মাত্র, অর্থাৎ ইহাতেও চারিটি হ্রস্ব মাত্রা অন্তর প্রস্বন ও তালি পড়ে।...যে চতুর্মাত্রিক তালের গানের অক্ষর সকল বারংবার লঘু গুরু হয়, যাহাতে প্রত্যেক চারিমাত্রা অন্তরে স্বভাবত প্রবলরূপে প্রস্বন দিতে ইচ্ছা হয়...সেই ঠেকায় সমধিক প্রস্বন বিশিষ্ট যে বোল ব্যবহার হইয়াছে, তাহারই নাম ঠুংরি। উল্লিখিত কোনো ছন্দের ন্যায় গানের গতি হইলেই, তাহা ঠুংরি তালের অন্তর্গত;...ঠুংরিতে সকল প্রস্বনই বলবৎ হওয়াতে, মনে হয় যেন সম শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হইতেছে, এই-জন্য ঠুংরিতে এক তালির পরই, অর্থাৎ প্রত্যেক দ্বিতীয় তালিতেই সম হয়। অতএব দুই তালিতেই ইহার ঠেকার ছন্দ পূর্ণ হওয়াতে, ইহা কাওয়ালীর অর্ধ হইয়াছে...ঠেকা যথা:—

\+ ২

ধা ধা কেটে তাক্ । নে ধা কেটে তাক্

"ঐ প্রথম ধা-এর উপরই সম। এই তালের সকল স্থান হইতেই গানারম্ভ হইতে দেখা যায়। নিম্নলিখিত লক্ষ্ণৌ ঠুংরির উর্দু গানটির ছন্দ:—

\+ ২ + ২

দিল। খুঁ ০ শু দা। লগ্ ০ যো গ। যা ০ হৈ মে। রা ০

"যদি ঠুংরি গানের প্রত্যেক কলির প্রস্বন সংখ্যা ৪-এর বিভাজ্য হয়, তবে তিন তালি এক ফাঁক অনুসারে তাহাতে কাওয়ালীর ঠেকা দেওয়া যায়। ঠুংরি তালীয় অনেক গানের অস্থায়ীতে এরূপ দৃষ্ট হয় যে, সমের প্রস্বনকে প্রবল করণার্থ তাহার পূর্ববর্তী প্রস্বনের উপর কোনো বর্ণ থাকে না; যথা:—

২ + ২ +

। ০ ঘ ০ রে I রৈ ০ তে ০। ০ না ০ দি I লে ০ ০ ০।

২ + ২ +

হিন্দী। ০ কো ০ হি I ন ০ হি ০। ০ আ ০ প I না ০ ০ ০।"

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে বাংলাদেশে প্রচলিত দুটি ঠুংরি তালের উর্দু-গানের নমুনা পুরোনো বই থেকে স্বরলিপি সহ তুলে দিচ্ছি। প্রথমটি স্বয়ং নবাব ওয়াজিদ্ আলি শাহ্ কলকাতায় বন্দী থাকা কালে রচনা করেছিলেন বলে কথিত। দ্বিতীয়টি রচনা করেছিলেন 'সরসার' নামে লক্ষ্ণৌর একজন

খ্যাতনামা টপ্পা গায়ক। শোনা যায়, ইনি গান রচনায় 'শোরী' ও 'হমদম্'-এর ন্যায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

(১) খাম্বাজ-ঠুংরি।

যব ছোড় চলে লখ্‌নৌ নগরী,
কহুঁ হাল আদম্ পর ক্যা গুজরী॥
আদম্ গুজরী সদ্‌মা গুজরী,
যব হম্ গুজরে, দুনিয়া গুজরী॥

+ ২ + ২
রা গা I সা রা সা মা। গা া গা গা I মা া মা ধা। পা া মা গা I
য ব ছো ০ ড় চ লে ০ ল খ্ নৌ ০ ন গ রী ০ ক হুঁ

+ ২ + ২ ॥
I মা া পা পা। পা ধা র্সা ণা I ধা া পা মা। গা া রা গা I
হা ০ ল আ দ ম্ প র ক্যা ০ গু জ রী ০ "য ব"

+ ২ + ২
মা গা I মা া ধা ধা। ধা া ধা ধা I ণধা র্সা ণা ধা। পা া মা গা I
আ দ ম্ ০ গু জ রী ০ স দ্ মা ০ ০ ০ গু জ রী ০ য ব ॥

+ ২ + ২
I মা া পা পা। পা ধা র্সা ণা I ধা া পা মা। গা া রা গা I
হ ম্ গু জ রে ০ দু নি য়া ০ গু জ রী ০ "য ব"

(২) খাম্বাজ-ঠুংরি।

ভলা নিমক্ হরাম্‌নে মুলুক ডুবাযা
হজ্‌রত্ জাতে হৈঁ লণ্ডন কো।
মহল মহল মে বেগম রোয়েঁ
গলি গলি বোবেঁ পাতুরিয়া॥

+ ০ + ০
মা গা I মা ধা ধা ধা। ধা ণা র্সা া I ধা র্সা া ণা। ধা া পা া I
ভ লা নি ম কৃ হ বা ম্ নে ০ মু লু ক্ ডু বা ০ য়া ০

+ ০ + ০ ॥
I পা ধা মা পা। মা গা রা গা I মা া ণা া। ধা া মা গা I
হ জ্ র ত জা ০ তে হৈঁ ল ন্ ড ন্ কো ০ 'ভ লা'

+ o + o

া া I ঋা মা মা ধা। ধা ধা না া I র্সা া না া। র্সা া র্সা া I

০০ ম হ ল ম হ ল মে ০ বে ০ গ ম্ রো ০ য়েঁ ০

I ধা ধণা র্সা ণা। ধা পা মা গা I ঋা া ধা পা। ধা া ঋা গা I

I গ লি ০ গ লি রো ০ য়ে ০ পা ০ তু রি য়া ০ 'ভ লা'

প্রথম গানটিতে ঠুংরি মোট আট মাত্রার তাল। এ গানের স্বরলিপিকার প্রথম মাত্রায় সম ও পঞ্চম মাত্রায় ফাঁক না দিয়ে তালি দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় গানের স্বরলিপিকারও ঠুংরি তালকে মোট আট মাত্রার সমষ্টি বলেছেন বটে, কিন্তু তিনি প্রথম মাত্রায় সম ও পঞ্চম মাত্রায় খালি চিহ্নিত করেছেন।

'সচিত্র বিশ্বসংগীত' নামে একটি বইয়ের লেখক বলছেন—"ঠুংরি এক-প্রকার তালের নাম। যে সকল টপ্পা ঠুংরি তালে গীত হয়, তাহাদিগকে সচরাচর ঠুংরি বলা হয়। এতদ্ব্যতীত ঠুংরি আদ্ধাকাওয়ালীতে গীত হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানের তরফাওয়ালীরা এই গান গাহিয়া থাকে, এজন্য কলাবৎ ওস্তাদগণ ইহা পছন্দ করেন না। ঠুংরির এক বিচিত্র গুণ এই যে, ইহার এক কলিতে দুই-তিন রাগিণীর সংযোগ লক্ষিত হয়, সেই সংযোগকে 'জংলা' বলে।

"ঠুংরি চারিমাত্রার তাল। ইহাতে একটি তাল এবং একটি শূন্য থাকে। ঠেকা যথা :—

+		o	
।	।	।	।
ধা দ্ধা গে দিন		তা দ্ধা গে দিন।"	

এই বইটিতে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর মতানুসারেই আলোচনা করা হয়েছে বলে মনে হয়।

নানাপ্রকার সংগীত-গ্রন্থ প্রণেতা ও ভারতীয় ঐক্যতান সংগীতের প্রসিদ্ধ প্রচারক দক্ষিণাচরণ সেন ঠুংরি রাগের গান ও তাল নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা হলো—

"ইহা আটমাত্রার তাল, এবং চারিমাত্রাবিশিষ্ট দুইটি পদে বিভক্ত। ইহার অধিকাংশ স্থলে পদের প্রথমে একটি দীর্ঘ বর্ণ ও পরে দুইটি হ্রস্ববর্ণ থাকে। ঠুংরির ছন্দ অনেকটা কাব্পার ন্যায়, কিন্তু বিশেষ প্রভেদ এই যে, কাব্পার অনেক স্থলে কোনো কোনো সমের পদ হইতে প্রত্যেক চতুর্থ পদের শেষে একটি দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক বর্ণ থাকে। কিন্তু ঠুংরিতে এইরূপ

বিন্যাস প্রায় দেখা যায় না। ইহার সংগতের ঠেকা যথা—

+ । । । । ১ । । । ।

। ধা ধা কেটে তাক্ । নে ধা কেটে তাগ্ ।"

ঠেকাটি অবিকল গীতসূত্রসারের ন্যায়।

লক্ষ্ণৌ ঠুংরির অনুকরণে সে যুগে বাংলা ভাষায় যেভাবে গান রচিত হতো, এবারে তাব কিছু উদাহরণ তুলে দিই।

উনবিংশ শতকের সপ্তম দশকে হিন্দুমেলার প্রয়োজনে আগ্রা নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র রায় তাঁর বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'কত কাল পরে বল ভারত রে' গানটি খাম্বাজ রাগিণীতে ওয়াজিদ আলি শাহ্-এর 'যব ছোড় চলি লখ্‌নৌ নগরী' গানটির অনুকরণে, লক্ষ্ণৌঠুংরি তালে রচনা করেছিলেন। "সংগীত সূত্র" নামক একটি গ্রন্থ থেকে ঠুংরি তালে রচিত এই গানটির একটি স্বরলিপি উদ্ধৃত করছি।

"ঝিঁঝিট-খাম্বাজ (সম্পূর্ণ, নি)—ঠুংরি।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায় রচিত।

রা গা I I সা রা গা মা । গা মগা রা গা I মা া মা ধা । পা ধপা মা গা I

ক ত কা ০ ল প রে ০ ০ ব ল ভা ০ র ত রে ০ ০ দু খ

I মা া পা পা । পা ধা র্সা ণা I ধা ণধা পা মা । গা মগা মা গা I

সা ০ গ র সা ০ ত রি পা ০ ০ র হ বে ০ ০ অ ব

I মা পা মা ণা । ধা ণধা পা ধা I র্সা া ণা ধা । পা ধপা মা গা I

সা ০ দ হি মে ০০ ডু বি যে ০ ডু বি য়ে ০০ ও কি

I মা া পা পা । পা ধা র্সা ণা I ধা ণধা পা মা । গা মগা রা গা II"

শে ০ ষ নি বে ০ শ র সা ০০ ত ল রে ০০ "কত"

গানটির দক্ষিণাচরণ সেন কৃত স্বরলিপি হলো এই রকমের, যথা—

খাম্বাজ ঠুংরি

সা সা I রগমপা মপা মা মা । গা া গা গা I মা া পা মা । পমা

ক ত কা ০ ০ ০ ০ ল প রে ০ ব ল ভা ০ র ত রে

গারগা গা গা I মা া পা পা । পধা পধর্সা র্সা ণধা I পধাপা মপা

০ ০ ০ দুঃ খ সা ০ গ র সাঁ ০ ০ তা রি পা ০ ০ ০

মা মা । গা া সা সা I

র হ বে ০ 'ক ত'

উপরোক্ত গানের ছন্দ নিয়ে আলোচনা কালে ঠুংরি তাল সম্পর্কে নতুন যে একটি তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তা এখানে উল্লেখ করি।

সংস্কৃত ছন্দ শাস্ত্রে 'তোটক' নামে একটি ছন্দ আছে। বাংলা কাব্যে এই ছন্দটিকে ঊনবিংশ শতকের কবিরা অনেকেই ব্যবহার করেছেন। বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত 'তোটক' ছন্দটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এর প্রতি পংক্তির মোট মাত্রা সংখ্যা ১৬। এর দুই চরণ বা পংক্তিতে আছে মোট ২৪টি অক্ষর সমান ভাবে এবং প্রতি ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১ ও ২৪ সংখ্যার অক্ষরের বর্ণ গুরু, বাকিগুলির বর্ণ লঘু। অর্থাৎ প্রথম চরণ বা পংক্তির মোট ১২টি অক্ষরের প্রতি ৩, ৬, ৯ এবং ১২ অক্ষরের উপর একটি বিশেষ ঝোঁক দিয়ে কবিতাগুলি আবৃত্তি করতে হয়। ঊনবিংশ শতকের একটি বাংলা কবিতার পংক্তি বা চরণ নিয়ে কথাটি একটু পরিষ্কার করে বোঝাবার চেষ্টা করি। যেমন :—

'তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।
ভয় না কর না কর না কর লো।'

কবিতার এই পংক্তি দুটিকে 'তোটক' ছন্দের নিয়মে বিশ্লেষণ করলে এর মাত্রা ভাগ হবে :—

। । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥
তুহি পঙ্ক জিনী মুহি ভাস্কর লো।

অর্থাৎ, এই কবিতাটি আবৃত্তির সময়ে ছন্দের ঝোঁকগুলি পড়ছে ৩, ৬, ৯ এবং ১২ সংখ্যার 'প', 'নী', 'ভা' এবং 'লো' অক্ষর ক'টির উপর। 'তোটক' ছন্দে রচিত এইরূপ আরো কয়েকটি প্রাচীন বাংলা কবিতার পংক্তি উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত করছি।

। । । ।
১। রমণীমণি নাগর রাজ কবি।

। । । ।
রতি নাথ—বিনিন্দিত—চারুছবি।

। । । ।
২। শর নির্ণয় দুষ্কর কার্য্য হবে,

। । । ।
অতি অশ্রুত মর্ত্য অমর্ত্য সবে,

| | |

যদি রক্ষহ অঙ্গুরি আত্মসনে,

| | | |

লভিবে স্থির কুম্ভক শান্ত মনে।

| | | |

৩। অতিরোষ মনে রাজপুত সবে।

| | | |

যবনের হৃরে বল ঘোর রবে।

| | | |

নর রক্ত ছটা তরবার পরে।

| | | |

রবি রশ্মি ভার কত রাগ ধরে।

এই ক'টি কবিতার সঙ্গে কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের রচিত বিখ্যাত

| | | |

কতকাল পরে, বল ভারত রে,

| | | |

দুখ-সাগর সাঁতরি পার হবে?

খাম্বাজ-রাগিণী ও ঠুংরি তালের গানটির পংক্তি দুটি আবৃত্তি করলে দেখতে পাব যে, এটি একটি 'তোটক' ছন্দেরই বাংলা কবিতা। এর প্রতি পংক্তি ১২টি অক্ষরে সম্পূর্ণ এবং মোট ১৬টি মাত্রায় বিভক্ত। যেমন :—

| | ‖ | | ‖ | | ‖ | | ‖

ক ত কা ল প রে, ব ল ভা র ত রে,

| | ‖ | | ‖ | | ‖ | | ‖

দু খ সা গ র সাঁ ত রি পা র হ বে।

এই প্রসঙ্গে আমি নবাব ওয়াজিদ্ আলি শাহ্ রচিত "যব ছোড় চলে লখ্নৌ নগরী" গানটির অক্ষরগুলির মাথায় মাত্রা চিহ্নের দ্বারা ছন্দটির স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা করছি।

| | ‖ | | ‖ | | ‖ | | ‖

য ব ছো ড় চ লে ল খ্ নৌ ন গ রী

| | ‖ | | ‖ ‖ | | ‖ | | ‖

ক হ হা ল আ দ ম্ প র ক্যা গু জ রী।

উর্দু ভাষার এই গানটির প্রতি পংক্তি মোট ১৬ মাত্রায় সম্পূর্ণ। আবৃত্তি

কালে বাংলা কবিতার মত ছন্দের ঝোঁক আপনা থেকেই এতে এসে যায়। 'কত কাল পরে, বল ভারত রে' এবং 'যব ছোড় চলে লখ্‌নৌ নগরী' গান দুটির লক্ষণীয় বিশেষ দিক হচ্ছে যে, এর কথাগুলিকে যেরূপ ছন্দের ঝোঁকে গাইতে হয় তা হুবহু কবিতার ছন্দের অনুরূপ। এতে মনে হয়, এই ছন্দটির জন্যেই উত্তর ভারতীয় সংগীতে ঠুংরি তালের উৎপত্তি হয়েছিল। সংস্কৃত 'তোটক' ছন্দটি বোধ হয় হিন্দীগানে ঠুংরি তালে পরিণত হয়েছে। আরো মনে হয় যে, 'তোটক' ছন্দের গানে ঠুংরি তালের ব্যবহার উত্তর ভারতে বহু যুগ থেকেই চলে আসছে।

"তবলা শিক্ষা" নামক একটি গ্রন্থে, গত যুগে প্রচলিত ঠুংরি তালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ চারটি ঠেকার বোলের উল্লেখ আছে। গ্রন্থকার, ঠেকা ক'টি, সে যুগের চারজন খ্যাতনামা তবলচির কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তালের পরিচিতিতে গ্রন্থকার লিখেছেন ;—"ঠুংরি চারিমাত্রার তাল ; তন্মধ্যে তিনটি তাল ও একটি শূন্য।" ঠেকা ক'টি এইরূপ :—

```
        +       ১      ০      ১
        |       |      |      |
১।  ধা ধা   গেদেন্   তাধা   গেধেন।—ঠেকা—হোসেন বক্স।

        +       ১          ০       ১
        |       |          |       |
২।  ধেৎ   ধাগে   ত্রেকাট্   তা   ধা গে ধেন।—ঠেকা—আতা হোসেন।

        +       ১      ০      ১
        |       |      |      |
৩।  কাৎ   ধাগে   দেন্   ধা   ধাগে   ধেন।—ঠেকা—সালারি খাঁ।

        +       ১          ০       ১
        |       |          |       |
৪।  ধা ধেন্   ধা   ত্রেকাট   তা   ধেন্   ধা ত্রেকাট।—ঠেকা—আম্বালি খাঁ।
```

"সংগীত সূত্র" গ্রন্থে ঠুংরি তালের গত যুগের প্রচলিত আর একপ্রকার ঠেকার উল্লেখ যা আছে, তা হল ;—

"ঠুংরি দুই মাত্রার তাল। দ্বিগুণে চারিমাত্রা করা হইল। দুই ভাগের মধ্যে একটি আঘাত ও একটিতে ফাঁক আছে। ঠেকার বোল, যথা—

```
    +                   ০
    |         |         |           |
    ধাক্   থেনা   কেটে   ।   নাক্   ঘেনা   কেটে।"
```

বিংশ শতকের গোড়ার দিককার বাংলা সংগীতগ্রন্থেও ঠুংরি বিষয়ে আগের যুগের মতামতই পাই।

বিষ্ণুপুরের সংগীতগুরু রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ঠুংরি তালের বিষয়ে বলেছেন :—

"ঠুংরি আট মাত্রার তাল, ইহাতে একটি আঘাত ও একটি শূন্য। ঠেকা যথা :—

```
+                     ০
|    |    |    |      |    |    |    |
ধা   ধা   কেটে  তাগ্ । না   ধি   ধা   তেরে  কেটে।"
```

তাঁর বইতে তিনি মধ্যগতির ঠুংরি তালের একটি বাংলা গানের যে স্বরলিপি দিয়েছেন, তা হলো—

```
        +            ০            +            ০
রা গা I সা -রা সা মা । গা -া গা গা I মা -া মা ধা । পা -া মা গা I
স ম     রে ০ না চে     রে ০ কার      এ ০ র ম      ণী ০ না শি

  +            ০            +            ০
I মা -া পা পা । পা ধা র্সা ণা I ধা মপধা পা মা । গা -া"
  ছে ০ তিমি      রে ০ তি মি     র ০০০ ব র      ণী ০
```

'তোটক' ছন্দের বাংলা কবিতার অনুসরণে গানটি রচিত, এ ছাড়া সুর, ছন্দ ও তালের গঠনে এ গানটি ওয়াজিদ আলি শা-র ঠুংরি গানটির কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

রামপ্রসন্নবাবু ঠুংরি তালের স্বতন্ত্র একটি হিন্দী গানেরও স্বরলিপি করেছিলেন। যেমন :—

খাম্বাজ-ঠুংরি।

```
 +              ০              +              ০
I-া সা গা গা । মা মা পা-া  I গা মা পা পা । মপা ধধা পমা গগা I
 ০ বু ন্দ ন     ব র খে ০      ০ আ জু ঘ      ন০০০০০০০

 +              ০              +              ০
I-া মপা মা ধা । ধা ধা ধা ধা I ণা ধা না র্সা । ধর্সা ণধা পমা গগা I
 ০ চল ত প       ব ন ব ন       স ন ন ন        বো০ ০০লি০০
```

রামপ্রসন্নবাবুর রচিত মৃদঙ্গ ও তবলার তালের একটি স্বতন্ত্র বই আছে। তাতে তিনি মোট পাঁচ রকমের ঠুংরি তালের উল্লেখ করেছেন। তাল পরিচয়ে বলেছেন, "ইহা ৮টি হ্রস্ব মাত্রার তাল, ইহাতে একটি তাল ও একটি ফাঁক।

ঠেকা যথা :—

১। +　　　　o
| | | | | | |
। ধা ধা কেটে তাগ্। না ধি ধা তেরেকিটি।

২। +　　　　o
| | | | | | | |
। ধি ধা গি তা। না ধি কিটি তাক্।

৩। +　　　　o
| | | | | | | |
। ধা ধা ধা তিন। না ধি ধা তিন্।

৪। +　　　　o
| | | | | | | |
। ধাঃ দ্বা গি তা। না ধি ধা ত্রেকে।

৫। +　　　　o
| | | | | | | |
। ধা তি ধাগ্ ধি। না ধি ধ্ধা তি।"

ঠুংরি গান বিষয়ে রামপ্রসন্নবাবুর মত হলো—"ছেপকা, কাহরবা, ঠুংরি, কবালী প্রভৃতি তেতালারই অর্ধ, ...কবালী ও ঠুংরি এই দুইটি ছন্দও এক প্রকার। হিন্দুস্থানী 'তাল পদ্ধতি' নামক সংগীতগ্রন্থে দেখা যায় যে, কবাল জাতিরা উক্ত কবালী তাল ব্যবহার করে বলিয়া উহার নাম কবালী হইয়াছে, আবার ঐ তালই লখ্নৌএ ঠুংরি বলিয়া প্রচলিত; সুতরাং একই তাল দেশ ভেদে নাম ভেদ হইয়াছে মাত্র। এতদ্দেশে কেহ কেহ ঠুংরিকে তেতালার ন্যায় চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই।"

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সংগীত চন্দ্রিকা' গ্রন্থে বলেছেন, "টপ্পার রাগিণীতে, কবালী, আদ্ধা, ঠুংরি, খেমটা, কাহারবা ইত্যাদি তালে যে গান হয় তাহাকে ঠুংরি কহে।"

'বেহালা দর্পণ' পুস্তকে নবীনকৃষ্ণ হালদার ঠুংরি তালের ঠেকার উল্লেখ করে বলেছেন—"ঠুংরি চারি মাত্রা।

+　o　১　o
|　|　|　|
ধেন্দা　কিটী　নেন্ধা　কিটী।"

'গীত উপক্রমণিকা'-তে মণিলাল সেন শর্মা লিখেছেন—"লক্ষ্ণৌ নগরে ঠুমরি গানের সৃষ্টি হইয়াছে। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ প্রথমে ঠুমরি গানের সৃষ্টি করেন এবং সনদ ও কদর নামে দুইজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞও ইহাকে নানা ভাবে বিস্তৃত করেন। এই তিনজনই ঠুমরি গায়ক ও গীত রচয়িতা ছিলেন।··· দয়াসখী, কৃপাসখী প্রভৃতি কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ উৎকৃষ্ট ঠুমরি গান রচনা করিয়া সঙ্গীত জগতে যশস্বী হইয়াছেন।

"ঠুম্‌রি আটটি হ্রস্ব মাত্রার তাল। যে সব ছন্দে চারি মাত্রার পর পর স্বাভাবিক ঝোঁক আছে তাহা ঠুংরির অন্তর্গত। ঠুংরির এক-এক পদে চার মাত্রা। ইহার ফাঁক নাই, প্রথমেই সম্! ঠেকা :—

+				২			
ধা	ধিন্	ধা	ধিন্	তা	ধিন্	ধা	ধিন্।"

'সংগীত পরিক্রমা' বইটি পুরানো নয। কিন্তু এতে সংক্ষেপে প্রাচীন ও বর্তমান যুগের ঠুংরির কথা যা আছে, তা হলো—

"ঠুংরি শব্দটির কেউ কেউ অর্থ করেছেন চটুল ভাবাপন্ন গান। এই নামের একটি তালও আছে এবং সম্ভবতঃ প্রথমে ঠুংরি তালে গীত গানকেই ঠুংরি বলা হতো। যেমন, বর্তমানে দাদ্‌রা তালে গীত ঠুংরি শ্রেণীর এক রকম গানকে বলা হয 'দাদরা'।

"প্রধানতঃ টপ্পার তালেও খেয়াল-টপ্পার যুক্ত অলঙ্কারে ঠুংরি গান সমৃদ্ধ। মীড়, মূর্ছনা ও তাল ইত্যাদি অলঙ্কার এতে বহুল ভাবে ব্যবহৃত হলেও গমক ব্যবহার নেই বললেই হয়। কৃন্তন ও ছোট ছোট স্বরসমষ্টি একে বিশেষ শ্রুতি-সুখকর করে। এই গানে সুরের একটি নৃত্যশীল (লাস্য) ভঙ্গির বিশেষ প্রকাশ হয। ত্রিতাল, যৎ, আদ্ধা-কাওয়ালী, দাদ্‌রা, ঠুংরি, কাহর্বা ইত্যাদি তাল ঠুংরিতে ব্যবহৃত হয়।

"ঠুংরীতে রাগ-ব্যাকরণ যথাযথভাবে মেনে চলা হয না।···ঠুংরি গাইয়েরা রাগবহির্ভূত নানা স্বরসমষ্টি ব্যবহার করেন। ভৈরবী, পিলু, মাণ্ড, ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, দেশ, বেহাগ, কাফি, বিহারী, তিলক-কামোদ, গারা ইত্যাদি রাগ ঠুংরি গানের বিশেষ উপযুক্ত।

"ঠুংরি প্রধানতঃ দু'রকমের—ওস্তাদি বা ক্লাসিক্যাল ও বাইজী ঠুংরি। ওস্তাদি ঠুংরিতে বিলম্বিত তাল ও খেয়াল-টপ্পার অলঙ্কার (Embellishment) বেশী ব্যবহার হয়, অর্থাৎ ওস্তাদি ঠুংরিতে মার্গসঙ্গীতের প্রভাব বেশী। বাইজী ঠুংরিতে

দ্রুততাল ও ছোট ছোট কর্তবের ব্যবহার বেশী ও বাইজীরা অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে গানের ভাব (ভাঁও) প্রকাশ করে।

"নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্ ও লক্ষ্ণৌকে কেন্দ্র করেই ঠুংরি গান বেড়ে উঠেছে। কদরপিয়া, সনদ, কৃপাসখী প্রভৃতি গুণীরা ঠুংরির আদিযুগের দিক্‌পাল। পরবর্তী যুগে মৈজুদ্দিন, ভাইয়া সাহেব ইত্যাদি গুণীরা বহু ঠুংরি গানের প্রচলন করে গেছেন।"

সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সংগীত-জ্ঞান-প্রবেশ' গ্রন্থে বলেছেন—

"ঠুম্‌রী গান কেবল নৃত্যেই প্রচলিত ছিল। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদালী শা বাহাদুরের সঙ্গীতের দিকে সৌখীনতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার দরবারের বিখ্যাত গায়ক 'সনদ' ও 'কদর' এই দুইজন টপ্পা গানের রাগে হালকা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুরের কারুকার্যের বিন্যাসে প্রেমবিষয়ক সরল কথার দ্বারা এবং সহজ তালে নৃত্যের ভঙ্গীতে যে একবকম গান তৈয়ারী করেন, তাহাকে 'ঠুম্‌রী' নামে প্রচার করা হয়।"

"ঠুম্‌রী নামে যে একটি তাল আছে, তাহা আজকাল অনেক সঙ্গীতজ্ঞ অস্বীকার করেন।…আমাদের দেশে…তালের মধ্যেও 'ঠুম্‌রী' নামে একটি তাল বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।"

(ঠুম্‌রী) গান সৃষ্টির প্রথম অবস্থায়, এক নতুন প্রকার ছন্দের রচিত গানে একদিন নাচের সঙ্গে তবলার ঠেকা এমন সুন্দর ভাবাবেগে উত্থিত হইল, যাহা সেই দিন হইতে সেই সুন্দর ঠেকাটি ঠুম্‌রী গানের একটি পৃথক ভাবে বিশেষত্বপূর্ণ তাল হইয়া ঐ শ্রেণীর গানের নামে নামকরণ হইয়া 'ঠুম্‌রীতাল' নামে প্রচলিত হইল। ইহার ছন্দের গঠনে যে সমস্ত গান আছে, তাহার চতুর্মাত্রিক তালের কোনোটির সঙ্গেই খাপ খায় না।

ঠুম্‌রী তালের ব্যবহার কেবলমাত্র ঠুম্‌রী সুরের গানেই দেখা যায়। এই তাল আটমাত্রা-বিশিষ্ট। ইহাতে একটি সমের তাল ও একটি ফাঁক তাল, মাত্র দুইটি তাল আছে। তালের ভাগ চারি মাত্রা করিয়া। ইহার ছন্দ একটু আড় ধরনের :—বাজাইবার ঠেকা—

+				o			
।	।	।	।	।	।	।	।
ধাঁ	ধিঁ	গি	তা	না	ধি	ধা	তেরেকেটে

প্রকারান্তর

+ ০
। । । । । । । ।
। ধি গি তা । নাঁ তিঁ না তা।

‘সংগীতে অবিধান’ প্রণেতা অপূর্বকুমার চৌধুরী ঠুংরি তালের স্বতন্ত্র প্রকারের একটি ঠেকার কথা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—৮ মাত্রা, ৩ আঘাত, ১ শূন্য, ২য় তালে সম।

ঠেকা— ২ ৩ ০ ১
। । । । । । । ।
। ধা ধিন ধাধা ধিন্ । তা ধিন্ ধাতাক্ ধিন্।

‘নব সংগীত কল্পতক’ নামক একটি গ্রন্থেব ১৩৪০ সনের ৮ম সংস্করণে কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি ঠুংবি তালের একাপিক ঠেকার উল্লেখ কবে তাদেব দুই দলে ভাগ করেছেন। প্রথম দলের ঠেকাব বোল তিন তালি ও একটি ফাঁক।

+ ৩ ০ ১
। । । ।
(১) ধেধা কিটি নেধা কিটি।

+ ৩ ০ ১
। । । ।
(২) ধাদ্ধা ধাতেন তাদ্ধা ধাধেন।

দ্বিতীয় দলের ঠুংরি চারি মাত্রার তাল। দুই তাল ও দুই শূন্য। যথা :—

+ ০ + ০
। । । ।
(১) ধেধা কিটি, নেধা কিটি।

+ ০ + ০
। । । ।
(২) তাত্রাকি যুন, ধা যুন্না।

+ ০ + ০
। । । ।
(৩) ধাক্ ধিন, ধেধা গেদ্দিন্।

+ ০ + ০
। । । ।
(৪) ধাগে ধিন্ধিন্ ধাগে ধিন্ধিন্।

শ্রীসুবোধ নন্দী কৃত 'ভারতীয় সংগীতে তাল ও ছন্দ' গ্রন্থটিতে ঠুংরিকে বলা হয়েছে ৮ মাত্রার তাল। তালি এক, ফাঁক এক। ৪ মাত্রার ছন্দ। ঠেকা :—

+   ০

। ধা ধিন নাগে তেটে । ধা ঘুন নানা তেটে।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা ভাষার বইগুলি থেকে ঠুংরি বিষয়ে যা জানা গেল তা হচ্ছে :—

১। ঠুংরি ক্ষুদ্ররাগের ও ক্ষুদ্রতালের গান। সহজেই এ গান শ্রোতার মনোহরণ করে। টপ্পা গানেরই একটি সহজ শাখারূপে পরিচিত ছিল। এই নামের একটি আলাদা রাগিণীও পাওয়া যায়। যে সকল টপ্পা ঠুংরিতালে গীত হয় তাকে ঠুংরি গান বলা হতো। তরফাওয়ালিদের গান বলে ওস্তাদেরা এ গান এক সময়ে গাইতেন না, পছন্দও করতেন না। এ গানে একাধিক রাগের সমাবেশ বা মিশ্রণ দেখা যায়।

২। ঠুংরি ছিল একসময়ে একটি অতিপ্রচলিত তাল। মোট ৮ মাত্রার তাল এটি। দুই বা চার মাত্রার ভাগে বিভক্ত। একমতে, সম প্রথম মাত্রায় পড়ে আর পাঁচ মাত্রায় ফাঁক। দ্বিতীয় মতে, এই তালে ফাঁক নেই, পাঁচ মাত্রায় তালি। তৃতীয় মতে, এই তাল দুই মাত্রায় চারটি ভাগে বিভক্ত। সম সমেত তিনটি তালি ও একটি ফাঁক এতে আছে। চতুর্থ মতে, এটি মোট ৪ মাত্রার তাল। প্রথম মাত্রায় সম, তৃতীয় মাত্রায় ফাঁক। সমমাত্রার দ্রুত ছন্দের ঝোঁকটি এ তালের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ঠুংরির প্রভাব থেকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পরিবারও মুক্ত ছিলেন না। তাঁদের রচিত ঠুংরি গানের কথাগুলিকে আগেকার দিনের ঠুংরি তাল ও তার ছন্দের দিকে লক্ষ্য রেখে সাজানো হতো। গুরুদেবের অগ্রজরা ২ মাত্রা ভাগে মোট ৮ মাত্রার ঠুংরি তালকেই পছন্দ করতেন। এ ছন্দে সম সমেত তিন তালি ও এক ফাঁক বর্তমান।

গুরুদেবের প্রায় জন্মকালে, তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'কর তাঁর নাম গান' গানটি রচিত হয়, ঝিঁঝিট রাগিণীতে ও ঠুংরি তালে। মোট ৮ মাত্রার তালকে ২ মাত্রায় চারিটি ভাগে ভাগ করে এর স্বরলিপি করা হয়েছিল এই ভাবে :—

১   ২   ০   ৩   ১´   ২   ০   ৩

রা রা II গা পা | া পা | পা ধা | পা ধা I মা া । া া । া া । র্সা র্সা I

ক র   তাঁ ॰   ॰ র   না ॰   ॰ ম   গা ॰   ॰ ॰   ॰ ন্   ক র

এরই কাছাকাছি কোনো এক সময়ে গুরুদেবের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠুংরি তালে কয়েকটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। তারই একটি গানের তাল ও তার মাত্রা ভাগ পূর্ববর্তী গানটিরই অনুরূপ। যেমন :—

১ ২ ০ ৩ ১´ ২
সা II { ঋ পা | মা মা | মা মা | মপা মা I জ্ঞাঃ রঃ | জ্ঞা মা।
দ য়া ০ ঘ ন তো মা হে ০ ন কে ০ হি ত

০ ৩
জ্ঞামা জ্ঞঋ। (সা সা) } I
কা ০ ০ ০ রী, 'দ'

গুরুদেবের অপর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন উচ্চাঙ্গ সংগীত-শাস্ত্রবিদ্। ১২৯৮ সালে তিনি তাঁর একটি লেখাতে বলেছেন, "ঠুংরির প্রতিপদের মধ্যে নিয়মিত অন্তরে গুরুমাত্রা আসায় কাওয়ালি অপেক্ষা প্রস্বনাধিক্য হইয়া থাকে।" ১৩০৪ সালে প্রকাশিত 'স্বরলিপি গীতিমালা' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—"গানের কথার লঘু-গুরু-ভেদে ও ঝোঁক-ভেদে তাল-বিশেষের প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। এই সকল তালের মধ্যে কতকগুলি চতুর্মাত্রিক, যথা—কাওয়ালি, ঠুংরি, আড়াঠেকা ইত্যাদি।"

"কাওয়ালির ছন্দ ও লয় ভেদে, ঠুংরি, আড়ঠেকা প্রভৃতি উৎপন্ন। ঠুংরির সহিত কাওয়ালির প্রভেদ এই যে, ঠুংরির প্রতি তালি বিভাগের মধ্যে নিয়মিত অন্তরে গুরুমাত্রা আসায় কাওয়ালি অপেক্ষা ঝোঁকের আধিক্য হইয়া থাকে।" ঠুংরি যে দ্রুতলয়ের তাল একথাও তিনি জানিয়েছেন। 'স্বরলিপি গীতিমালা'য় প্রদত্ত ঠুংরি তালের ঠেকাটি এইরূপ :—

১´ ২
| ধা ধা কেটে তাক্ | নে ধা কেটে তাক্।

মনে হয় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই থেকে এই ঠেকাটি তিনি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'স্বরলিপি গীতিমালা'য় নিজের রচিত ঠুংরি তালের যে গানটির স্বরলিপি দিয়েছেন তার তালের মাত্রাভাগ প্রদত্ত ঠেকার সঙ্গে মেলে না। এ গানের স্বরলিপিতে তিনি তাঁর অগ্রজদেরই অনুসরণ করেছেন। গানটি হলো—

লুম্-ঝিঁঝিট্-ঠুংরি।

১ ২´ ৩ ০
II { ন্ধ্ াঃ ধ্ঃ | সরা সরা | গগা রসা | সগা রসা } I
কি ০ ক রি০ স্ব০ জনি ০ ০ সে০ বিনে

'স্বরলিপি গীতমালা'-য় গুরুদেবের 'এ কী আকুলতা ভুবনে' গানটি আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গানটিকে ঠুংরি তালের গানরূপে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু, ৪ মাত্রার তাল হলেও মোট ১৬ মাত্রার ত্রিতালের মত সাজানো হয়েছে কথাগুলিকে। সব সমেত তিন তালি ও এক ফাঁক। একে ঠুংরি তালের গান কেন বলেছেন তা জানি না। স্বরলিপিতে এইভাবে গানটি আছে :—

২´ ৩ ০
। া া ধা ধা I ধা ণধা পা মা । মপা া জ্ঞা া । মা জ্ঞা মা জ্ঞা ।
এ কি আ ০০ কু ল তা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১ ২ ৩ ০
। জ্ঞাণা া ধা া I া না না না । র্নসা া া া । া া র্সা র্সা ।
০ ০০০ ০০ ভু ব নে ০০০ ০০ এ কি

২২ বৎসর বয়সে গুরুদেবের রচিত গানের সংখ্যা মোট দাঁড়িয়েছিল প্রায় দুইশতের মত। এর মধ্যে ঠুংরি রাগিণীর গান একটিও নেই, কিন্তু ঠুংরি তালের গান কিছু আছে। তারই নমুনা হিসেবে একটি গান স্বরলিপি সমেত তুলে দিচ্ছি। গানটি হলো ধর্মসংগীতের অন্তর্গত 'বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি'। এই গানটি তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী' গানটির সুর ও তালের অনুকরণে রচিত। যেমন—

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২ ০
সা II {ঋ পা । মা মা । মা া । মপা মা I জ্ঞাঃ রঃ । জ্ঞা মা । জ্ঞধা
ব রি ০ ষ ধ রা ০ মা ঝে শা ন্ তি র বা ০

৩
জ্ঞঋ । (সা সা) } I
০ রি, 'ব'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে কাঙালীচরণ সেন কৃত 'ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি' গ্রন্থের মোট ৬ খণ্ডে (১৩১১ থেকে ১৩১৮) গুরুদেব রচিত ঠুংরি তালের আরো যে ক'টি স্বরলিপি পাই তা এই 'বরিষ ধরা মাঝে' গানটিরই অনুরূপ। সেখান থেকে উদাহরণ হিসেবে কয়েকটির স্বরলিপি দিচ্ছি।

ভৈরবী ঠুংরি

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২ ০ ৩
I তো মা । র প । তা ০ । কা ০ I যা রে । দা ও । তা ০ । রে ০ I

ঝিঁঝিট ঠুংরি

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২ ০ ৩
I শা ন্ । ত হ । য়ে ০ । ম ম I চি ০ । ত্ত নি । রা ০ । কু ল I

লুম-খাম্বাজ-ঠুংরি

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২ ০ ৩
আ জি I য ত । তা ॰ । রা ॰ । ত ব I আ ॰ । কা ॰ । শে ॰ । স বে I

কালাংড়া-ঠুংরি

১´ ২ ০ ৩ ১´ ২ ০ ৩
I ই ॰ । চ্ছা হ । বে ॰ । য বে I ল ই । স্রো ॰ ॰ । পা ॰ । রে ॰ I

আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গায়ক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গীতলিপি' নামে গুরুদেব রচিত ধর্মসংগীতের ৬ খণ্ড স্বরলিপি পুস্তক প্রকাশ করেন ১৯১০ থেকে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে। তাতে ঠুংরি তালে রচিত মোট ৮টি গান পাই। সুরেন্দ্রবাবু কিন্তু এইসব গানে তাঁদের পরিবারে প্রচলিত মত অনুসারে ঠুংরি তালের মাত্রা ভাগ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ প্রথম মাত্রায় সম ও পঞ্চম মাত্রায় খালি। কাঙালীচরণ সেনের মত দুই মাত্রা ভাগে স্বরলিপি করেননি। সুরেন্দ্রবাবুর স্বরলিপির নমুনা হলো—

খাম্বাজ-ঠুংরি

১´ ০ ১´ ০
II {গমা পধা র্ণর্সা ণা । ধা া ধা মা I মা ধা পধণা ণা । ণণা ধধা পাগা I
ব্যা॰ ॰ ॰ ॰প্ সা গ ॰ রে ॰ ডু ॰ ॰॰ব্ দি স্নে॰ ॰॰ ছি ॰

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন সংগীতাধ্যাপক, মহারাষ্ট্রবাসী, উচ্চাঙ্গ হিন্দী সংগীতের গায়ক পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী, দেবনাগরী অক্ষরে এবং ভাতখণ্ডে প্রবর্তিত স্বরলিপিতে গুরুদেবের 'গীতাঞ্জলি'র এবং অন্য আরো কয়েকটি গান সমেত ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে 'সংগীত গীতাঞ্জলি' নামে একটি স্বরলিপির বই প্রকাশ করেন। বইটিতে 'গীতলিপির'-র ঠুংরি তালের পাচটি গান আছে। ভীমরাও শাস্ত্রী কিন্তু গানগুলিকে ঠুংরি তালের বলে উল্লেখ করলেন না। পরিবর্তে তিনি বললেন 'ধুমালী' তাল। তালটির পরিচয় তিনি এইভাবে দিয়েছেন—

"ধুমালী মাত্রা ৮। ভাগ ২ মাত্রা মেঁ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
| ধি ধি | না ধিঁ | নক্ ধিঁ | নাগি তৃক্ ।

'ধুমালী' মহারাষ্ট্রদেশের থিয়েটার, তামাশা নাটক এবং মারাঠি কীর্তন গানের একটি প্রচলিত তাল। কিন্তু গুরুদেবের গানগুলির স্বরলিপির সময় এই ঠেকাটি ভীমরাও শাস্ত্রী গ্রহণ করলেন না। ৮ মাত্রাকে সমান দুই ভাগে ভাগ

করে, প্রথম মাত্রায় সম্ ও পঞ্চম মাত্রায় ফাঁক দেখালেন। যেমন—

"রাগ খম্বাজ ।। তাঃ ধুমালী ।। মধ্যলয় ।। মাত্রা ৮

১ ০ ১ ০

।। গমা পধা র্ণর্সা ণা I ধা । ধা মা I মা ধা পধণা ণা I ণণা ধধা পা গা I

রূ০ ০০০প্ সা গ ০ রে০ড়ু ০ ০ ০০ব্ দি য়ে০ ০০ ছি ০

ভীমরাও শাস্ত্রী যদিও ধুমালী তালের মাত্রা ভাগ ও ঠেকা স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়েছেন, কিন্তু গানের উপরে ধুমালী তালটির উল্লেখ সত্ত্বেও স্বরলিপির বেলায় তিনি যে সুরেন্দ্রনাথকে হুবহু অনুকরণ করেছেন তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এব থেকে মনে হয় যে, ঠুংরিকে তাল হিসেবে বোধ হয় সে-যুগের ভাতখণ্ডের অনুগামীরা স্বীকার করতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

ঠুংরি তালের এই আলোচনা থেকে তালের মাত্রা ভাগের যে নমুনা পাওয়া গেল তাকে নিম্নোক্ত মোট চারটি দলে সাজানো যেতে পারে। যেমন :—

+ ০
১। | ১ ২ ৩ ৪ | =মোট চার মাত্রাব তাল

+ ২
২। | ১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮ | =মোট ৮ মাত্রার তাল।

+ ০
৩। | ১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮ | =" " " "

+ ২ ০ ৩
৪। | ১ ২ | ৩ ৪ | ৫ ৬ | ৭ ৮ | =" " " "

গুরুদেব নিজে ঠুংরিকে যে তাল হিসেবেই জানতেন সে কথা স্পষ্ট জানা যায় তাঁরই একটি চিঠিতে। এই চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন বৃদ্ধ বয়সে শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবীকে, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ৯ই মে তারিখে। চিঠিতে বলেছেন—

"তুই আমার গান সম্বন্ধে লিখেছিস্ এতে আমার বলার কথা কিছু কি থাকৃতে পারে? ছোট্ট একটি কথা বলা চলে—যে-যে তালে আমি গান রচনা করচি তার তালিকা দেব, সেটা চেষ্টা করে দেখিস্ :—

রূপক, রূপকড়া, ঝাঁপতাল, ঝম্পক, একতালা, কাওয়ালি, ঠুংরি, আড়াঠেকা, দুই একটা চৌতাল—দাদরা, যত, কাশ্মীরী খেমটা, একাদশী, নবমী।"

এই তালিকাতে অতিপ্রচলিত সুরফাঁকতাল, আড়াচৌতাল, তেওড়াতাল ক'টির—যা তাঁর নিজের গানে বহুবার ব্যবহার করেছেন—নাম উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। এ ছাড়া, রবীন্দ্র-সংগীতে ব্যবহৃত আরো কয়েকটি নতুন তালেরও

উল্লেখ নেই। অথচ ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের যুগে যে-তালটির ব্যবহার গায়ক মহলে প্রায় উঠেই গিয়েছিল সেই ঠুংরি তালে রচিত নিজের গান রচনার কথা তিনি ভোলেননি। এই তালিকায় তার উল্লেখ সেদিক থেকে লক্ষ্য করার মত। এ থেকে অনায়াসেই বলা যেতে পাবে যে আগের যুগের গায়ক ও গান রচয়িতাদের মত ঠুংরি তালের সঙ্গে গুরুদেবের পরিচয় খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। এই পরিচয়ের একটি প্রত্যক্ষ নিদর্শন হলো ১৩০০ সালে 'চিরকুমার সভা' নাটকটির—

কত কাল রবে বল' ভাবত বে,
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে'—গানটি।

হিন্দুমেলার যুগে গোবিন্দচন্দ্র রায়েব খাম্বাজ রাগিণী ও ঠুংবি তালের জাতীয় সংগীতটিব হুবহু অনুকরণে গুরুদেব এ গানটি রচনা করেছিলেন।

গুরুদেবের গানে ঠুংরি তালের ব্যবহার সঠিক নির্ণয় করা সহজ হয়েছে, বিংশশতাব্দীব দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর সংগীতগ্রন্থ ও তাঁর গানের স্বরলিপিব সাহায্যে। এই বইগুলিতে সর্বদাই রাগ ও তালের উল্লেখ থাকতো। কিন্তু পরবর্তী যুগেব গানের স্বরলিপিতে এব উল্লেখ না থাকাতে কোন্‌টি ঠুংরি তালের গান তা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া, গুরুদেব যেসব গানে এই তালটি ব্যবহার করেছিলেন, যার উল্লেখ পুরাতন স্বরলিপির বইগুলিতে আমরা পাই, সেই বইগুলির এ-যুগের সংস্করণে ঐ সব গানের সঙ্গে জড়িত এই তালটির নাম সম্পূর্ণ তুলে দেওয়াতে বর্তমান গায়কদের পক্ষে এর খবর জানার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁরা ঠুংরি তালের গানগুলিকে কাহারবা তালের গান বলেই জেনেছেন। তাঁদের মনে ধারণা হয়েছে যে, ঠুংরি তালের গান গুরুদেব একেবারেই রচনা করেননি। যাই হোক, ঠুংরি তাল গুরুদেবের গানে আগেও ছিল এবং ভালো করে বিচার করে দেখলে দেখতে পাব যে, গুরুদেবের জীবনের শেষার্ধে রচিত এমন বহু গান আছে, যা এ-যুগে কাহারবা তালের গান রূপে পরিচিত হলেও সেগুলি আসলে ঠুংরি তালেরই গান।

১৩১৯ সালের পরবর্তী যে গানগুলিকে ঠুংরি তালের গান বলে মনে করি, তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে তুলে দিচ্ছি। এর দ্বারাই বোঝা যাবে যে, এই তালটির প্রতি গুরুদেবের আকর্ষণ ছিল বরাবরই। গান ক'টি হলো—

১। গানগুলি মোর শৈবালেরি দল।
২। ক্ষ্যা অকারণে চঞ্চল।
৩। কেন পান্থ এ চঞ্চলতা।

৪। শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান।

৫। এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে।

৬। ফাগুনের নবীন আনন্দে।

৭। ওরে চিত্ররেখাডোরে বাঁধিল কে।

৮। ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল।

এ-ক'টি গান প্রকৃতপক্ষে ঠুংরি তালের ন্যায় প্রতি চার মাত্রা অথবা দুই মাত্রা অন্তর ঝোঁক দিয়ে গাইবার গান। এর লয়ও দ্রুত। কয়েকটি গানের ছন্দের ঝোঁকের সঙ্গে প্রাচীন 'তোটক' ছন্দ এবং নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্ রচিত 'যব ছোড় চলি লখ্নৌ নগরী' গানটির মিল লক্ষণীয়।

গুরুদেবের এই গান ক'টিকে ঠুংরি তালের দুই রকমের ভাগে সাজালে তার গীতরূপের ও রসের কোনো পরিবর্তন হবে বলে মনে করি না। 'এসো নীপবনে' গানটিকে দু'রকমের ঠুংরি তালে সাজালে যা দাঁড়াবে, তা হলো :—

```
              +          ২
১।  এ সো I নী ০ প ব | নে ০ ০ ০ I

              +     ২      ০      ৩
২।  এ সো I নী ০ | প ব | নে ০ | ০ ০ I
```

১ নম্বর ভাগের প্রথম মাত্রায় সম এবং পঞ্চম মাত্রায় তালি। ২ নম্বর ভাগে, প্রথম মাত্রায় সম, তৃতীয় মাত্রায় তালি, পঞ্চম মাত্রায় ফাঁক এবং সপ্তম মাত্রায় তালির চিহ্ন আছে।

ঠুংরি বিংশশতকে উত্তর ভারতে ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পার মত ওস্তাদ মহলে গান হিসেবে সম্মানজনক স্থান পেয়েছে। এই কারণে ঠুংরিকে নিয়ে অবাঙালী গায়কেরা আলোচনাও করেছেন প্রচুর। তাঁরা এই গানের যে ইতিহাস রচনা করেছেন, এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির প্রোঃ জি. ডি. কারওয়াল-এর একটি লেখা থেকে তার পরিচয় আমরা পাব। তিনি লিখছেন—

"This (Thumri) like Tappa, also appeared in the nineteenth century. The word comes from Thumak—graceful stamp of foot. This indicates its connection with dance. It originated as an accompanying song of dance which made dance movements more understandable and impressive.

"Thumri is Bhao Sangit—bolpradhan—expressive of emotions contained in the Song texts. It was nurtured in the courts of the Nawab of Avadh, particulary, in the regime of Nawab Wajid Ali Shah. He was a dancer and singer of high repute,···He himself composed a number of Thumris,···The style found congenial centres in Banaras, Allahabad, Patna, in addition to Lucknow, its place of birth. It was developed to excellence by Bhaiya Ganapat Rao and Moizuddin Khan.

"Like Kheyal, Thumri is of two types—Badi Thumri and Chhoti Thumri and has two parts, Sthai and Antara. Badi Thumri is in line with Bada Kheyal and is sung in Vilambat laya ; and Chhoti Thumri follows in the footsteps of Chhota Kheyal and is sung in Drut laya. Or we might say that Thumri sung in jat or deepchandi theka is Badi Thumri and that done in tri-tal is Chhoti Thumri.

"The tans of both Kheyal and Tappa are also employed, though formerly they were not used.

"It is purely romantic and is suited to the singing of songs of Bhaktiras and Shrangar ras—devotional and erotic texts.

"Chhoti Thumri is either sung with dance or in Kheyal style, emphasising song texts but not bothering about bol banao and using more tanas.

"Badi Thumri is usually followed by dadra in actual performance. Dadra has generally a shorter poetic text than Thumri and is sung in dadra tala whence it derives its name. In its demonstration Hindi or Urdu couplets or quartrains are brought in for variety and extra charm.

It has the same relationship with Thumri and Dhammar has with Dhrupada, both, in general essentials, being the same."

উপরোক্ত এই আলোচনাটি থেকে লক্ষ্য করার মত বিষয় হলো এই যে, লেখক ঠুংরি তাল ও ঠুংরি রাগের বিষয়ে কিছুই বললেন না। যেন, ভারতীয় সংগীতে এ-দুটির চলন কোনো দিনই ছিল না। এ মতবাদ উত্তর ভারতের গবেষকদের মনে কেন স্থান পেয়েছিল তার কোন কারণ বোঝা যায় না।

বর্তমানে বাংলাদেশে ঠুংরি গানকে যে রূপে ও যেসব তালে আমরা গাইতে শুনি, গোয়ালিয়রের ভাইয়া সাহেবই হলেন এর প্রবর্তক। তিনি ছিলেন কবি, উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল গানের গায়ক ও বীণাবাদক। হারমোনিয়ামও বাজাতে পারতেন দক্ষতার সঙ্গে। কোনো কারণে গোয়ালিয়র ত্যাগ করে তিনি কিছুকাল লক্ষ্ণৌতে ঠুংরি গানের খ্যাতনামা শিল্পী সাদেক আলি খাঁর নিকট গান শেখেন। উনবিংশ শতকের শেষদিকে কিছুকাল পাটনায় ছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে কলকাতায় আনেন তাঁর ভক্ত শিষ্য শ্যামলাল ছেত্রী। কলিকাতাতে ভাইয়া সাহেব গণপত রাও-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন খ্যাতনামা ঠুংরি গায়ক মৈজুদ্দীন খাঁ এবং আরো অনেকে। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে গণপত রাও কলিকাতা ত্যাগ করে রামপুর নবাবের দরবারে যান। প্রকৃতপক্ষে, এ যুগে ঠুংরি গান যেভাবে বাংলাদেশে গাওয়া হয়, ভাইয়া সাহেব, গণপতরাও এবং মৈজুদ্দিন খাঁ তার প্রথম পথপ্রদর্শক।

বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত কলাবৎ, রাধিকা গোস্বামীর গুণী শিষ্য গিরিজা চক্রবর্তী, ভাইসাহেব ও মৈজুদ্দিনের কাছে নূতন ঢঙের ঠুংরি গান শিখে বাংলা দেশে ঠুংরি গানের শ্রেষ্ঠ গায়করূপে গণ্য হন। এ বিষয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ১৩৫৫ সালে প্রামাণ্য যে সংবাদটি প্রকাশ করেছিলেন, তা হলো—

"সে আজ পঁয়ত্রিশ বৎসরেরও আগের (ইং ১৯১২।১৩ ?) কথা।...এই সময় গণপত রাও ও মৈজুদ্দিন খাঁ এলেন। শ্যামলাল ক্ষেত্রীর বাড়ি, হারিসন রোডের উপর, দুনিচাঁদের বাগানে, ওভারটুন হলের উল্টো দিকে এঁদের আসর জমত। সেখানে আসতেন রাজাবাবু (বর্মণ), তিনুবাবু, দুনিবাবু গিরিজাবাবু, অমিয় সান্ন্যাল প্রভৃতিরা।

"এই কেন্দ্র থেকে আধুনিক লচাও ঠুংরি উৎপন্ন হয়। তার ভাববিকাশ, তান-কর্তন, তার মেজাজ লক্ষ্ণৌ ও বেনারসের পূরবী থেকে ভিন্ন। গহরজান,

মালকাজান কলকাতায় এবং লক্ষ্ণৌ-এ চৌধুরাণী ভগ্নীদ্বয় এই পদ্ধতি গ্রহণ করলেন।"

এই 'লচাও' ঠুংরি প্রবর্তনের যুগে গুরুদেব বয়সে প্রৌঢ়। তখন কলকাতার বাস উঠিয়ে দিয়ে তিনি বেশির ভাগ সময় থাকতেন শান্তিনিকেতনে। বিদেশ ভ্রমণেও তাঁর বহু সময় যেত। এই কারণে, তাঁর বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনে কলকাতায় সংগীতের যে পরিবেশ তিনি পেয়েছিলেন, সেরকমের সাংগীতিক পরিবেশ তাঁর এই জীবনে আর তিনি পাননি। তাই, গণপতরাও ও মৈজুদ্দিন প্রবর্তিত ঠুংরি অঙ্গের গান শেখা তো দূরের কথা, ভাল করে শোনবারও অবসর পেয়েছিলেন বলে জানা যায় না এই কারণে 'লচাও' ঠুংরির ছাপ তাঁর গানে আর পড়লো না। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের পর গুরুদেব লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের ঠুংরি ভাঙা 'সখি আঁধারে একেলা ঘরে', 'যাওয়া আসারই একি খেলা' এবং 'খেলার সাথী, বিদায়দ্বার খোল' গান ক'টিই মাত্র রচনা করেছিলেন। মূল গান পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্তা সাহানা দেবীর মুখে শুনে গুরুদেব নিজের মত বাংলা কথা বসিয়েছিলেন। এঁদের দুজনকে দিয়েই বাংলা গানগুলি তিনি প্রথম গাওয়ালেন শান্তিনিকেতনের উৎসবে বা কলকাতায় আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানে। বলা বাহুল্য, মূল গানগুলি শুনে তাঁর ভালো লেগেছিল বলেই বাংলা ভাষায় তাকে ধরে রাখতে উৎসাহিত হন। কিন্তু, তিনি নিজে কখনো তা গাননি। কারণ, মূল সুর যথাযথ ভাবে শিখে গাইবার অবসর সে বয়সে তাঁর আর ছিল না। তিনি তা অন্যের মুখে শুনেই খুশি ছিলেন। গানটি লক্ষ্ণৌ বা পশ্চিম ভারতীয় ঠুংরি অঙ্গের হলেও এ-যুগের তালে গানগুলি গাওয়া হলো না। গাওয়া হয়েছিল ভাঙাছন্দের গান হিসেবে।

গুরুদেবের গানে ঠুংরি গানের প্রভাব বলতে যা বোঝায়, তা হলো গত শতাব্দীতে ঐ তালের ছন্দে যে গানগুলি রচিত হতো বাংলাদেশে, তারই প্রভাব। এই তালের ছন্দেই তিনি বহু গান রচনা করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর ঢিমা লয়ের 'লচাও' ঠুংরি বা পঞ্জাবী ঠুংরি গুরুদেবকে প্রভাবিত করবার সুযোগ পায়নি।

রবীন্দ্রজীবনে গীতরচনার একটি অজ্ঞাত যুগ

ইংরাজি অক্ষরে "1889" সাল এবং "R. N. Tagore" নামাঙ্কিত একটি 'পকেট-বুক' পূজনীয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েক বছর পর বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের হাতে আসে শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদারের কাছ থেকে। এই ছোট খাতাটির প্রকৃত মালিক ছিলেন গুরুদেবের অন্যতম সুহৃদ্ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, যাঁর সহযোগিতায় গুরুদেব ১২৯২ সালে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী থেকে ১১০টি পদ নির্বাচন করে "পদরত্নাবলী" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীসমীর মজুমদার তাঁরই বংশধর। বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ থেকে এই খাতাটির প্রতিটি পাতার ফটো তুলে, খাতাটি শ্রীসমীর মজুমদারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বহু পাতার সমষ্টি এই খাতাটিতে গুরুদেবের হাতে লেখা প্রায় ৯৩টি গান, হিন্দী-ভাঙা বাংলা গান এবং ভাঙা গানের মূল হিন্দী গানগুলিও আছে। এ ছাড়া আছে, কয়েকটি স্কেচ পেনসিলে আঁকা। চলতি কথ্যভাষার বাংলা শব্দসংগ্রহ, শিশু উপযোগী কিছু নতুন তৈরি ছড়া, ভ্রমণবৃত্তান্ত, কেনাকাটার হিসেব এবং নানা অঞ্চলের জমিদারির কর্মচারীদের নাম ও বেতনের তালিকাও এতে আছে। এই খাতাটি গুরুদেবের প্রায় ১৪ বছরের বাস্তব কর্মজীবন, কাব্য-জীবন এবং সংগীতজীবনের বিচিত্র তথ্যের ভাণ্ডারবিশেষ। মলাটে '1889' সাল অঙ্কিত থাকলেও প্রকৃত পক্ষে বাংলা ১২৯৮ সাল থেকেই খাতাটিতে লেখার কাজ শুরু করেন। এর অধিকাংশ গান ও কবিতাতে রচনার তারিখ এবং কি অবস্থায় কোথায় বসে লিখেছিলেন তার উল্লেখ আছে। বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের কর্তৃপক্ষ এই খাতাটির সাহায্যে গুরুদেব রচিত বহু কবিতা ও গানের সঠিক তারিখের উল্লেখ বা তারিখ সংশোধনের সুযোগ পেয়েছিলেন। 'পকেট-বুক'টির প্রথম পরিচয় প্রকাশ করেন শ্রীকানাই সামন্ত, বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ফোটোর কপি দেখে—১৯৬০ সালে, তাঁর "রবীন্দ্রপ্রতিভা" গ্রন্থে।

শ্রীসমীর মজুমদার 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর হাতে পুনরায় ঐ 'পকেট বুক' নামাঙ্কিত ছোট খাতাটি দিয়েছিলেন। এবারেও পত্রিকার তরফ

থেকে খাতাটির প্রতিটি পাতার ফোটো তুলে রাখা হয়। এই ফোটোগুলি দেখে, আনন্দবাজার পত্রিকার সুপরিচিত সাংবাদিক শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী 'দেশ' পত্রিকার ১৩৭৭ সালের শারদীয় সংখ্যায় খাতাটির নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং বহু পাঠকের এই খাতাটির প্রতি দৃষ্টি পড়ে। খাতার গানগুলি নিয়ে অলোচনার জন্য সম্পাদক আমাকে অনুরোধ জানালে আমি উৎসাহের সঙ্গেই এ-কাজে সম্মত হই। কারণ, আমি জানতাম, এ-কাজে হাত দিয়ে আমি নিজে নানারূপ অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাবো।

খাতাটির মলাটের যেদিকে ইংরাজি অক্ষরে সাল ও নাম মুদ্রিত আছে, সেদিক থেকে ১২৯৮ সালের কোন এক সময়ে প্রথম লিখতে শুরু করেন। প্রায় একই সময়ে খাতার শেষ পাতাতেও যে লিখেছেন, তাও দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ, খাতার দু'দিক থেকেই আরম্ভ করেছিলেন লিখতে। ক্রমশ লেখাগুলি খাতার মাঝামাঝি মুখোমুখি এসে থেমেছে। খাতাটির মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় ২৬৯। বাঁ দিকের লেখা শেষ হয়েছে খাতার ১১০ পৃষ্ঠায়, আর শেষের ২৬৯ পৃষ্ঠার লেখা উল্টোপথে এসে ১১১ পৃষ্ঠায় থেমেছে। বাঁ দিকে লেখা আরম্ভ করেছিলেন একটি গান দিয়ে, আর ডান দিকে আরম্ভে আছে দু-পংক্তির একটি অসম্পূর্ণ কবিতা, তাও কাটা। বাঁ দিকের প্রথম গানটির অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। সম্পূর্ণ গানটি লিখে, সবটাই জানি না কেন কেটে দিয়েছিলেন! গানটি হলো : "শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা"।

খাতাটিতে লিখিত অধিকাংশ স্বরচিত গানের সন-তারিখ এবং স্থানের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু, হিন্দী-ভাঙা বাংলা গানের সঙ্গে এর কোনো উল্লেখ নেই। তারিখহীন গানগুলির রচনাকাল, রচনার উপলক্ষ এবং বাংলা ভাঙা গানের মূল হিন্দীগুলি কোন্ গুণী শিল্পীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, সব খবর পাওয়া যাচ্ছে পৃষ্ঠার পারম্পর্য এবং কতগুলি সমসাময়িক তথ্যের দ্বারা। গানগুলিকে সময়ানুযায়ী সাজিয়ে তালিকা করার পর ১২৯৮ থেকে ১৩০১ সাল পর্যন্ত প্রথম গুচ্ছে যে ক'টি গান পাচ্ছি তা হলো :—

১। শুধু যাওয়া আসা।

২। খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে।

১৯ আষাঢ়। ১৮৯২। সাজাদপুর।

৩। আমার মন মানে না দিনরজনী।

৪। তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন।

৫। ঝর ঝর বরষে।

৬। ফিরে এস ফিরে এস।

তালিকার প্রথম গানটি যে লিখে কেটে দিয়েছিলেন পূর্বেই তার উল্লেখ করেছি। গানটি ছিল এইরূপ :—

শুধু যাওয়া আসা
শুধু স্রোতে ভাষা
শুধু আলো আঁধারে
ক্ষণিক কাঁদা হাসা—
শুধু দেখা পাওয়া শুধু ছুঁয়ে যাওয়া
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া
শুধু নব দুরাশায় আগে চলে যায়
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা
হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয়
আধখানি কথা শেষ নাহি হয়—
লাজে ভয়ে ত্রাসে আধ বিশ্বাসে
শুধু আধখানি ভালবাসা
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙা বল,
প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙা ফল,
ভাঙ্গা তরী ধরে ভাসে পারাবারে
ভাব কেঁদে মরে ভাঙ্গা ভাষা।

কোনো তারিখ নেই গানটির সঙ্গে। বর্তমানে, এই গানের চারটি কলি পর পর যেভাবে আমরা গেয়ে থাকি, প্রথম খসড়ার সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। গানটিতে দাঁড়ি, কমা ইত্যাদির চিহ্ন চোখে পড়ে না।

গানটি প্রথম ছাপানো হয় 'সাধনা' পত্রিকায়, ১২৯৯ সালের বৈশাখ সংখ্যায়, স্বরলিপিসহ। মুদ্রিত গানের পাতায় বলা হয়েছিল এটি "নূতন গান"। 'সাধনা' পত্রিকায় সামান্য পরিবর্তনের পর গানটি যেভাবে মুদ্রিত হয়েছিল, তা হলো :—

(রাগিণী মিশ্র বেহাগ—তালফেরতা)

শুধু যাওয়া আসা ;
শুধু স্রোতে ভাসা ;
শুধু আলো আঁধারে ;
কাঁদা হাসা ;
শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া ;
শুধু নব দুরাশায় আগে চলে' যায়
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা।

অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙা বল,
প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙ্গা ফল ,
ভাঙ্গাতরী ধরে' ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে, ভাঙা ভাষা !

হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয়,
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে' আধ বিশ্বাসে
শুধু আধখানি ভালবাসা।

গানের মাথায় তালনির্দেশক "তালফেরতা" শব্দটি প্রয়োগ করে জানানো হলো যে, এটি একাধিক তালে রচিত। গানে প্রথম কলি, আস্থায়ী গাইতে হবে তিন মাত্রার একতালার ছন্দে। বাকি তিন কলির তাল হলো ৪ মাত্রার ত্রিতাল। "পকেট-বুক"-এর ৪র্থ কলি তৃতীয় কলিতে পরিণত হলো।

১২৯৯ সালের বৈশাখ সংখ্যার সাধনা পত্রিকায় এ গানটি "নূতন গান" হিসেবে প্রকাশিত হওয়ায় ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, গানটি ১২৯৮ সালের শেষ দিকে রচিত। ১৩০০ সালের 'গানের বহি' গ্রন্থে গানটির রাগিণী ও তালের পরিবর্তন করে বলা হয়েছিল "বেহাগ—একতালা" এবং তৃতীয় কলির 'প্রাণপণ' শব্দটিকে পরিবর্তন করে ছাপানো হলো 'প্রাণপণে'। ১৩০৪ সালের "বীণাবাদিনী" পত্রিকায় গানটির দ্বিতীয় স্বরলিপি যখন মুদ্রিত হয়, তখন 'সাধনা' পত্রিকাকেই অনুসরণ করে লেখা হলো এর রাগিণী "মিশ্র বেহাগ ও তালফেরতা"। ১৩১০ সালের

কাব্যগ্রন্থ এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থাবলীর গান খণ্ডে আছে 'বেহাগ—একতালা' রূপে। ১৩১৬ সালের ভাদ্র সংখ্যার 'সংগীতপ্রকাশিকা' পত্রিকায় এ গানটির যখন তৃতীয় স্বরলিপি প্রকাশিত হয়, তখন এর রাগিণীকে বলা হলো 'মিশ্র বেহাগ' এবং 'তালফেরতা' বা 'একতালা'-র বদলে গানটির সব ক'টি কলিকে চতুর্মাত্রিক কাওয়ালি তালে পরিবর্তন করা হয়েছে। এ-যুগে আমরা গানটিকে সেইভাবেই গেয়ে থাকি। তালফেরতা বা একতালা-তে এখন আর গাওয়া হয় না।

তিন নম্বরের "আমার মন মানে না দিনরজনী" গানটি যে কোন্ সময়ে রচিত তার কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু, খাতার পাতার ক্রম ধরে বিচার করে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য তথ্যের দ্বারা গানটি কোন্ সময় রচনা করেছিলেন, সে খবর হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

আমরা জানি, গুরুদেব ১৮৯১ এবং ১৮৯৩ সালে দু'বার উড়িষ্যায় গিয়েছিলেন তাঁদের জমিদারি তদারকি করতে। "ছিন্ন পত্রাবলী"-র ২৭ থেকে ৩০ নম্বরের চিঠি থেকে প্রথম বারের এবং ৭৭ থেকে ৮৮ নম্বরের চিঠি থেকে ১৮৯৩ সালের ভ্রমণের খবর আমরা সঠিকভাবে পাই। কিন্তু, আমাদের আলোচ্য 'পকেট-বুক'-এর ১৮ থেকে ৩০ পৃষ্ঠাতেও উড়িষ্যা ভ্রমণের নানারূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু, এই ভ্রমণের তারিখের কোনো উল্লেখ কোথাও নেই। খাতার অন্যান্য তারিখের সঙ্গে সাজিয়ে বিচারের দ্বারা অনুমান করি, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের কার্তিক মাসের শেষার্ধে আর একবার গুরুদেবকে হয়তো উড়িষ্যায় যেতে হয়েছিল। 'পকেট-বুকে' উড়িষ্যা ভ্রমণের খরচের হিসেব লেখা আছে। গুরুদেব নিজেই তা লিখে রেখেছিলেন। যাত্রাপথের বর্ণনাও আছে কয়েকটি পাতা জুড়ে। এবারের উড়িষ্যা ভ্রমণের অন্যত্র কোনো খবর নেই, কোথাও। কিন্তু, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই তারিখের একটি চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন যে, তাঁকে উড়িষ্যা যেতে হবে। চিঠিটি শিলাইদহ থেকে লিখছেন তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে। সে সময় মৃণালিনী দেবী ছিলেন পুত্রকন্যাসহ মহারাষ্ট্রের সোলাপুর শহরে, গুরুদেবের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। জুলাই মাসের শেষ দিকে মৃণালিনী দেবীর কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের খবর পেয়ে গুরুদেব তাঁকে লিখলেন :—

"যদি তোমরা ইতিমধ্যে ফিরে থাকো তা হলে ত এবার কলকাতায় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা হবে—চেষ্টা করব উড়িষ্যায় যদি আমার সঙ্গে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। সে যায়গাটা ভারি স্বাস্থ্যকর। আমি বাবামশায়কে আমার ইচ্ছে কতকটা জানিয়ে রেখেচি, তিনিও কতকটা বুঝেচেন—আর দুই একবার

বলে কিছু ফল হতেও পারে—কিন্তু আগে থাকতে বেশি আশা করে বসা কিছু না।"

এই চিঠিতে জানা যাচ্ছে যে, তিনি উড়িষ্যায় যাবার জন্য প্রস্তুত। হয়তো কোনো কারণে জুলাইয়ের শেষে যেতে পারেননি, মাস দু-এক দেরি হয়েছিল। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি বা নভেম্বরের প্রথম দিকে গিয়েছিলেন। কিন্তু মৃণালিনী দেবী শেষ পর্যন্ত গুরুদেবের সঙ্গে যাননি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুমতি ছাড়া আরো হয়তো কিছু কারণ ছিল।

"পকেট-বুক'এর ১৬ পৃষ্ঠার "যেতে নাহি দিব" কবিতাটি শেষ করেছেন ১৪ই কার্তিক, ১৮৯২ সালে, কলকাতায়। পরবর্তী ১৮ পৃষ্ঠা থেকে আছে উড়িষ্যা ভ্রমণের নানারূপ বিবরণ ও খরচের হিসেব। পর পর পাতা ধরে কিভাবে তা লিখেছিলেন, তা উদ্ধৃত করছি।—

১৮ পৃষ্ঠা

কটক

বলুর জুতো	—	৬।০
বকশিস	—	২৲
আমার জুতো	—	৫৸০
বরকন্দাজকে রেজেস্টি করিতে ফিতা ইত্যাদি কিনিতে	—	১৲
ডেস্ক	—	১৮৲
চৌকি মেরামত	—	১৲
চটি জুতো	—	১॥০
লক্	—	১॥০
পুরীতে স্নানের ধুতি একজোড়া	—	২৲
পুরী হইতে আসিবার সময় গোফুর	—	২৲
পানিওয়ালা	—	১৲
সর্দাইপুর রেজিস্ট্রি & C	—	১৲
ভুবনেশ্বর—পাণ্ডা & C	—	৭৲
কটকে মিস্ত্রি	—	৫৲
খণ্ডগিরি গাড়িটানা কুলি	—	১॥০

ডাকের টিকিট	— ১৲
বলু (গয়না)	— ১০৲
পাল্কী	— ২২৲
গাড়িভাড়া	— ১।০
বক্‌শিস (দুই চাকর)	— ৪৲
গোফুর	— ২৲

১৯ পৃষ্ঠা।

তালুক পাণ্ডুয়ার সদর খাজনা
২৮ এপ্রিলের দেয় খাজনা

কাঠযুড়ি। ধূসর বালুকার প্রান্তে স্বচ্ছ স্রোত। উচ্চপথ, দুই ধারে নিম্ন ক্ষেত্র। মুকুলিত আম্র। বট অশ্বত্থ। খেজুর, নারিকেল, বালুহস্তা, ভার্গবী। সর্দাইপুর। পথে দূরে ভুবনেশ্বর, ধাউলি inscription। পাহাড়—উপরে ভগ্নমন্দির। কেয়াগাছের বেড়া, মেঘদূত, নগনদী। সন্ধ্যার সময় বেড়ানো—দীর্ঘ পরিষ্কার ছায়াময় রাজপথ—দুই-একটা covered carts। যাত্রীর অভাব। রাত্রে মুকুন্দপুর যাত্রা—নিদ্রাতুর। প্রাতে সত্যবাদী যাত্রা। পথে ক্রমে যাত্রীর আধিক্য। সারী ২ গাড়ি। সত্যবাদী। বলুরা গেল। ভোগ উপহার। পুনর্বার যাত্রা। ক্রমে যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি। সন্ন্যাসী। পথের ধারে তরুতলে যাত্রীসমাগম। চটি। বড় ২ পুষ্করিণী। মন্দির। swamps। পথতরুর বিরলতা। দক্ষিণে বৃহৎ বিলের মত, মধ্যে ২ চারা ধান্য। পশ্চিমে তরুশ্রেণীর মধ্যে জগন্নাথ। বালুতীর। দুটি চারিটি বিচ্ছিন্ন বাড়ি। সুনীল সমুদ্র। সন্ধ্যালোকে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ।

২০ পৃষ্ঠা।

প্রাতে স্নান—

তালুক বানিয়ার সদর খাজনা
২৮ এপ্রিলের দেয় সদর খাজনা

খণ্ডগিরি। বাণীগুম্ফ—ছবি—পালি লেখা—মানুষের ভাব খুদে রাখবার প্রবৃত্তি—উপর থেকে দৃশ্য—অরণ্য। মানুষটানা গাড়ি। পথে দুই ধারে বিরলপত্র কুচলের বন। হাজারিবাগের ধরণ। পাহাড়ে রাস্তা, সরীসৃপের মত। উপরে যখন চড়ে—পর্বত দৃশ্য। দৈবাৎ মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত। বড় রাস্তা। দুই ধারে প্রস্তরময় উঁচুনীচু পাহাড়ে জমি। সম্মুখে ঘন মেঘ ও সুনীল পর্বতমালা।

ঈষৎ বৃষ্টির সূত্রপাত। অদূরে বাঙ্গলা। মধ্যে ভাঙ্গা পথ। বন্যায়।

বলু	— ৭৲ ব্রোচ্	বকৃশিস	— ৮৲
গোফুর	— ২৲	বলু	— ৬৲ জুতো
পাল্কি	— ১৮৲	কালেক্টর	— ৪৲
ছোট জাহাজ	— ৩৲	নৌকো	— ১৲

(পেন্‌সিলে কাটা)

২১ পৃষ্ঠা।

হে সিন্ধু ধরিত্রী তব গর্ভের সন্তান
অনিন্দ্য সুন্দরী। কত দীর্ঘ যুগ ধরে
আঁধারে জঠরে

(মাত্র তিন পংক্তি, কিন্তু কাটা)

পূর্বজন্মে অবশ্য একটা মহাপাপ করিয়াছিলাম, নতুবা লেখক হইয়া জন্মালাম কেন? মনের ভাবগুলা যখন বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছি, তখন বাহিরের লোক উচিত-অনুচিত যে কথাই বলে, না শুনিয়া উপায় নাই। সুধাকর চন্দ্র, তুমি যদি ক্ষীরোদ সমুদ্রের মধ্যেই আরামে শয়ান থাকিতে তাহা হইলে কবিদের কবিত্ব করিবার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইত বটে, কিন্তু নিশীথের শৃগাল তোমার দিকে মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ তারস্বরে অসম্মান জানাইয়া যাইত না।

মনের ভাব যখন মনে ছিল সে যেন আমার গৃহদেবতা ইষ্টদেবতা ছিল, এখন কি মনে করিয়া তাহাকে চতুষ্পথে বটবৃক্ষতলায় স্থাপন করিলাম, সকল জীবজন্তুই কি তাহার সম্মান বোঝে? যদি বা না বোঝে তবুও কি তাহাকে বিশ্বের চোখের সামনে পাথর হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না।

তাহার পর আবার আত্মীয়-বন্ধুদের কাছেই

২২ পৃষ্ঠা।

জবাবদিহি আছে। এটা কেন লিখিলে, ওটা কিভাবে বলিলে, সেটার অর্থ কী? এও ত বিষম দায়। যেন আমি কোদাল দিয়া পথ কাটিতেছি বলিয়া গাড়ি করিয়া মানুষকে পার করিয়া দেওয়াই আমার কর্তব্য।

যাহা হোক, ঝগড়া কাহার সহিত করিব? জন্মকালে অদৃষ্টপুরুষ ললাটে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই প্রবীণ ভাগ্যলিপি লেখক মহাশয়কে তাঁহার কোন লিখনের জন্যরহস্য লাঞ্ছনা করিলেও তিনি দিব্য গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকেন। আর তাহারই বশবর্তী হইয়া আমরা যদি দুটো কথা লিখি তাহা

হইলে কথার আর শেষ থাকে না।

২৩ পৃষ্ঠা।

১২৯৫ সালের জমিদারি মুনাফার হিসাব।

২৪ পৃষ্ঠা।

আমার মন মানে না! (দিন-রজনী।)

২৫ পৃষ্ঠা।

একটি নারী। বসে আছে বেদীতে। স্কেচ্।

লোক উদ্ধার বকৃশিস	— ৫৲
ভাঙ্গা নৌকা	— ২৲
নীতু	— ২৲
বলু	— ২৲
ঝাড়ন	— ১৲
গামছা	— ১৶৹
	১৩৶৹ (এই অংশটি কাটা)

২৬, ২৭ এবং ২৮ পৃষ্ঠা।

পরগণা হায়ের প্রধান প্রধান কর্মচারির নাম ও বেতন।

২৯ পৃষ্ঠা।

তালুক পাণ্ডুয়া।

কর্মচারিদের নাম ও বেতন।

৩০ পৃষ্ঠা।

তালুক বানিয়ার কর্মচারিদের নাম ও বেতন।

স্বরবর্ণ-এর বহু শব্দের তালিকা।

৩১ পৃষ্ঠা।

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বহু শব্দের তালিকা।

৩২ পৃষ্ঠা।

ট্রাস্টি দপ্তরের সদরের আমলাদের নাম ও বেতন।

৩৩ পৃষ্ঠা থেকে ৪১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

যথাক্রমে, রাজসাহীর রামপুরবোয়ালিয়া, নাটোর এবং শিলাইদহ বোটে ১৬ই, ২০ এবং ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখের তিন দিনে "প্রতীক্ষা" কবিতাটি রচনা করেন।

এই সময় নাটোরে থাকাকালীন দন্তরোগে গুরুতররূপে যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তা জানা যায় 'ছিন্নপত্রাবলী'র ৭৫ নম্বর চিঠি থেকে। খাতার পাতায় পর পর যেভাবে 'আমার মন মানে না' গানটি সমেত অন্যান্য কবিতা ও লেখাগুলি পাচ্ছি, তা থেকে সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত ঐ গানটি ১৫ কার্তিক থেকে ১৫ অগ্রাণের মধ্যে কোনো এক সময়ে রচিত। কিন্তু, এর বিরুদ্ধ-যুক্তিও আছে।

১২৯৯ সালের চৈত্র মাসে "গানের বহি ও বাল্মিকী প্রতিভা" যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তার ভূমিকায় বলা হয়েছিল, চৈত্র মাসের পূর্ব পর্যন্ত রচিত গুরুদেবের সব গানই এই বইটিতে সন্নিবেশিত হলো। কিন্তু চৈত্রের আগে রচিত এ গানটি গ্রন্থে স্থান পায়নি বলে স্বভাবতই মনে হবে, গানটি ১২৯৯ সালের পরবর্তীকালের রচনা। গুরুদেব তাঁর নিজের এই বইটিকে ভাল করে বাঁধিয়ে নেবার সময়ে, শেষদিকে স্বতন্ত্রভাবে অনেকগুলি শাদা পাতা তাতে জুড়ে নিয়েছিলেন। এই পাতাগুলিতে পরবর্তী কালের অনেকগুলো নতুন গান পাই যা গুরুদেবের নিজের হাতে লেখা। এই সঙ্গে "আমার মন মানে না" গানটিও আছে। কিন্তু 'পকেট-বুক'এর ১৪ই কার্তিক তারিখে রচিত "যেতে নাহি দিব" কবিতাটির পর ১৬ই অগ্রহায়ণের "প্রতীক্ষা" কবিতাটি রচনার পূর্বে যদি গানটি রচনা করে থাকেন, তাহলে মনে করা স্বাভাবিক যে, ভুলক্রমে 'গানের বহি'-তে এর স্থান হয়নি। অথবা 'পকেট-বুক'এ বর্ণিত উড়িষ্যা-ভ্রমণ যদি ১৮৯৩ সালে ঘটে থাকে, তবে আলোচ্য গানটি 'গানের বহি' প্রকাশের পরবর্তী কোনো সময়ে রচিত বলে ধরে নিতে বাধা নেই।

তালিকার ৪, ৫ ও ৬ নম্বর গান তিনটির কেবল প্রথম পংক্তির উল্লেখ আছে খাতার ৪১ পৃষ্ঠায়, এইভাবে :—

তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন।
ঝর ঝর বরষে।
ফিরে এস ফিরে এস।

১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলী থেকে প্রথম গানটির সবটাই তুলে দিচ্ছি।

মিশ্রবারোঁয়া

(ওহে নবীন অতিথি,)
তুমি, নূতন কি তুমি চিরন্তন ?
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সঙ্গোপন!

যতনে কত কি আনি বেঁধেছিনু গৃহখানি
হেথা কে তোমারে বলো করেছিল নিমন্ত্রণ ?
কত আশা ভালবাসা গভীর হৃদয়তলে
ঢেকে রেখেছিনু বুকে, কত হাসি-অশ্রুজলে !
একটি না কহি বাণী তুমি এলে মহারাণী,
কেমনে গোপনে মনে করিলে হে পদার্পণ ?

গানটির বিষয়ে গুরুদেব বলছেন, "একটা গান একটি মেয়ের অন্নপ্রাশনে লিখেছিলেম—

ওগো নবীন অতিথি,
তুমি নূতন কি তুমি
চিরন্তন !"

১৯৩১-এর এপ্রিল মাসে, অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীকালীপদ রায় ও পুত্রবধূ শ্রীমতী কমলাদেবীর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী কণীনা-র নামকরণ ও অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান হয়, শান্তিনিকেতনের গুরুপল্লীতে তাঁদের বাসভবনে। নেপালবাবুদের বিশেষ আগ্রহে, এই গানটিতে নতুন কোরে সুর দিয়ে গুরুদেব অমিতা সেন-কে (খুকু) শিখিয়েছিলেন, অনুষ্ঠানে গাইবার জন্য। অমিতা সে দিনের অনুষ্ঠানে গানটি গেয়েও ছিলেন।

দ্বিতীয় গানটি হলো :—

মিশ্রমল্লার

ঝরঝর বরিষে বারিধারা।
হায় পথবাসী ! হায় গতিহীন ! হায় গৃহহারা !
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে জনহীন অসীম প্রান্তরে !
রজনী আঁধারা !
অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলা রে, তিমিরদুকূলা রে !
নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে
চঞ্চলচপলা চমকে, নাহি শশীতারা।

গানটির বিষয়ে গুরুদেব, ১৮৯৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে লিখছেন :—

"আজ সেই ঝড়ের ভাবটা থেমে গিয়ে সকালে অল্প অল্প রোদ্দুর ওঠবার

চেঁচা করছে…। মেঘ আকাশময় ছড়ানো, পূবে হাওয়া খুব বেগে বইছে। …এখান থেকে দূরের পদ্মার গর্জন শোনা যাচ্ছে। কাল-পরশু দুদিন ঠিক আমার সেই নতুন গানের মতো দৃশ্যটা হয়েছিল :

ঝরঝর বরষে বারিধারা—
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে
জনহীন অসীম প্রান্তরে—
অধীরা পদ্মা তরঙ্গ-আকুলা—
নিবিড় নীরদ গগনে—ইত্যাদি।……

আমি কাল-পরশু প্রায় মাঝে মাঝে সেই গানটা গাচ্ছিলুম।" গানটি ১৩০১ সালের কোনো এক বর্ষার দিনে ঐরূপ পরিবেশে রচিত বলে মনে করি।

"ফিরে এস ফিরে এস" গানটি ১৩০১ সালে 'সাধনা' পত্রিকার আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যার "মেঘ ও রৌদ্র" গল্পটির সঙ্গে যুক্ত। গল্প লেখা শুরু হয় আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সময়ে। কিন্তু গানটি রচনা করেন দু'মাস পরে। ২৯ আগস্ট, ১৮৯৪ (১৪ই ভাদ্র, ১৩০১) তারিখে এক চিঠিতে কলকাতা থেকে গুরুদেব এ-গানটির বিষয়ে লিখছেন :—

"আজ সকালে বসে বসে আমার নতুন গানে সুর দিচ্ছিলুম—সুরটা যে খুব নতুন তা নয়, একরকমের কীর্তনের ধরনের ভৈরবী। কিন্তু তবু ছন্দে ছন্দে গাইতে গাইতে শরীরের সমস্ত রক্তের মধ্যে একটা সঙ্গীতের মাদকতা প্রবেশ করতে থাকে।" 'মেঘ ও রৌদ্র'র শেষ দশম পরিচ্ছেদে গানটির প্রথম চার পংক্তি গেয়েছে একদল বৈষ্ণব ভিক্ষুক, আর গানের বাকি পংক্তিগুলি গেয়েছে গল্পের নায়ক শশীভূষণ। এটি যে কীর্তন সুরেরই গান সেকথা এই পরিচ্ছেদে স্পষ্ট করে বলাও হয়েছে। গানটি গল্পে এইভাবে আছে।—

"একদল বৈষ্ণব ভিক্ষুক গুপিযন্ত্র ও খোল-করতালযোগে গান গাইতেছিল—

এস এস ফিরে এস, নাথ হে ফিরে এস!
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত্ত, বঁধু হে, ফিরে এস।
ওগো নিষ্ঠুর, ফিরে এস, আমার করুণকোমল এস!
ওগো সজলজলদস্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এস!

গানের কথা ক্রমে ক্ষীণতর অস্ফুটতর হইয়া আসিল, আর বুঝা গেল না। কিন্তু গানের ছন্দে শশীভূষণের হৃদয়ে একটা আন্দোলন তুলিয়া দিল, তিনি আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া পদের পর পদ রচনা করিয়া যোজনা করিয়া চলিলেন,

কিছুতে যেন থামিতে পারিলেন না,—

আমার নিতিসুখ ফিরে এস, আমার চিরদুখ ফিরে এস,—
আমার সব-সুখদুখমন্থনধন অন্তরে ফিরে এস !
আমার চিরবাঞ্ছিত এস, আমার চিতসঞ্চিত এস,—
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এস !
আমার বক্ষে ফিরিয়া এস, আমার চক্ষে ফিরিয়া এস,—
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এস।

আমার মুখের হাসিতে এস হে
আমার চোখের সলিলে এস,
আমার আদরে আমার ছলনে
আমার অভিমানে ফিরে এস।

আমার সর্বস্মরণে এস, আমার সর্বভরমে এস—
আমার ধরম-করম-সোহাগ-সরম-জনম-মরণে এস !"

১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলীতে গানটি 'কীর্তন' রূপে উল্লেখিত। এটি পুরোপুরি কীর্তনের ঢংএর গান। গানটির প্রথম চার পংক্তি হলো মূল গান। পরে, শশীভূষণ পদের পর পদ রচনা ও যোজনা করে যা গেয়েছেন তাকে বলবো মূল পংক্তি ক'টির 'আখর'। আখর যোজনা করে গান করা পদাবলী কীর্তনের একটি প্রসিদ্ধ রীতি। পূর্ব যুগে, অনেক কীর্তনীয়া ছিলেন, যাঁরা পালাকীর্তনের আসরে প্রাচীন পদাবলী গাইবার সময় আখর যোজনার বৈশিষ্ট্যে ও নৈপুণ্যে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অনেকেই মূল গানের পংক্তি অপেক্ষা আখরে বেশী সময় নিতেন। গুরুদেবের এ গানটিতেও তাই ঘটেছে। শশীভূষণের গানের অংশ আখরের রীতিতে যোজনা করা হয়েছে। এর দ্বারা গানের মূল আবেগটিকে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। এর পূর্বে গুরুদেব যে ক'টি কীর্তন গান রচনা করেছিলেন, তার একটিতেও এইরূপ আখরের প্রয়োগ তিনি করেননি। এ গানেই প্রথম সে কাজ করলেন। এবং এও দেখা যায় যে, পরবর্তী বেশ কয়েক বছর কীর্তন গানের সঙ্গে ক্রমাগত আখর যোজনা করে তিনি নিজে তা গেয়েছেন বা অন্যদের দিয়ে গাইয়েছেন। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করবো।

১৩০২ সালের ভাদ্রের শেষ সপ্তাহ থেকে কার্তিক মাসের শেষ পর্যন্ত লেখা ২৫টি গান পকেট-বুকের ৪২ পৃষ্ঠা থেকে একটানা পর পর ৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাচ্ছি।

এই সংখ্যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, শরৎকালের এই দু-মাস তিনি গানের রসে মজে ছিলেন। এই সময়কার চিঠিপত্রেও একথার সাক্ষ্য মেলে। ১৮৯৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বরের চিঠিতে শিলাইদহ থেকে লিখছেন :

"কেবল সংগীত-আলোচনায় সরস্বতীর সঙ্গে খানিকটা সম্বন্ধ রেখেছি।"

কুষ্টিয়া থেকে লেখা পরবর্তী ৬ই অক্টোবরে লিখছেন :

"মাঝে মাঝে একটি আধটি করে গান তৈরি করছি এবং চৌকিটাতে অকর্মণ্যভাবে বসে গুন্‌গুন্‌ করা যাচ্ছে। সুর তুলছি এবং সুখস্মৃতিময় বিষাদকোমল প্রশান্ত শরৎকালের মধ্যে কুণ্ডলায়িত হয়ে পড়েছি।"

এ সময়কার গানগুলির স্থান ও কালানুযায়ী তালিকাটি হলো :

১। উঠ রে, মলিন মুখ—মুলতান, ২৬ ভাদ্র ১৩২০ জোড়াসাঁকো

২। ওলো সই, ওলো সই—বিভাস খেমটা, ৫ আশ্বিন ১৯০২ শিলাইদহ বোট

৩। মধুর মধুর ধ্বনি বাজে—ভূপালি কাওয়ালি, ৬ আশ্বিন ১৩০২ শিলাইদহ বোট

৪। বেলা গেল, তোমার পথ—পূরবী একতালা, ৮ আশ্বিন ১৩০২ শিলাইদহ বোট

৫। বিশ্ব-বীণারবে বিশ্বজন—শঙ্করাভরণ, ঝাঁপতাল, ৪ এবং ৯ আশ্বিন

৬। আহা আজি মোর—দেশ পঞ্চম সওয়ারি

৭। কে দিল আবার আঘাত—কেনারা কাওয়ালি, বিজয়াদশমী, ১২ আশ্বিন ১৩০২ শিলাইদহ

৮। এস গো নূতন জীবন—১৩ আশ্বিন ১৩০২

৯। পুষ্পবনে পুষ্প নাহি—কালাংড়া, ১৪ আশ্বিন ১৩০২

১০। (আহা) জাগি পোহাল বিভাবরী—রামকেলী, ১৫ আশ্বিন

১১। ওহে অনাদি অসীম সুনীল—১৬ আশ্বিন

১২। তোমার গোপন কথাটি— ১৮ আশ্বিন

১৩। চিত্ত পিপাসিত রে— ২৩ আশ্বিন

১৪। আমি চিনি গো চিনি— ২৫ আশ্বিন

১৫। আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল— ২৯ আশ্বিন

১৬। ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী—ভূপাল খেমটা, ১ কার্তিক

১৭। (একি) আকুলতা ভুবনে—১৬ কার্তিক জোড়াসাঁকো ১৩০২

১৮। তুমি রবে নীরবে—১৮ কার্তিক জোড়াসাঁকো

১৯। সে আসে ধীরে—দেশ একতালা, ২১ কার্তিক

২০। কে উঠে ডাকি—পরজ, ২২ কার্তিক জোড়াসাঁকো

২১। ওহে সুন্দর মম গৃহে—খাম্বাজ একতালা, ২৩ কার্তিক

২২। তুমি যেয়ো না এখনি—কাওয়ালি, ২৪ কার্তিক

২৩। আকুল কেশে আসে—কাওয়ালি, ২৫ কার্তিক

২৪। হৃদয় চন্দ্র হৃদি গগনে—২৯ কার্তিক

২৫। কি রাগিণী বাজালে হৃদয়ে—সিন্ধুকানাড়া, ২৯ কার্তিক

উপরোক্ত তালিকার "ওলো সই" গানটির রচনার ইতিহাস শ্রীযুক্তা সাহানা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় যা জানিয়েছেন তা হলো :—

"শিলাইদহে কবি (গুরুদেব) যখন সপরিবারে বাস করতেন তখন মাসিমাও (অমলা দাশ) ওঁদের সঙ্গে প্রায়ই থাকতেন।…কবিপত্নীর সঙ্গেই ছিল মাসিমার সবচেয়ে বেশি ভাব। তাঁকে 'কাকিমা' বলে ডাকতেন। এই দুই সখীর একত্র বসে অন্তরঙ্গভাবে গল্পালাপাদির একটি চিত্র আছে রবীন্দ্রনাথের গানে ; গানটি হচ্ছে—'ওলো সই, ওলো সই'।" ১৩০২ সালের ৫ই আশ্বিন তারিখে শিলাইদহে বোটে লেখা গানটি হলো :

(বিভাস। খেমটা)

ওলো সই, ওলো সই !
আমার ইচ্ছা করে তোদের মত মনের কথা কই।
ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি
কোণে বসে কানাকানি,
কভু হেসে কভু কেঁদে
চেয়ে বসে রই।
ওলো সই, ওলো সই !
তোদের আছে মনের কথা
আমার আছে কই ?
আমি কী বলিব, কার কথা
কোন্ সুখ, কোন্ ব্যথা—

নাই কথা, তবু সাধ
শত কথা কই।
ওলো সই, ওলো সই!
তোদের এত কী বলিবার আছে
ভেবে অবাক হই!
আমি, একা বসি সন্ধ্যা হলে
আপনি ভাসি নয়নজলে,
কারণ কেহ শুধাইলে
নীরব হয়ে রই॥

শ্রীযুক্তা সাহানা দেবীর মাসিমা অমলা দেবী ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগ্নী। অমলা দেবী বয়সে কিছু বড় হলেও মৃণালিনী দেবীকে কাকীমা বলে ডাকতেন এবং কতখানি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তাঁর প্রতি ছিল, তা জানা যায় মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর ইন্দিরা দেবীকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে। তিনি বলছেন :—

"কাকীমার মত বন্ধু আমার আর নেই।······বাপমায়ের সঙ্গে রাগ করে কতবার কতদিন কাকীমার কাছে গিয়ে থেকেছি। যে আংটীব কথা লিখেছ সেটা বেশ মনে আছে।······শমী হবার (গুরুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র, জন্ম—১২৩১, অগ্রহায়ণ) এক বৎসর আগে শিলাইদহ ওঁদের সঙ্গে যেবার ছিলুম, একদিন রাত্তিরে বোটের জানালাব ধারে বসে আমার হাত থেকে খুলে কাকীমাকে পবিয়েছিলুম। ওই আংটীর সঙ্গে আমার অনেক কথা গাঁথা আছে।

'কাকীমার সঙ্গে যে কী সম্বন্ধ ছিল কোনদিন ভাল করে বুঝতে পারিনি। এক হিসেবে বন্ধু ছিলেন—তেমন বন্ধু আর কখন হয়নি হবেও না, অন্যদিকে মায়ের মত ভক্তি করতুম।"

অমলা দেবীর গানেব গলা ছিল খুবই ভাল। সেই কারণে গুরুদেবেরও তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। এ বিষয়ে অমলা দেবীর বোন উর্মিলা দেবী এবং রথীন্দ্রনাথ যা জানাচ্ছেন, তা উদ্ধৃত করছি। উর্মিলা দেবী লিখেছেন :—

"অমলাদিদি প্রাযই জোড়াসাঁকো যেতেন, কখনো কখনো দু-তিন মাসও থাকতেন।"

"তখনকার দিনে তিনি (গুরুদেব) গান রচনা করতেন একেবারে সুর-কথা

এক সঙ্গে। বড়ো বারান্দায় পায়চারি করতে করতে যেই শেষ হলো অমনি চিৎকার আরম্ভ করলেন, 'অমলা, ও অমলা, শিগ্‌গিরি এসে শিখে নাও, এক্ষুনি ভুলে যাব কিন্তু'।"

"কবিপ্রিয়া হাসতেন খুব—'এমন মানুষ আর কখনো দেখেছ অমলা, নিজের দেওয়া সুর নিজে ভুলে যায়'।"

"কবি অমনি বলতেন, 'অসাধারণ মানুষদের সবই অসাধারণ হয় ছোটো বউ, চিনলে না তো'।"

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে আছে :—

"এই সময়ে (১৮৯৬।৯৭?) নতুন গান বাঁধবার জন্য বাবাকে উৎসাহিত করেছিলেন অমলাদিদি, চিত্তরঞ্জন দাশের ভগ্নী। মায়ের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। অমলাদিদিকে মা এত স্নেহ করতেন যে, আমাদের বাড়ীতে নিজের কাছে এনে রাখলেন। তাঁর গান গাইবার ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে বাবা তাঁকে রাধিকা গোস্বামীর কাছে হিন্দি গান শিখতে দিলেন। অল্প দিনেই ওস্তাদি অনেক গান শিখে নিলেন। অমলাদিদির গলা যেমন অনায়াসে খাদে খেলত তেমনি চড়াতে উঠত। তাঁর গলার উপযোগী গান বাবা রচনা করতে লাগলেন। অমলাদিদি গাইবেন বলে যে গানগুলি বাঁধা হয়েছিল, তার মধ্যে একটা-দুটো মনে পড়ে; যেমন—

চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না···

এ পরবাসে রবে কে হায়···

কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু···

আমার অনুমান, এই গানগুলির সুর রাধিকাবাবুর কাছ থেকে বাবা নিয়ে এসেছিলেন। অমলাদিদি আসবার পর সান্ধ্য-মজলিসে তাঁকে বেশী গান গাইতে হত।"

অমলা দেবীর মৃত্যু হয় ১৯১৯ সালে। তখন তাঁর বয়স হবে ৪৬।৪৭। প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভকালে তিনি, মিস্ দাশ (এমেচার) নামে গুরুদেবের বহু গান হিজ্ মাস্টারস্ ভয়েস-এর রেকর্ডে গেয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রথম এমেচার মহিলা-শিল্পী হিসেবে একটি বিশেষ স্থান পেয়ে গেছেন। তাঁর পূর্বে সম্ভ্রান্ত বংশের আর কোনো মহিলা-শিল্পী রেকর্ডে গুরুদেবের গান গেয়েছেন বলে শোনা যায় না। অমলা দেবী গুরুদেবের যে গানগুলি রেকর্ডে গেয়েছিলেন তার একটি তালিকা বোধহয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মিস্ দাশ (এমেচার)

১। বড় বিস্ময় লাগে—৮—১৩৮৪৬—কানাড়ামিশ্র।
২। আহা জাগি পোহাল—৮—১৩৮৫৫—রামকেলী।
৩। চিরসখা হে ছেড না—৮—১৩৮৫৬—বেহাগ-কাওয়ালী।
৪। এ কী আকুলতা ভুবনে—৮—১৩৮৫৯—বাহার।
৫। কে বসিলে আজি—৮—১৩৮৬০—সিন্ধু।
৬। এ কী করুণা করুণাময়—৮—১৩৮৬১—বাহার।
৭। তোমার গোপন কথাটি—৮—১৩৮৬২—কীর্তন।
৮। এ ভরা বাদব মাহভাদর—৯—১৩৩০৪—মল্লার।
৯। অয়ি ভুবনমনোমোহিনী—৯—১৩৩০৬—টোরিভৈরবী।
১০। তোর আপন জনে ছাড়বে—৯—১৩৩০৭—বাউল।
১১। মহারাজ, একি সাজে—৯—১৩৩০৮—বেহাগ।
১২। রাখো রাখো বে জীবনে—৯—১৩৩০৯—শ্যাম।
১৩। সে আসে ধীরে—৯—১৩৩১০—সুরট।
১৪। আরো আঘাত সইবে—৯—১৩৩১২—ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।
১৫। এই করেছো ভাল নিঠুর—৯—১৩৩১৩—ইমনকল্যাণ।
১৬। হে মোর দেবতা—৯—১৩৭৫২—ইমনকল্যাণ—একতালা
১৭। তিমিরদুয়াব খোলো—৯—১৩৭৫৩—রামকেলী।
১৮। প্রতিদিন আমি—৯—১৩৭৫৯—সিন্ধুকাফী।
১৯। ধায় যেন মোর—৯—১৩৭৮৫—মিশ্রঝিঁঝিট।
২০। তুমি কেমন কবে—বি, ৩৬৪—মিশ্রখাম্বাজ।
২১। তুমি ববে নীরবে—বি, ৩৬৪—গৌব সারঙ্গ।

অমলা দেবী এবারে গুরুদেবের পবিবারের সঙ্গে শিলাইদহে এসেছিলেন। তা জানা যায় গুরুদেবের একটি চিঠি থেকে। ১৬ই অক্টোবরের চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন :—

"রাত্রি যদিও গভীর ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ছিল না, কারণ আমার পাশের বোট থেকে আমার দুই প্রতিবেশিনী বিছানায় পড়ে পড়ে হাস্যালাপ করছিলেন।"

চিঠিতে বর্ণিত এই 'দুই প্রতিবেশিনী' হলেন মৃণালিনী দেবী ও অমলা দেবী। রথীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, এ যুগে নতুন গান রচনার জন্য গুরুদেবকে অমলা

দেবীই উৎসাহিত করতেন, শিলাইদহেও তা ঘটেছিল। এখানে অমলা দেবী গান গেয়ে, গান শুনিয়ে এবং নতুন গান শেখবার আগ্রহ প্রকাশ করে গুরুদেবকে দিয়ে এতগুলি গান রচনায় সমর্থ হয়েছিলেন।

অমলা দেবী ছিলেন অবিবাহিতা। মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সখ্যতার একটি মধুর চিত্র "ওলো সই, ওলো সই" গানটিতে গুরুদেব এঁকে গেছেন।

খাতার ৪৫, ৪৬ এবং ৪৭ পৃষ্ঠায় আছে "বিশ্ববীণারবে" গানটির প্রাথমিক রূপ। ১৩০২ সালের ৪ঠা আশ্বিন গানটি রচনায় হাত দিয়ে ৯ই আশ্বিন শেষ করেছিলেন। রচনার স্থান শিলাইদহ। এটি একটি মারাঠি প্রবন্ধ-ভাঙ্গা গান। মূল গানটি সুর ও তাল সমেত জানতেন ইন্দিরা দেবী। সেই গানটির কথার ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে গুরুদেব বাঙলা ভাষায় বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত ঋতুর বর্ণনাত্মক গানে এটিকে পরিণত করেন। মূল প্রবন্ধের বিষয় ছিল ভিন্ন। গুরুদেবের পকেট-বুকের পাতায় গানটি এইভাবে আছে :—

শঙ্করাভরণ ঝাঁপতাল।

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদী নদে গুহা গিরি সাগরে পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরসভঙ্গিমা ;
নব বসন্তে নব আনন্দ, উৎসব নব ;
অতি মঞ্জুল, অতি মঞ্জুল,
শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে,
শুনিরে, শুনি মর্মর পল্লব পুঞ্জে ;
পিক কূজন পুষ্পবনে বিজনে ;
মৃদুবায়ু-হিল্লোল-বিলোল-বিভোল-বিশাল-সরোবর মাঝে,
কলগীত সুললিত বাজে ;
শ্যামল কান্তার পরে অনিল সঞ্চারে ধীরে রে—
কত দিনে কত ভাষা
দিকে দিকে কত বাণী
জলতলে ছলছল,
কথাহীন কত গাথা

ঝর ঝর বসধারা।

(৪ আশ্বিন)

আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব,

অতি গম্ভীর অতি গম্ভীর

নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে,

যেন রে, প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে,

করে গর্জন নির্ঝরিণী সঘনে,

হের ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিবাল পিয়াল তমাল বিতানে

উঠে রব ভৈরব তানে।

পবন মল্লার গীত গাহিছে আঁধার রাতে ,—

উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অম্বর তলে

দিকে দিকে কত ভাষা—

ঝরে জল ঝর ঝর,

বহে ঝড় সনসনে।

আশ্বিনে নব আনন্দ, উৎসব নব ,

অতি নির্মল অতি নির্মল অতি নির্মল উজ্জ্বল সাজে

ভুবনে নব শারদলক্ষ্মী বিরাজে ;

নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে ,

অতি নির্মল হাস বিভাস বিকাশ নীলাম্বুজ মাঝে

শ্বেত ভুজে শ্বেতবীণা বাজে ,

উঠিছে আলাপ মৃদুমধুর বেহাগ তানে,

চন্দ্রকরে উল্লসিত ফুল্লবনে ঝিল্লিরবে তন্দ্রা আনে রে,

দিকে দিকে কত ভাষা,

কাঁপে তরু মর মর

গুণ গুণ মধুকর।

(৯ আশ্বিন)

গানটি পরবর্তী মাঘ মাসে জোড়াসাঁকো বাড়ীর ১১ই মাঘের রাত্রির উপাসনার গানের তালিকায় স্থান পায়। পাঠান্তর করে, কতটুকু অংশ গাওয়া হয়েছিল, তা জানা যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮১৭ শকের (১৩০২) ফাল্গুন

সংখ্যায় মুদ্রিত গানটি দেখে। গানটির পরিবর্তিত রূপ তখন দাঁড়িয়েছিল :—

ব্রহ্মসঙ্গীত

(রাগিণী শঙ্করাভরণ—তাল ফেরতা)

বিশ্বরাজালয়ে বিশ্ববীণা বাজিছে ;
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদী নদে গিরি গুহা পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা ;
নব বসন্তে নব আনন্দ, উৎসব নব ;
অতি মঞ্জুল, অতি মঞ্জুল
শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে,
পিককূজন পুষ্পবনে বিজনে ;
তব স্নিগ্ধ সুশোভন লোচন-লোভন
শ্যাম সভাতল মাঝে
কলগীত সুললিত বাজে,
তোমার নিশ্বাস-সুখপরশে উচ্ছ্বাস হরষে
পল্লবিত মঞ্জরিত গুঞ্জরিত উল্লসিত
সুন্দর ধারা ;—
দিকে দিকে তব বাণী,
নব নব কত গাথা
অবিরল রসধারা ॥

১৩০৪ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত "স্বরলিপি-গীতমালা" গ্রন্থে গানটির প্রথম স্বরলিপি প্রকাশের সময় পকেট-বুকে লিখিত 'বিশ্ববীণা' গানটির সঙ্গে সামান্য কিছু পাঠান্তর ঘটে। ১৩০৭ সালে সরলা দেবী কর্তৃক প্রকাশিত "শতগান" নামক গ্রন্থে স্বরলিপি সহ গানটি পুনরায় মুদ্রিত হয়। "শতগানে", কথার পরিবর্তন অতি সামান্যই ঘটেছিল। ১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থাবলীর "গান" খণ্ডে এই গানটি যেভাবে মুদ্রিত, তাকেই বলা চলে পাঠান্তরের শেষ রূপ। পরবর্তী গ্রন্থে এই গানটি কাব্যগ্রন্থাবলীর পাঠ অনুযায়ী যেভাবে মুদ্রিত, তা হলো :—

শঙ্করাভরণ—মিশ্রতাল

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে!
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদী নদে গিরিগুহা পারাবারে,
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরসভঙ্গিমা।—
নব বসন্তে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে,
শুনি রে শুনি মর্মর পল্লবপুঞ্জে,
পিক-কূজন পুষ্পবনে বিজনে,
মৃদু বায়ুহিলোলবিলোল বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে,
কলগীত সুললিত বাজে!
শ্যামল কান্তার 'পরে অনিল সঞ্চারে ধীরে রে,
নদীতীরে শরবনে উঠে ধ্বনি সরসর মরমর,
কত দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝরঝর রসধারা!

আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি গম্ভীর, নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে,
যেন রে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে।
করে গর্জন নির্ঝরিণী সঘনে,
হেব ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়ালতমালবিতানে
উঠে রব ভৈরব তানে!
পবন মল্লারগীত গাহিছে আঁধার রাতে,
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অম্বরতলে।
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝরঝর রসধারা!

আশ্বিনে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি নির্মল, অতি নির্মল উজ্জ্বল সাজে
ভুবনে নব শারদলক্ষ্মী বিরাজে।

নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে,
অতি নির্মল হাসবিভাসবিকাশ আকাশনীলাম্বর-মাঝে
শ্বেত ভুজে শ্বেত বীণা বাজে—
উঠিছে আলাপ মৃদু মধুর বেহাগ তানে,
চন্দ্রকরে উল্লসিত ফুল্লবনে ঝিল্লিরবে তন্দ্রা আনে রে,
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝরঝর রসধারা !

এ গানটির সুর ও স্বরলিপি নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা হতে পারে বলে মনে করি। এ পর্যন্ত গানটির যে ক'টি প্রামাণ্য স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে তার প্রথমটি আমরা পাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত "স্বরলিপি-গীতিমালা" গ্রন্থে, ১৩০৪ সালে। স্বরলিপির প্রারম্ভে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন যে, গানটি শঙ্করাভরণ রাগিণী, ঝাঁপতাল ও কাওয়ালী তালে রচিত। আরম্ভের "বিশ্ববীণা" শব্দটিকে তিনি যেভাবে মাত্রা ভাগ করে স্বরলিপিতে লিখেছেন, তা হলো :

II -া -া | স্না -া না | সর্ধা -না | সা -নসর্না -ধা | পা -া | সা -া সা | না সা | রগা -মা গা]
০ ০ বি ০ শ্ব বী ০ ণা ০ ০ ০ স্ব রে ০ বি ০ শ্ব জ ন মো ০ ০ হি

অর্থাৎ তালের তৃতীয় মাত্রা থেকে 'বিশ্ব' শব্দটি শুরু হচ্ছে। ১৩০৭ সালে সরলা দেবী তাঁর "শতগান" গ্রন্থে একই নিয়মে কথাগুলিকে মাত্রা-ভাগে লিখেছিলেন। ১৩২৬ সালের শ্রাবণ মাসে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর "কেতকী" গ্রন্থে বর্ষার এবং ভাদ্র মাসে প্রকাশিত "শেফালী" গ্রন্থে শরৎ ঋতুর অংশটি স্বরলিপিতে প্রকাশ করলেন তালের ছন্দ ভাগের অনেক পরিবর্তন করে। তিনি তালের ভাগ করেছিলেন :

II না -া | না না -ধনা | নসা -না | ধা ধা পা -া | পসা -া | সা সন্ সা | রগা -মপা | পমা মগা -া]
বি ০ শ্ব বী ০ ০ ণা ০ র বে ০ বি ০ শ্ব জ ন মো ০ ০ ০ হি নী ০

এবারে তালের প্রথম মাত্রাতেই 'বিশ্ব' শব্দটিকে বসানো হলো। কথার ঝোঁক এর দ্বারা বদলে গেল।

১৯২১ সালে H. A. Poply তাঁর "The Music of India" গ্রন্থে "বিশ্ববীণা" গানটি ইয়োরোপীয় পদ্ধতির স্বরলিপিতে প্রকাশ করেন। স্বরলিপির নিচে লিখেছেন—

"Dr. Rabindranath Tagore was good enough to allow me to take down this song from his own singing, for which I

am very grateful."

কিন্তু Mr. Poply-র করা স্বরলিপিতে সুর ও তালের ভাগ যেভাবে করা হয়েছে তা উপরোক্ত স্বরলিপির কোনটির সাথেই মেলে না। গুরুদেবের জীবিতকালে প্রকাশিত প্রামাণ্য স্বরলিপি হলো এই ক'টি।

১৩২৬ সালে 'কেতকী' এবং 'শেফালী' গ্রন্থ দুটিতে "বিশ্ববীণা" গানের দুটি অংশের দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপি প্রকাশের পর ইন্দিরা দেবী গুরুদেবের কাছে ঐ স্বরলিপিতে সুরের বিকৃতি ঘটেছে বলে অভিযোগ তোলেন। তার উত্তরে গুরুদেব ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন :—

"দিনু এখানকার (শান্তিনিকেতন) ছেলেদের "বিশ্ববীণারবে" যে ধাঁচায় গাইতে শিখিয়েচে সেই ধাঁচা অনুসারে স্বরলিপি লিখেচে। ঠিক মূলের অনুবর্তন করা দরকার মনে করেনি। মৈথিলি বিদ্যাপতি বাংলায় এসে যেমন স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেচে এবং সেই স্বাতন্ত্র্যকে আমরা স্বীকার করে নিয়েচি, এই সমস্ত বিদেশী সুরেরও সেইরকম কিছু রূপ পরিবর্তন হবেই—হলে দোষই বা কি? এইসব যুক্তি মনে এনে ওকে আমি বেকসুর খালাস দিতে ইচ্ছা করি।"

গুরুদেবের এই উত্তরে ইন্দিরা দেবী সন্তুষ্ট হননি। তিনি নানা যুক্তির দ্বারা গুরুদেবের মতকে খণ্ডন করে চিঠি দিলেন। উত্তরে গুরুদেব সুর বিকৃতির দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিজের উপর নিয়ে লিখলেন :—

"আসল কথা, একে অজ্ঞতা তার উপর কুঁড়েমি। ও গানের সুরটা ত জানিই নে······তারপরে ব্যবহার করার যখন দরকার হল তখন গোঁজামিল চালিয়ে দেওয়া গেল।

"যদি বলিস্ দিনু এমন কাজ করলে কেন? তার কারণ 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'।"

পরে, এ নিয়ে আর কোনো বাদ-প্রতিবাদ গুরুদেবের সঙ্গে ইন্দিরা দেবী করেছিলেন বলে জানা যায় না।

১৩৬৩ সালে, গুরুদেবের মৃত্যুর প্রায় ১৫ বছর পরে দিনেন্দ্রনাথ কৃত "শেফালী" গ্রন্থের "বিশ্ববীণারবে" গানটির স্বরলিপি বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের কর্তৃপক্ষ বাতিল করে, পরিবর্তে ইন্দিরা দেবী কৃত নতুন একটি স্বরলিপি ছাপালেন। ইন্দিরা দেবী কৃত এই স্বরলিপির সঙ্গে দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপির আরম্ভের পাঁচ পংক্তির সুর প্রায় এক। পরবর্তী পংক্তি থেকে সুরান্তর ও ছন্দান্তর দেখা দিয়েছে। পরে "কেতকী"-র ১৩৬৮ সালের সংস্করণে ঐ গানের বর্ষা অংশের

ইন্দিরা দেবী কৃত নতুন স্বরলিপির সঙ্গে দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপিটিকেও রাখা হয়েছে। ১৩৬১ সালের স্বরবিতান ৩৬ খণ্ডে "বিশ্ববীণারবে" গানটি ইন্দিরা দেবী কৃত স্বতন্ত্র একটি পূর্ণাঙ্গ স্বরলিপি মুদ্রিত হয়। এর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সরলা দেবী কৃত পূর্ণাঙ্গ স্বরলিপির পার্থক্য প্রচুর। ইন্দিরা দেবীর স্বরলিপির সঙ্গে পূর্বের সব ক'টি স্বরলিপির পার্থক্যের কথা ইন্দিরা দেবী নিশ্চয় জানতেন। কিন্তু, সুরবিকৃতি নিয়ে কেন তিনি কেবল দিনেন্দ্রনাথের উপর অভিযোগ আনলেন তা জানি না। যাই হোক, এ গানটির সুর ও ছন্দ নিয়ে এরূপ একটি বিভ্রান্তিকর সমস্যা রয়ে গেছে।

পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় "ওঠ রে মলিনমুখ চল এইবার" গানটির রচনাকাল ২৬শে ভাদ্র, ১৩০২ সাল, স্থান কলিকাতা। এর পূর্ববর্তী পাতার গানটির তারিখ ১৬ই আশ্বিন থাকায় অনুমান করি, এ গানটি জোড়াসাঁকোয় রচনা করার সময় খাতাটি সঙ্গে ছিল না, সেই কারণে ১৬ই আশ্বিনের পর খাতায় লিখতে হয়েছিল।

৫২, ৫৩ এবং ৫৭ পৃষ্ঠা জুড়ে "আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল" এবং "ভাগ্যদেবী পিতামহী" গান দু'টি স্থান পেয়েছে। এ বছরের আশ্বিন ও কার্তিক মাসে রচিত যাবতীয় গানের মধ্যে এ দু'টির ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। এর বিশেষ কারণ কিছু ছিল বলেই মনে হয়।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "ঘরোয়া" গ্রন্থে "আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল" গানটির রচনার কথায় যা বলেছেন, তাতে আছে, তাঁদের বাড়ীতে একটি "ড্রামাটিক ক্লাব" ছিল! সেই ক্লাব থেকে তিনি এবং বাড়ীর অন্যান্য যুবকেরা মিলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "অলীকবাবু" নাটকটির অভিনয় করেন। এতে গুরুদেব নিজে অলীকবাবু-র চরিত্রে যোগ দেন। "এই নাটকেই প্রথম সেই গানটি হয়, রবিকাকা তৈরি করে দিলেন, আমরা অভিনয়ের পর, সবাই স্টেজে এসে শেষ গানটি করি—

আমরা সব লক্ষ্মীছাড়ার দল
ভবের পদ্মপত্রে জল
সদা করছি টলমল।

গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচও চলেছিল আমাদের।"

অলীকবাবুর অভিনয় হয়েছিল ১৮৯৭ (১৩০৩-৪) সালে। রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, অলীকবাবু-র অভিনয় হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত "ভারতীয় সঙ্গীতসমাজের" উদ্যোগে। ভারতীয়

সঙ্গীতসমাজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩০৪ সালের জানুয়ারী মাসে (১৮৯৮)। সুতরাং "ভারতীয় সঙ্গীতসমাজের" ব্যবস্থাপনায় এ নাটকটি অভিনীত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

অবনীন্দ্রনাথ কথিত "ড্রামাটিক ক্লাব" বিষয়ে অন্যত্র আর কোনো সংবাদ এখনো পাওয়া যায়নি। তিনি বলেছেন, এই ক্লাবটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৮ সালে, তাঁর বিবাহের পর। ক্লাবটি উঠে যায় "খামখেয়ালী সভা" প্রতিষ্ঠিত হবার আগে, অর্থাৎ ১৩০১ সালের পূর্বে।

খামখেয়ালী সভাব বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন :—

"এর পরে সব শেষে হোলো 'খামখেযালীসভা'। ড্রামাটিক ক্লাব নিয়ে নানা হাঙ্গামা হওয়ায এবারে রবিকাকা ঠিক করলেন, বেছে বেছে গুটিকতক খেয়ালী-সভ্য নেওযা হবে, অন্যান্যবা থাকবেন অভ্যাগত হিসেবে। নাম কী হবে, রবিকাকা ভাবছেন—খেয়ালী সভা। আমি বললুম, নাম দেওয়া যাক 'খামখেয়ালী'। রবিকাকা বললেন, ঠিক হযেছে, এই সভার নাম দেওয়া যাক 'খামখেয়ালী'। ঠিক হোলো প্রত্যেক সভ্যেব বাড়িতে মাসে একটা খামখেয়ালীর খাস মজলিশ হবে, আর সভ্যবা তাতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পডবেন।"

„খাস মজলিশের কর্মসূচী যতটা মনে পড়ে এইভাবে লেখা থাকত, একটা নমুনা দিচ্ছি—

১৩০৩

স্থান—জোড়াসাঁকো।

নিমন্ত্রণকর্তা—শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুষ্ঠান। শ্রীগগনেন্দ্রনাথ কর্তৃক 'অরসিকের স্বর্গ প্রাপ্তি" আবৃত্তি। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'মানভঞ্জন' নামক গল্প পাঠ। গোসাইজীর গান ও তাঁহাব দাদাব সংগত। গীতবাদ্য।"

"সেই খামখেযালীর সময়েই 'বৈকুণ্ঠের খাতা' লেখা হয়। খামখেয়ালীতে পড়া হোলো, ঠিক হোলো আমরা অভিনয় কবব। কেদার হলেন রবিকাকা, মতিলাল চক্রবর্তী সাজলেন চাকব, দাদা বৈকুণ্ঠ, নাটোরের মহারাজা অবিনাশ, আমি সেই তিনকড়ি ছোকরা।"

রবীন্দ্রজীবনী-তে প্রভাতবাবু জানাচ্ছেন, "বৈকুণ্ঠের খাতা"-র প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১৩০৩ সালে।

অতুলপ্রসাদ সেন, তাঁর স্মৃতিকথায় খামখেয়ালী সভার বিষয়ে লিখে গেছেন :—

"১৮৯৬ সালে তাঁহার (গুরুদেব) নেতৃত্বে 'খামখেয়ালী' সভা নামে একটি সাহিত্য ও সংগীত মণ্ডলী স্থাপিত হয়। আমি সভার সর্বকনিষ্ঠ সভ্য ছিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মহারাজ জগদীন্দ্রনারায়ণ, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকেন্দ্রনাথ পালিত প্রমুখ সাহিত্যিক ও সুরসিক 'খামখেয়ালী'-র সদস্য ছিলেন। এ সভায় কার্যপ্রণালী ছিল একটু খামখেয়ালী, নিয়মের কোনো বাঁধাবাঁধি ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল—হাস্যরসের উদ্দীপনা করা, সাহিত্যকে আনন্দে সরস করা, নানাবিধ সংগীতের দ্বারা সভ্যদের চিত্ত আকৃষ্ট করা এবং সভান্তে জঠরের সম্যক তুষ্টি সাধন করা। এ খামখেয়ালীর মজলিসকে মজগুল রাখিতেন পরম হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি আমাদিগকে হাসির বন্যায় ভাসাইতেন তাঁহার হাসির গান গাহিয়া। আমরা তাঁর হাসির গানের কোরাসে যোগ দিতাম, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কোরাসের নেতা।··· দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের নাচাইতেন হাসির উদ্বেল তরঙ্গে, রবীন্দ্র আমাদের মুগ্ধ করিতেন তাঁর অনুপম হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়া। খামখেয়ালীর আসরে বিখ্যাত গায়ক রাধিকানাথ গোস্বামী তাঁর উচ্চাঙ্গের তান লয় মণ্ডিত গান গাহিয়া আমাদের মনোরঞ্জন করিতেন। রবীন্দ্রনাথের সংগীত প্রতিভা এমন সর্বমুখী যে গোস্বামী মহাশয়ের উপাদেয় সুরে তিনি গান বাঁধিতেন এবং সে নবরচিত গানগুলি রাধিকানাথ খামখেয়ালীর আসরে গাহিয়া শুনাইতেন। তন্মধ্যে একটি গান মনে আছে—'মহারাজ একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে, চরণতলে কোটি শশী চন্দ্র মরে (সূর্য মরে) লাজে'। আমরা ছিলাম তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ। সেই আসরে কবি কত যে নূতন ও অনুপম স্বরচিত গান গাহিয়া আমাদের মনোরঞ্জন করিতেন তাহা জনমে ভুলিতে পারিব না। সেই সময়কার বিখ্যাত গানের কয়েকটি মনে আছে—'মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী, সখী জাগো—জাগো'। 'বঁধু হে ফিরে এসো ; মম সজল জলদ স্নিগ্ধ কান্ত অন্তরে ফিরে এসো' ; 'জাগি পোহাল বিভাবরী' ইত্যাদি গান ছাড়াও খামখেয়ালীর মজলিসের জন্য বিবিধ অপরূপ কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের শুনাইতেন, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহা শুনিতাম। তাঁর আবৃত্তি করিবার ক্ষমতা অসাধারণ। সে আসরে নাটোরের মহারাজা বাঁয়া তবলা বাজাইতেন। এ বাদ্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'রাজন' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

এস্রাজ বাজাইতেন বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রচনা পাঠ করিতেন আরও অনেক সাহিত্যিক। তন্মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আমাদিগকে সর্বাপেক্ষা চমৎকৃত করিতেন।"

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "পিতৃস্মৃতি" গ্রন্থে খামখেয়ালী সভার যে বর্ণনা রেখে গেছেন, তা হলো ঃ—

"আমার জ্যাঠামহাশয়ের আমলে ছিল 'বিদ্বজ্জন সভা'। বাবার আমলে তারই রূপান্তর হল 'খামখেয়ালী সভা'। 'খামখেয়ালী সভা' যখন আরম্ভ হয়, তখন আমি একটু বড় হয়েছি। তাই এই বৈঠকের বিষয় স্পষ্ট মনে আছে। এই সভার কোন নিয়মকানুন ছিল না।। পনেরো-কুড়িজন বন্ধুবান্ধব মিলে এই সভা। বাবা ও বলুদাদার (বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর) উৎসাহে এর প্রতিষ্ঠা হয়। সভ্যশ্রেণীভুক্ত হবার কোন নিয়ম না থাকলেও, লেখক কবি শিল্পী সংগীতজ্ঞ ও অভিনেতাদের নিয়েই সভা গঠিত হয়। বিদ্যাবুদ্ধি যাই থাক, সভ্য হতেবু গেলে মজলিসি হওয়া বিশেষ গুণ বলে পরিগণিত হত। আমাদেব পরিবারের মধ্যে বাবা, বলুদাদা, দ্বিপুদাদা, গগনদাদা, সমরদাদা ও অবনদাদা ছিলেন। আর পিছনে নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রিয়নাথ সেন, বড়ো অক্ষয়বাবু, ছোট অক্ষয়বাবু, প্রমথ চৌধুরী, সন্তোষের প্রমথ রায়চৌধুরী, অতুলপ্রসাদ সেন এবং আরো কয়েকজন, যাঁদের নাম আমার এখন মনে নেই। সভার প্রথা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—প্রতি মাসে এক-একজন সভ্য পালা করে তাঁর বাড়িতে অন্য সকলকে নিমন্ত্রণ করতেন। সেদিন সেখানেই বৈঠক বসত। যদিও আহাবের প্রচুর আয়োজন থাকত—কিন্তু সেটা উপলক্ষ মাত্র। কবিতা বা গল্প পড়া, ছোটোখাটো অভিনয় ও গানবাজনা করা এই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। বাবা সেই সময় যা কিছু নতুন কবিতা বা ছোট গল্প লিখতেন, খামখেয়ালী সভায পড়ে শোনাতেন। অনেক সময় মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাতেন। তাঁর হাত ভারি মিষ্টি ছিল।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে……

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে …

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে……

কবিতাগুলির ছন্দের ঝংকার পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর বোলের সঙ্গে চমৎকার শোনাত।"

১৩২৮ সালের ভাদ্রমাসে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিচিত্রা

ভবনের উত্তর প্রাঙ্গণে "বর্ষামঙ্গল" অনুষ্ঠিত হয়। সেবারের অনুষ্ঠানে গুরুদেব বর্ষার কবিতা ছুটি আবৃত্তি করেছিলেন, সেই সঙ্গে নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ কি চমৎকার ছন্দে ছন্দে মিলিয়ে পাখোয়াজ বাজিয়েছিলেন, তা আজও মনে পড়ে। মনে হয়েছিল, পাখোয়াজের বোলগুলি যেন কবিতার মত কথা কইছে।

রথীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন :—

"খামখেয়ালী সভায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যেদিন উপস্থিত থাকতেন, তাঁকে গান গাইবার জন্য সকলে অনুরোধ করতেন। তিনি গাইতেন, তাঁর হাসির গান। সকলে হেসে কুটিকুটি—কিন্তু দ্বিজুবাবু টেবিল-হারমোনিয়ম বাজিয়ে গেয়ে যেতেন গম্ভীর মুখে। অতুলপ্রসাদ সেনও তখন অল্পস্বল্প গান রচনা করতে শুরু করেছেন—মাঝে মাঝে তাঁকেও গাইতে হত।

"খামখেয়ালী সভার জন্য বাবা দুটো-একটা ছোটো নাটক রচনা করেন। ছোট অক্ষয়বাবুকে মনে রেখেই সম্ভবত 'বিনি-পয়সার ভোজ' লিখেছিলেন। অক্ষয়বাবু একা সেটা অভিনয় করেন।···তারপরে হল 'বৈকুণ্ঠের খাতা'। গগনদাদাদের বাড়িতে নাচঘরে এই নাটক প্রথম অভিনয় হয়েছিল।

বাবা সেজেছিলেন—অবিনাশ
গগনদাদা—বৈকুণ্ঠ
সমরদাদা—কেদার
অবনদাদা—তিনকড়ি
ছোট অক্ষয়বাবু—ঈশান

আমি একবারের বৈঠকের কথা বললুম। আমাদের বাড়িতে যে-কয়বার 'খামখেয়ালী সভা'র বৈঠক হয়েছিল, প্রত্যেকবারেই সাজানো ও আহারের অভিনব পরিকল্পনার ব্যতিক্রম হয়নি।"

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে 'খামখেয়ালী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩০১ সালের আষাঢ় মাসে। সভাটি একটানা প্রায় ১৩০৫ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল বলে জানা যায়।

'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল' গানটি প্রকৃত ড্রামাটিক ক্লাবের যুগে রচিত কিনা, তা নিয়ে মনে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় উপরোক্ত ক্লাব ও সভা সম্পর্কিত এতখানি উদ্ধৃতি ও অন্যান্য তথ্যের প্রয়োজন হলো। এ গানটি রচনার পূর্বেই ক্লাবটি উঠে গেছে। পরিবর্তে স্থান নিয়েছিল "খামখেয়ালী সভা"। এই সভার

আদর্শ, উদ্দেশ্য ও অন্যান্য বিবরণ "ঘরোয়া" গ্রন্থে যা পাই তা থেকে মনে হয় যে, গানটি হয়তো এই সভার জাতীয় সঙ্গীতরূপেই রচনা করেছিলেন। সভার প্রথমেই রচিত হয়নি, হয়েছিল দ্বিতীয় বছরে। "অলীকবাবু" নাটকটির অভিনয় হয় ১৮৯৭ সালের (বাং ১৩০৩-৪) মধ্যে। "খামখেয়ালী"র সব দিক বিবেচনা করে মনে হয় 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল' গানটি খামখেয়ালী সভার গান, "অলীকবাবু" নাটকটি খামখেয়ালী সভার প্রযোজনায় অভিনীত হয়েছিল এবং অভিনয়ের শেষে অভিনেতারা সমবেত কণ্ঠে নৃত্যযোগে তা গেয়েছিলেন। পকেট-বুকের পাতায় লেখা গানটির কথাগুলি হলো :—

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল।
ভবের পদ্মপত্রে জল,
আমরা করচি টলমল।
মোদের থাকা যাওয়া শূন্য হাওয়া
নাইকো ফলাফল।
নাহি জানি করণ কারণ, নাহি জানি ধরণ ধারণ,
নাহি মানি শাসন বারণ গো—
আমরা আপন রোখে মনের ঝোঁকে
ছিঁড়েছি শিকল।
লক্ষ্মী তোমার বাহনগুলি ধনেপুত্রে উঠুন ফুলি,
লুঠুন তোমার চরণধূলি গো—
আমরা স্কন্ধে লয়ে কাঁথা ঝুলি
ফিরব ধরাতল।
তোমার বন্দরেতে বাঁধা ঘাটে বোঝাই করা সোনার পাটে
অনেক রত্ন অনেক হাটে গো
আমরা নোঙর-ছেঁড়া ভাঙ্গা তরী
ভেসেছি কেবল।
আমরা এবার খুঁজে দেখি অকূলেতে কূল আছে কি,
দ্বীপ আছে কি ভব সাগরে ?
যদি সুখ না জোটে দেখব ডুবে
কোথায় রসাতল।

আমরা জুটে সারাবেলা করব হতভাগার মেলা,
গাব গান, খেলব খেলা গো !
কণ্ঠে যদি গান না আসে
করব কোলাহল।

গুরুদেব গানটির কথা বদলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "ধ্যানভঙ্গ" নাটকের ভূতপ্রেতের গানে রূপান্তরিত করেছিলেন। "ধ্যানভঙ্গ"র অভিনয় হয়েছিল ১৩০৭ সালের এপ্রিল মাসে, 'ভারতীয় সঙ্গীতসমাজে'র উদ্যোগে। গানটি হলো :—

(মিশ্র খাম্বাজ। একতালা)

আমরা ভূত-পেরেতের দল
ভবের পদ্মপত্রে জল, সদা করছি টলমল।
মোদের আসা-যাওয়া শূন্য হাওয়া, নাইকো ফলাফল।
নাহি জানি ধরণ ধারণ, নাহি শুনি কাহার বারণ,
কেবল মানি ভোলার শাসন গো।
আমরা আপন রোখে, মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল।
কখন আমরা ধরি কায়া, কখন হই রে গাছের ছায়া
কতই মোরা জানি মায়া গো।
কখন হয়ে ঝড়ের হাওয়া ফিরি ধরাতল।
(আমরা) অনাথ-বটে থাকি লটকে, পথিকের ঘাড় দিই মটকে,
শূন্যপানে যাই শট্‌কে গো।
(পরে) আবার এসে, শ্মশান-দেশে হাসি খলখল।
আমরা এবার খুঁজে দেখি, অকূলেতে কূল মেলে কি
ভোলার খেলা মোদের সম্বল।
যদি সুখ না জোটে, দেখব ডুবে কোথায় রসাতল।
আমরা জুটে সারাবেলা করব ভূত-প্রেতের মেলা,
গাব গান, খেলব খেলা গো।
(আর) কণ্ঠে যদি গান না আসে, করব কোলাহল॥

"লক্ষ্মীছাড়ার দল" গানটির পরই পকেট-বুকের ৫৪ পৃষ্ঠায় আছে :—

ভূপালি খেমটা

ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী, মিট্‌ল আমার আশ,
এখন তবে আজ্ঞা কর বিদায় হবে দাস !

জীবনের এই বাসর রাতি পোহায় বুঝি নিভে বাতি,
বধূর দেখা নাইকো, শুধু প্রচুর পরিহাস!
এখন থেমে গেল বাঁশি, শুকিয়ে এল পুষ্পরাশি
উঠ্‌ল তোমার অট্টহাসি কাঁপায়ে আকাশ—
ছিলেন যাঁরা আমায় ঘিরে, গেছেন যে যার ঘরে ফিরে,
শুধু আছ বৃদ্ধা ঠাকুরাণী মুখে টানি বাস।

গানটি "অলীকবাবু" নাটকের সমাপ্তি সঙ্গীতরূপে রচিত ও গীত হয়েছিল বলে মনে করি। গানটির চতুর্থ পংক্তি—"বধূর দেখা নাইকো, শুধু প্রচুর পরিহাস"-এর সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের "অলীকবাবু" বিষয়ক একটি উক্তিকে পাশা-পাশি সাজিয়ে বিচার করলে হযতো সে কথাই মনে হবে। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন :—

"আগে ছিল এক অলীকবাবুই নানা সাজে ঘুরে ফিরে এসে বাপকে ভুলিয়ে হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করে। রবিবাকা সেখানে অনেকগুলো লোক এনে ফেললেন। তাতে হোলো কী; অনেকগুলো ক্যারেক্টারেরও সৃষ্টি হোলো। হেমাঙ্গিনীকে রাখলেন একেবারে নেপথ্যে। তাছাড়া তখন মেয়েই বা কই অ্যাক্টিং করবার। তাই হেমাঙ্গিনীকে আর বেরই করলেন না।"

এইরূপ পরিহাসের অনুষ্ঠান গুরুদেব বরাবরই ভালবাসতেন। বৃদ্ধ বয়সে এই ধরনের আমোদপ্রমোদে তিনি অন্যদের যে উৎসাহিত করতেন তাও আমরা দেখেছি। ১৩৪২ সালের শ্রাবণ মাসে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও কর্মীরা "হৈ হৈ সঙ্ঘ" নামে একটি ক্লাব বা সভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এতে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বয়স্কদের সঙ্গে যুবক অধ্যাপক ও কর্মীরা একদল ছিলেন। নৃত্য, গীত ও অভিনযের অনুষ্ঠান এঁরা করেছিলেন মোট দু-বার। "হৈ হৈ সঙ্ঘ" ১৩৪২ সালের ৭ই ভাদ্র "ভরসা মঙ্গল" নামে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আসর করে, সিংহসদনে। তাতে আগে কখনো নাচেননি এমন একদল অধ্যাপক ও কর্মী মেয়েদের সাজে গুরুদেবের "বাকি আমি রাখব না কিছুই" গানের নাচটির নকল করে দেখিয়েছিলেন। আর দু'জন ছেলে ও মেয়ের সাজে দ্বৈত নৃত্য করেছিলেন, "আয় তবে সহচরী" গানের সঙ্গে। এই অনুষ্ঠানে গাইবার জন্যেই গুরুদেব সেবারে যে-কয়টি নতুন হাসির গান রচনা করেছিলেন, তা হলো—"আমরা না গান গাওয়ার দল রে", "পায়ে পড়ি, শোন ভাই গাইয়ে" এবং "ও ভাই কানাই কারে জানাই"। এ ছাড়া সুকুমার রায়ের

"গান ধরেছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা" কবিতাতে সুর দিয়ে দিয়েছিলেন অনুষ্ঠানে গাইবার জন্য।

৫৭ পৃষ্ঠার গান হলো "কে উঠে ডাকি মম বক্ষনীড়ে থাকি"। ১৩০২ সালের ২২শে কার্তিকে গানটি জোড়াসাঁকোতে রচনা করেন। গানটির প্রাথমিক রূপে প্রচলিত পাঠের সঙ্গে পার্থক্য থাকায় খাতা থেকে উদ্ধৃত করছি। খুবই কাটাকুটি করেছিলেন প্রথম রচনা কালে।

(পরজ)

কে উঠে ডাকি
মম বক্ষনীড়ে থাকি
করুণ মধুর অধীর তানে
বিরহ-বিধুর পাখী।
স্তিমিত পবন কুঞ্জভবন
তিমিরাবৃত সুপ্ত ভুবন।
কে রে একান্ত? হৃদয়প্রান্তে
জাগিছে একাকী।
কাহারে চাহে কি গান গাহে!
নিদ্রাবিহীন কি দুঃখ দাহে!
ঘুমাও রে অশান্ত
কি করিলি সারা দিনান্ত,
আমি যে শ্রান্ত বেদনা ক্লান্ত
তন্দ্রালস আঁখি! (২২ কার্তিক, জোড়াসাকো)

বর্তমানের পাঠও এ পাতায় লেখা আছে, কিন্তু তার সবটাই কাটা। যেমন :—

"নিবিড় ছায়া গহন মায়া
পল্লবঘন নির্জন বন
শান্ত পবনে কুঞ্জভবনে
কে জাগে একাকী
যামিনী বিভোরা নিদ্রাঘনঘোরা!
ঘন তমালশাখা নিদ্রাঞ্জন মাখা—
স্তিমিত তারা চেতনহারা
পাণ্ডু গগন তন্দ্রামগন—

চন্দ্র শ্রান্ত দিকভ্রান্ত
নিদ্রালস-আঁখি !"

পকেট-বুকের ৬০ পৃষ্ঠায় ১৩০২ সালের গানগুলি শেষ হয়েছে।

(মূল হিন্দী গান অনুসরণে ধর্মসঙ্গীত রচনা)

পরবর্তী ৬৩ পৃষ্ঠা থেকে ৭৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাচ্ছি ১৪টি হিন্দীভাঙা বাংলা ধর্মসঙ্গীত, মূল হিন্দী গান সহ। ৪টি হিন্দী গান আছে, যার সাহায্যে বাঙলা গান রচনা করেননি। এ গানের সঙ্গে রচনার তারিখ নেই। কয়েকটি গানের সঙ্গে বচনার তারিখ লেখা আছে। পর পর গানগুলি সাজিয়ে একটি তালিকা কবলে দেখা যাবে যে, ১৩০৩ সালে রচিত গানেব মধ্যে কিছু স্বরচিত, কিছু হিন্দী-ভাঙা বাংলা গান—মূল হিন্দী কথা সহ, হিন্দী গান যা বাংলায় ভাঙা হযনি এবং আছে দু'টি বেদগান। যেমন :—

স্বরচিত গান।

১। উজ্জ্বল কর হে আজি এ আনন্দরাতি—। ৯ বৈশাখ ১৩০৩।

২। আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে—। ১৪ শ্রাবণ ১৩০৩।

৩। কে যায অমৃতধামযাত্রী—২৯ ভাদ্র ১৩০৩।

৪। আমাব সত্য মিথ্যে সকলি—দেশ—একতালা।

৫। আব কত দূরে আছে সে—

৬। শান্ত হ রে মম চিত্ত নিরাকুল—

৭। অয়ি ভুবনমনোমোহিনী—পৌষ ১৩০৩।

(হিন্দী-ভাঙা বাঙলা গান ও মূল হিন্দী গান।)

১। শীতল তব পদ ছাযা, তাপহরণ।—
বাঙ্গুবি মোরি মুর গৈঁয়ি জিন ছুঁযো।

২। নিশিদিন জাগিয়া আছ নাথ হে।—
ঠাকুরিয়া অঁচরা মোরে ছাড়ি দে।

৩। আজি হৃদি আসনে তোমারে করি।—
প্যারি তেরে পাবানা পকারো, সব মেলি।

৪। তোমাহীন কাটে জীবন হে প্রভু।—
তুম বিনা কেসো রহগী তে পিয়ু।

৫। হৃদয় আবরণ খুলে গেল।
নদীয়ে মা বরণ কোয়েলিয়া।
৬। মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ—
৭। আজি মম মন চাহে জীবন—
ফুলী বন ঘন মোর আয় বসন্ত রী।
৮। হরষে জাগো আজি, জাগো রে।—
হরস জাগো লাল, লাল লয়্ কনারা।
৯। শান্তি কর বরিষণ নীরব ধারে।
শম্ভুহরপদ যুগধ্যান বখানী নাথরঙ্গ।
১০। সুন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল।
শঙ্কর শিব পিনাক গঙ্গাধর।

(হিন্দী গান যা বাঙলায় রূপান্তরিত হয়নি।)

১। কোমল বেলে, এরী যহাঁ, মোরা।
২। কঙনবা মোরী লাদেরে অতি।
৩। রাজ দুলারকা বনারা আইল।
৪। তু কাহাঁ পায়ো নয়ী হো অপরম্পার।
৫। সুদূর দূরে আয়োরী সো মুঁরা মুরা।

বেদগান।

১। শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি।
২। সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।

পকেট-বুকে, ১৩০৩ সালের আগে রচিত এ ধরনের হিন্দী-ভাঙা বাঙলা গান আর নেই।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তালিকার "উজ্জ্বল কর হে আজি এ আনন্দরাতি" গানটি গুরুদেব রচনা করেছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগ্নী নলিনীদেবীর সঙ্গে সুহৃদ চৌধুরীর বিবাহ উপলক্ষে। এই বিবাহ অনুষ্ঠানের দিন ছিল ১৩০৩ সালের ১৩ই বৈশাখ।

"কে যায় অমৃতধামযাত্রী" গানটি গুরুদেব রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিনের উপাসনায় গাইবার জন্য রচনা করেন। গানটি ২৭শে ভাদ্র তারিখের। জানা যায়, রামমোহন রায় ইংলণ্ডের বৃস্টল সহরে ১৮৩৩ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর জ্বরে

আক্রান্ত হয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই দেহত্যাগ করেন। বাংলা মতে ভাদ্র মাসের শেষে। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের যুগ থেকে এই দিনটিতে রামমোহন রায়ের স্মরণসভায় গানটি গাওয়া হচ্ছে, এখনো হয়।

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী" বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রভাতবাবু লিখছেন :—

"১৮৯৬, ডিসেম্বরে কংগ্রেসের ১২শ অধিবেশন কলিকাতার বিডন স্কোয়ারে। রবীন্দ্রনাথ নিজ সুরে 'বন্দে মাতরম্' গাহেন। জোড়াসাঁকোর বাটিতে কন্‌গ্রেসের অভ্যাগতদের আমন্ত্রণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নব রচিত গান—'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গাহিয়াছিলেন।"

"পিতৃস্মৃতি" গ্রন্থে এই অধিবেশনের বিষয়ে রথীন্দ্রনাথ লিখছেন :—"নাটোর কনফারেন্সের আগের বছর (১৮৯৬) কলকাতায় কংগ্রেস হয়। সেই সময় ইংরেজ সরকার ময়দানের দিকে কোথাও পোলিটিক্যাল মিটিং করতে দিত না। ঠিক হল বিডন স্কোয়ারে কংগ্রেসের প্যাণ্ডাল খাড়া করা হবে। বিডন স্কোয়ার আমাদের বাড়ির খুব কাছে। আমাদের বাড়িতেও তাই কংগ্রেসের আয়োজন নিয়ে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। বাবার উপর ভার পড়ল গানের ব্যবস্থা করবার। রিহার্সেল চলতে থাকল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্'-এ বাবা সুর বসিয়েছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের আরম্ভে বাবা একা এই গান গাইলেন, সরলাদিদি সঙ্গে অর্গান বাজিয়েছিলেন।…১৮৯৬ সালের কংগ্রেসে 'বন্দে মাতরম্' প্রথম গাওয়া হয়।"

দুটি উদ্ধৃতি থেকে জানা যাচ্ছে যে, গুরুদেব ও তাঁদের পরিবারের অনেকেই এবারের কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় জড়িত ছিলেন। এবং এই সূত্রে অন্য প্রদেশের নেতারা গুরুদেব ও তাঁদের পরিবারের সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নেতাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়। সেই অভ্যর্থনায় "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী" গানটি গুরুদেব সকলকে গেয়ে শোনালেন। গানটির শব্দ প্রয়োগ-রীতিটি লক্ষ্য করবার মত। ভারতমাতার বন্দনা করা হয়েছে আগাগোড়া সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে। কথ্য ভাষার শব্দ প্রায় নেই বললেই হয়। গানটি মিশ্র টোরী-ভৈরবী রাগিণী ও ত্রিতালে রচিত। পরিষ্কার বোঝা যায়, অবাঙ্গালী নেতারা যাতে গানের ভাব ও রূপ সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন সেদিক চিন্তা করেই গানটি রচিত হয়েছিল। গানটির রচনা সম্পর্কে অতুলপ্রসাদ সেন বলেছেন : "প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতায় একবার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক গণ্যমান্য

প্রতিনিধিরা আসিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রবাসীরা বাংলা জানেন না, অন্তত প্রাঞ্জল প্রচলিত বাংলা বোঝেন না অথচ অনেকেই সংস্কৃত জানেন; তাই সংস্কৃতবহুল একটি অপূর্ব ভারত-সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে আমাদের অনেককে সেই গানটি শিখাইয়াছিলেন। মনে আছে বহুকণ্ঠে ও বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আমরা সেই গানটি গাহিয়াছিলাম। আমাদের সকলকেই—পুরুষ ও মহিলা—শুভ্রবসন পরিধান করিতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে আমাদের নেতা। গাহিয়াছিলাম—

'অয়ি ভুবনমনমোহিনী'।"

গানটির প্রাথমিক রূপ ছিল :—

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী!
অয়ি নির্মল-সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী
অয়ি জনকজননী-জননী।
নীল সিন্ধুজলধৌত চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
শান্ত ললাট তোমার হিমাচল
(অয়ি) শুভ্রতুষার-কিরীটিনী।
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে
জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী।
চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্য পীযূষ স্তন্যবাহিনী।
(পৌষ, ১৩০৩)

এই গানটির পরের দুই পাতায় পর পর বেদমন্ত্র দুটি আছে। প্রথমটি হলো :—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি
দিব্যানি তস্থুঃ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়

এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং,
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগা প্রশান্তাঃ
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যু…
বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চসর্ব্বৈঃ
প্রাণাভূতানি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র
তদক্ষরং বেদযতে যস্ত সৌম্য
সসর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ।
যশ্চাযমস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ
সর্ব্বানুভূঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ
পুরুষ সর্ব্বানুভূঃ। তমেব বিদিত্বাতি…

পরবর্তী যুগে এই মন্ত্রটির কতগুলি পংক্তি বাদ দেওযা হয এবং দু-একটি পংক্তি সংযোজিত হয়। দ্বিতীয মন্ত্র হলো :—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্,
সমানং মন্ত্রং অভিমন্ত্রয়ে বঃ
সমানেন বো হবিষা জুহোমি।
সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদযানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।

বর্তমানে এ মন্ত্রটিকে যেভাবে গাওযা হয তার সঙ্গে পংক্তির পার্থক্য আছে। এ মন্ত্রটি গুরুদেবের কিশোর বয়সের জাতীযতাবোধ উদ্দীপক "সঞ্জীবনী সভা"র উদ্বোধনী সঙ্গীতরূপে যে গীত হতো, সে খবর আমরা পাই তাঁর "জীবনস্মৃতি" এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মচরিত থেকে। কংগ্রেসের এবারকার অধিবেশনে এটি গাওয়া হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। কিন্তু ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন যেবার কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে হয়, তখন তার

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে এই মন্ত্রটি গাওয়া হয় 'বন্দে মাতরম্' ও 'দেশ দেশ নন্দিত করি' সহ।

সম্ভবত দুটি মন্ত্রই বিডন স্কোয়ারের কংগ্রেসের অধিবেশনে গাওয়া হয়েছিল। অথবা জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিমন্ত্রণ সভায় "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী" সহ মন্ত্র দুটি নেতাদের শোনানো হয়। নতুন ভাবে সুর যোজনার প্রয়োজনে মন্ত্র দুটি খাতায় লিখে নিয়েছিলেন।

মন্ত্র দুটির পরেই পরবর্তী তিন পৃষ্ঠাব্যাপী তখনকার দিনের কলিকাতার বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম লেখা আছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর অধিবাসীদের নাম সহ। অনুমান করি, দেশনেতাদের অভ্যর্থনা সভায় মোট কতজন যোগ দেবেন এটি তারই তালিকা। আরম্ভে আত্মীয়দের নামগুলি হলো :—

বড়দাদা, দ্বিপু, অরু, মোহিনী, যোগিনী, রমণী, নীতু, সুধী, মেজদাদা, সুরেন, বিবি,

হিতু, আশু, আমি, D. N. Chatterjee, লক্ষ্মীজল, শোভনা, জ্যোতিদাদা

দাদা

বড়দিদি, সত্য, নিত্য

নদিদি সরলা হিরণ জ্যোৎস্না

সেজদিদি ছোটদিদি সুকুমার অশ্বিনী নলিনী বাড়ুয্যে

গগন জ্যোতি নীরু শেষেন্দ্র রজনী

বাইরের নিমন্ত্রিতদের নাম :—

ত্রিপুরা

বড়ঠাকুর

সন্তোষ

নাটোর

কুচবিহার সুচারু

দিঘাপতিয়া (নাম কাটা)

জগদীশ বসু

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

Ghosh & Kar

Gurudas Banerjee

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সাহিত্য পরিষৎ

মৃণালিনী

Poet Ghosh Brothers

গিরীন্দ্রমোহিনী

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী (নাম কাটা)

বরদাচরণ মিত্র

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

আমাদের উকীল (নাম ক'টি কাটা) প্রদীপ

প্রেমতোষ বাবু
ত্রিবেদী
B. L. Gupta
C. R. Das অমলা
Mrs. S. R. Das
K. N. Roy Esq.
L. Palit
Rajnarain Bose
Shrish Majumdar
Priyanath Sen
R. C. Dutta

অক্ষয় বড়ল
বিজয় মজুমদার
দেবেন্দ্রনাথ সেন Bijnor
(গগনচন্দ্র রায়)
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
চন্দ্রনাথ বসু
নবীনচন্দ্র সেন
অক্ষয় মৈত্র
লাহোরিনী
উমা দাস
প্রিয়া

প্রবোধ
প্রভাতকুমার
শিবনাথ শাস্ত্রী
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
পূর্ণিয়ার রাজা (নাম কাটা)
কমলেশ্বরী & Co. (নাম কাটা)
দীনেন্দ্রকুমার
রমণীমোহন ঘোষ
Dinesh Ch. Sen
Prematosh Bose, 115 Amherst St
Babu Hemchandra Sen
" Surendranath Maitra
Kalimohan Ghosal
Mahendrachandra Home
Abhoysankar Majumdar
Atulananda Dutta
Kulada Ranjan Ray

এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনের গান সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছু তথ্য পেশ করছি।

'Home rule league' আন্দোলনের জন্য মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে, শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত এবং তাঁর সহকর্মীদের অন্তরীণে আবদ্ধ করায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বুদ্ধিজীবী মহলে যে প্রতিবাদ আন্দোলনের ঝড় উঠেছিল, তদানীন্তন বাংলার শিক্ষিত জনগণও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে বাংলায় প্রতিবাদ-আন্দোলনের বিষয়ে জানিয়েছেন :—

"কলিকাতায় বেসান্তের অন্তরীণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করিবার জন্য টাউন হল চাওয়া হইল। বাংলা গবর্মেণ্ট হলের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন যে অন্য কোনো প্রাদেশিক সরকারের কাজের প্রতিবাদের জন্য তাঁহারা সরকারী বা আধাসরকারী গৃহ দিতে পারেন না। টাউন হলে জনসভা হইতে পারিল না। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' লিখিয়া প্রথমে 'রামমোহন লাইব্রেরি' হলে (১৯১৭ অগাষ্ট ৪) পাঠ করেন। কিন্তু বৃহত্তর হলে সভা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াও কোন স্থান পাওয়া গেল না। অবশেষে আল্‌ফ্রেড থিয়েটারের মালিক জে এফ মাডান বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া দেন।"

"এই উত্তেজনার মুহূর্তে কবি লিখিলেন 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী'—গানটি। এই সময়ে বিচিত্রা ভবনে কী উত্তেজনা দেখিয়াছিলাম। নেতাদের কী আসা-যাওয়া, কত আলোচনা, সলা-পরামর্শ।" "১১ অগষ্ট ১৯১৭ যে সভা হয়, (আল্‌ফ্রেড থিয়েটার) তাহার সভাপতি হন ভূপেন্দ্রনাথ বসু। নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ পাখোয়াজ বাজান ও 'বিচিত্রা'-র দল কর্তৃক 'দেশ দেশ নন্দিত' গানটি গীত হয়।"

এই প্রবন্ধটি এবং 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটির রচনা সম্পর্কে অমল হোম মহাশয়, তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

"১৯১৭ সাল। দেশ জুড়ে স্বায়ত্ত শাসনের দাবী প্রবল হয়ে উঠেছে। অ্যানি বেসাণ্টের নেতৃত্বে 'Home rule for India' আন্দোলনে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত আলোড়িত। মিসেস বেসাণ্টকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট করলেন ইণ্টার্ণ।...টাউন হলে প্রতিবাদ সভার আয়োজন চলেছে—গভর্ণর রোনাল্ডসে জানালেন যে, মিটিং করা চলবে না। সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন ওঁরা সব ডেপুটেশনে গেলেন লাটসাহেবের কাছে। অনেক কাকুতি মিনতির পর মিললো মিটিংয়ের অনুমতি। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ এলেন কলকাতায়, সঙ্গে নিয়ে তাঁর সেই

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভাষণ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'…। একদিন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে।…তিনি কবিকে অনুরোধ জানালেন, দেশের এই নব-জাগরণের উদ্দীপনা উপলক্ষে দিন তিনি একটি গান বেঁধে।"

"পরের দিনই রচিত হল সেই গান—সেই বিখ্যাত গান: দেশ দেশ নন্দিত করি, মন্দ্রিত তব ভেরী…।"

"ঠিক হল গানটি গাওয়া হবে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ পাঠ সভায়।"

"জোড়াসাঁকোর লাল বাড়ির 'বিচিত্রা' হল-ঘরে গানের মহড়া শুরু হল। নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ সঙ্গতে বসলেন তাঁর পাখোয়াজ নিয়ে। দিনেন্দ্রনাথ এলেন শান্তিনিকেতন থেকে কয়েক জনকে নিয়ে, আর এখানেও আমরা জুটে গেলাম জনকয়েক।"

গানটি যে রামমোহন লাইব্রেরিতে প্রবন্ধ পাঠের দিন প্রথম গাওয়া হয়েছিল তার উল্লেখ পাই ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত "The Calcutta Municipal Gazette"-এর "Tagore Memorial Special Supplement"-এ। তাতে আছে—"Composes, at the request of Pandit Malaviya, his famous national song Desha Desha nandita kari mandrita taba veri, which is sung for the first time at the meeting at Rammohan Library."

৫ই সেপ্টেম্বর, মাদ্রাজ সরকার শ্রীমতী বেসান্তকে, অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি দেন। তিনি কলকাতায় আসেন। তাঁর প্রতি কলকাতাসীরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন সমারোহের সঙ্গে।

ডিসেম্বর মাসের শেষে, কংগ্রেস অধিবেশন যে কলকাতায় হবে তা পূর্বেই স্থির ছিল। ৪ঠা অক্টোবর, কলকাতায় অভ্যর্থনা সমিতির অধিবেশনে শ্রীমতী বেসান্ত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের সভাপতিত্বের জন্য নির্বাচিত হন। এই সময়ে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' সমিতির উদ্যোগে গুরুদেবের 'ডাকঘর' নাটকের আয়োজন চলছিল। বিচিত্রা হলের পশ্চিম প্রান্তে মঞ্চ তৈরী করে ১০ই অক্টোবর অভিনয় শুরু হয়। রবীন্দ্রজীবনীকার জানাচ্ছেন—

"বিচিত্রায় দুই দিন অভিনয় হয়—একদিন বিচিত্রার সদস্যদের জন্য ও আর একদিন বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য। শেষ দিন দর্শকদের মধ্যে ছিলেন অ্যানি বেসান্ত, লোকমান্য টিলক, মদনমোহন মালব্য ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।"

কিন্তু ১৩৫০ সালে প্রকাশিত "গীতবিতান বার্ষিকী' পত্রিকায় শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন "ডিসেম্বর পর্যন্ত উপর্যুপরি অন্তত বার সাতেক অভিনীত হয়। ২৫শে অক্টোবর ১৯১৭ তারিখের একটি চিঠিতে গুরুদেব পিয়ার্সন সাহেবকে জানাচ্ছেন, "We staged Dakghar (Post Office) in our Bichitra Hall, gave five performances and felt happier each time we did it."

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন,

"After every show when I wanted to put down the stage, demand was made for another repeat performance and thus Amal's three-walled cottage remained a fixture in the Bichitra Hall for many weeks. I believe the seventh and last performance was given for the entertainment of the delegates of the Indian National Congress then being held in Calcutta.…After the session of the Congress all the distinguished members including the grand old lady-President, Pandit Madan Mohan Malaviya, Mahatma Gandhi, Gokhale and Lokmanya Tilak came to the play at our house."

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত, 'ডাকঘর' নাটকটিতে উল্লেখ আছে—"১৯১৭ ডিসেম্বরের শেষে ও ১৯১৮ জানুয়ারির প্রথমে ডাকঘরের পুনরভিনয় হইয়াছিল মনে হয়। কারণ, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬, ২৮, ২৯ ডিসেম্বর তারিখে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়, জানা যায় ঐ সময় লোকমান্য টিলক, মিসেস বেসান্ত, গান্ধীজি, মালবীয়জি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ করিয়া একদিন বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল।"

এই নাটকটির অভিনয় বিষয়ে "The Calcutta Municipal Gazette"-এর সেপ্টেম্বর ১৯৪১ সংখ্যায় বলা হয়েছে যে, "Dakghar (Post Office) is staged by the Poet at the Vichitra Club Hall, ……the performance being witnessed by Gandhiji, Tilak Maharaj, Malaviyaji, Mrs. Besant and other prominent Congress leaders."

একই প্রকার সংবাদ পাচ্ছি পরবর্তী অক্টোবর মাসে প্রকাশিত "The Visva-Bharati Quarterly"তে। পত্রিকাটির "Tagore Birthday Number"-এর "A Tagore Chronicle" অংশে আছে; "The Dakghar (Post Office) is staged by the Poet at the Vichitra Club Hall, the audience including Gandhiji, Lokamanya Tilak, Mrs. Besant, Malaviaji and eminent personalities."

এই ক'টি সংবাদ থেকে মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যায় যে, ডাকঘরের অভিনয় অক্টোবর মাসে মোট পাঁচ রাত্রি হয়েছিল, সপ্তম ও অষ্টম রাত্রির অভিনয় হয়েছিল কংগ্রেস অধিবেশনের শেষে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, তাঁর এক প্রবন্ধে, ১৯১৭ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনের গান সম্পর্কে বলেছেন, "এই কংগ্রেসের তিনদিনের চারটি গান এবং 'India's Prayer' কবিতাটির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।"

"প্রথম দিনের (২৬শে ডিসেম্বর) যথারীতি উদ্বোধন হয় শ্রীমতী অমলা দাশের পরিচালনায় বন্দেমাতরম গান দিয়ে। তাছাড়া সেদিন আরও কয়েকটি গান হয়, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি।" "প্রথম দিনের কার্যারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'India's Prayer' কবিতাটি পাঠ করেন।"

"দ্বিতীয় দিনে গাওয়া হয় সরলা দেবীর 'নমো হিন্দুস্থান' (অতীত গৌরববাহিনী)। তৃতীয় দিনে গাওয়া হয় 'জনগণমন-অধিনায়ক'।"

The Calcutta Municipal Gazette-এ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেসের প্রথম দিনের অধিবেশনের বর্ণনায় আছে,

"On the opening day he receives a great ovation and reads 'India's Prayer' (a poem) immediately after singing Bande-Mataram."

The Visva-Bharati Quarterly পত্রিকায় "Tagore Birthday Number'এ বলা হয়েছে যে, "The Poet attends the Congress Session on the first day, receiving a great ovation, and recites the poem 'India's Prayer'."

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 'চিঠিপত্র' ৬ষ্ঠ খণ্ডের পরিশিষ্ট অংশে আছে, "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং এই বেদমন্ত্র ও বন্দেমাতরম গীত হইবার পর, সভার

সাফল্য কামনা করিয়া প্রেরিত পত্রাদি বিপিনচন্দ্র পাল কর্তৃক পঠিত হইলে,” গুরুদেব, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আহ্বানে India's Prayer আবৃত্তি করে শোনান।

কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেসের গান সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়, মোট ১৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত একটি পুস্তিকা থেকে। এতে, কংগ্রেসে যোগদানকারী ভারতের নানা প্রদেশ থেকে আগত সদস্যদের গানের মর্মার্থ বোধের সুবিধার্থে ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রসহ ৬টি 'জাতীয়ভাব-উদ্দীপক বাংলা গান ও তার সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় তার অনুবাদ ছাপানো হয়েছিল। এর প্রকাশক ছিলেন কংগ্রেস অফিস, ছাপানো হয়েছিল কুন্তলীন প্রেস থেকে। প্রথম পাতাতে ছিল—

"Thirty-Second Indian National Congress

Songs

(with translations)

Calcutta

1917

Two annas

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে, অনুবাদ সহ, গান ক'টি যেভাবে পরপর ছাপানো ছিল তার তালিকা হল—

১। সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং	ঋগ্‌বেদ ৮।৮।১৯৬	অনুবাদক উল্লেখ নেই
২। বন্দেমাতরম	বঙ্কিমচন্দ্র	,, অরবিন্দ
৩। দেশ দেশ নন্দিত করি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	” রবীন্দ্রনাথ
৪। অতীত গৌরববাহিনী	সরলা দেবী	” ইন্দিরা দেবী
৫। যে দিন সুনীল জলধি	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	” ”
৬। মিলে সবে ভারতসন্তান	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	” ”
৭। জনগণমন অধিনায়ক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	” ”

কংগ্রেসের অভ্যর্থনা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত গানের এই তালিকা এবং উপরিউক্ত সংবাদ থেকে অনুমিত হয় যে, ২৬শে ডিসেম্বর, অধিবেশনের উদ্বোধনের দিনে "India's Prayer" কবিতাটি সহ, ঋগ্‌বেদের মন্ত্র, বন্দেমাতরম এবং 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গান ক'টি গীত হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে হয়েছিল, "অতীত গৌরববাহিনী" ও 'যে দিন সুনীল জলধি হইতে' এবং তৃতীয় দিনে

গাওয়া হয় 'মিলে সবে ভারতসন্তান' ও 'জনগণমন অধিনায়ক'। এই গান ক'টির পরিচালনার দায়িত্ব ছিল সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী ও দিনেন্দ্রনাথের উপর।

উপরিউদ্ধৃত গানের তালিকার ৪ নম্বরের 'অতীত গৌরববাহিনী' থেকে পরপর ৭ নম্বরের 'জনগণমন অধিনায়ক' পর্যন্ত চারটি গানেরই ধুয়া-পঙক্তির, বাংলা কিংবা ইংরাজি অনুবাদের সঙ্গে 'কোরাস' শব্দটি মুদ্রিত ছিল। যেমন: "Chorus" ছাপা ছিল 'অতীত গৌরববাহিনী'-র বঙ্গ বিহার অযোধ্যা উৎকল মাদ্রাজ মারাঠা ইত্যাদি শব্দযুক্ত পঙক্তি ক'টির ইংরেজী অনুবাদের পাশে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "যে দিন সুনীল জলধি হইতে" গানটির, 'ধন্য হইল ধরণী তোমার' ইত্যাদি কথাযুক্ত পঙ্‌ক্তি দুটির পাশে বাংলায় 'কোরাস' এবং তার ইংরেজি পঙ্‌ক্তির উপরে ছিল "Chorus"। 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গানটির 'গাও ভারতের জয়' পঙ্‌ক্তির কেবল ইংরেজি অনুবাদের মাথায় 'Chorus' শব্দটি ছিল। "জনগণমন অধিনায়ক" গানটিতে কোরাস শব্দটি ছিল প্রতি কলির শেষ দুটি পঙ্‌ক্তির ইংরেজি অনুবাদের উপর। ইন্দিরা দেবী, এবারের এইরূপ কোরাস গীত পদ্ধতির কথা ভেবেই বোধহয়, ১৩১৬ সালে প্রকাশিত তাঁর "রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গম" গ্রন্থে লিখেছিলেন: "যে কোন উত্তেজনাপূর্ণ গানে তিনি (গুরুদেব) বিলেতী 'কোরাস' বা গানের প্রত্যেক কলির শেষে একটি ধূয়া, সমবেত কণ্ঠে গাবার অনুসরণ করেছেন, যথা 'জনগণমন' গানের 'জয় হে জয় হে' কিংবা 'মাতৃমন্দির পুণ্য-অঙ্গন' গানের 'জয় জয় নরোত্তম' ইত্যাদি।"

গুরুদেব কর্তৃক রচিত 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি হলো মোট ৫ কলির। কিন্তু, এবারকার কংগ্রেসের অধিবেশনে গাওয়ানো হয়েছিল মাত্র তিনটি, অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম কলি ক'টি। এর দুটি কলিতে: দুটি শব্দের পরিবর্তন লক্ষিত হয়। যথা, প্রথম কলির ধূয়ার 'জনগণ মঙ্গল দায়ক' শব্দটির জায়গায় তৃতীয় কলির "ঐক্য বিধায়ক" এবং চতুর্থ কলির 'পথপরিচায়ক', তৃতীয় কলির 'ঐক্যবিধায়ক'-এর জায়গায় স্থান পেয়েছিল। এছাড়া, গানটি আরম্ভের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'পঞ্জাব' শব্দটির পরিবর্তন করে ছাপানো হয়েছিল 'পাঞ্জাব'। এ গানটির ইংরেজি অনুবাদের বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন:

"এই সময় থেকেই গানটির জাতীয় চিত্তজয়ের যাত্রা শুরু হয় এবং এই যাত্রাপথ কিছু পরিমাণে সুগম হয় ইংরেজি অনুবাদের দ্বারা। উক্ত কংগ্রেস-অধিবেশনের অত্যল্পকাল পরেই গানটির কবিকৃত প্রথম ইংরেজি অনুবাদ

প্রকাশিত হয় মডার্ন্ রিভিউ পত্রিকায় (১৯১৮ ফেব্রুয়ারি)।" কিন্তু, গানের এই পুস্তিকাটি থেকে জানা যাচ্ছে যে, গানটির প্রথম ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন ইন্দিরা দেবী, কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়। সুতরাং গানটির জাতীয় চিত্তজয়ের সূত্রপাত হয়েছিল ইন্দিরা দেবী কৃত এই প্রথম অনুবাদটির দ্বারা। তাঁর অনুবাদটি গুরুদেব কর্তৃক অনুমোদিত ছিল বলে আমরা বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পারি।

"দেশ দেশ নন্দিত করি" গানটির ইংরেজি অনুবাদ পুস্তিকাটিতে মুদ্রিত থাকলেও অনুবাদটি যে কে করেছিলেন অন্য গানের মত তার সঠিক কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু অনুবাদের নীচে রচয়িতা হিসেবে গুরুদেবের নাম আছে। গানটি অগস্ট মাসে রচিত হবার পর, পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসের মডারন্ রিভিউ পত্রিকায়, The Day is Come নামে তার একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়। অনুবাদের নীচে ছিল গুরুদেবের নাম। সুতরাং কংগ্রেসের পুস্তিকার অনুবাদটি গুরুদেবেরই করা বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

এ বছরের অন্যান্য গানের তালিকার মধ্যে মূল হিন্দী গান সমেত হিন্দী-ভাঙা বাংলা গানের তালিকার অন্তর্ভুক্ত গান ক'টি হলো :—

বাঙ্গুরি মোরি মুর গেঁয়ি জিন ছুঁয়ো।
ইমনকল্যাণ-একতালা-মধ্যগতি।

প্যারি তেরে পাবানা পকারো, সব মেলি।
বেহাগ—ধামার-বিলম্বিত।

তুম বিনা কৈসো রহগী তে পিয়ু।
বাগেশ্রী-আড়াঠেকা-মধ্যগতি।

ফুলী বন ঘন মোর আয় বসন্ত রী।
বাহার—চৌতাল—দ্রুতগতি।

শম্ভু হরপদ যুগধ্যান বখানী নাথরঙ্গ।
তিলককামোদ-সুরফাক্তা-মধ্যগতি।

শঙ্কর শিব পিনাকী গঙ্গাধর
ইমনকল্যাণ-সুরফাক্তা-মধ্যগতি।

এই গানগুলি বিষ্ণুপু'রর প্রখ্যাত সঙ্গীতগুণী রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩১৪ সালে প্রকাশিত "সঙ্গীতমঞ্জরী" গ্রন্থে স্বরলিপি সহ মুদ্রিত আছে।

সুতরাং ১৩০৩ সালে এই গানগুলি গুরুদেব "সঙ্গীতমঞ্জরী" থেকে গ্রহণ করার সুযোগ পাননি, তা বিনা দ্বিধায় বলা চলে। বিষ্ণুপুরের ওস্তাদী ঘরের বংশপরম্পরায় সংগৃহীত এই গানগুলি গুরুদেব পেয়েছিলেন রামপ্রসন্নের সতীর্থ খ্যাতনামা সঙ্গীতগুরু রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছ থেকে।

রাধিকাবাবুর জন্ম ১২৭০ সালে। তাঁর পিতা জগৎচাঁদ গোস্বামী ছিলেন প্রখ্যাত মৃদঙ্গী। জগৎচাঁদের চার পুত্রের মধ্যে প্রথম পুত্র কৃত্তিবাস পিতার নিকট মৃদঙ্গ শেখেন, তৃতীয় পুত্র রাধিকা গোস্বামী এবং চতুর্থ পুত্র নকুলেশ্বর বা নকুলচন্দ্র গোস্বামী ছিলেন কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে পারদর্শী। নকুলচন্দ্র মৃত্যুর পূর্বে কিছুকাল শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতের শিক্ষকতাব কাজে নিযুক্ত ছিলেন। রাধিকাবাবু বাল্যে সঙ্গীত শিক্ষা সুরু করে ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছিলেন রামপ্রসন্নের পিতা অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র। পরবর্তী ১০ বছর সঙ্গীত সাধনা ও সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ২৫ বৎসর বয়সে কলকাতায় এসে আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে গুরুদেবের পরিবারেব সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। ১৩০৩ সালে খামখেয়ালী সভার এক অধিবেশনে রাধিকাবাবু গান গেয়েছেন, সঙ্গে মৃদঙ্গে সংগত করেছিলেন তাঁর দাদা কৃত্তিবাস গোস্বামী—সে খবর পেয়েছি—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ঘরোয়া" গ্রন্থে। ১৩০৪ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ভারত-সঙ্গীত সমাজে সঙ্গীতাচার্যের পদে নিযুক্ত হয়ে একটানা ৬ বৎসর কাজ করেছিলেন। ১৩১১ সালের ফাল্গুন মাস পর্যন্ত আদি সমাজের গায়ক হিসেবে কাজে নিযুক্ত থাকার খবর পাই, একটি সংবাদ থেকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৩১১ সালে (ইং ১৯০৫, ১৩ই ফেব্রুয়ারী) মৃত্যুর পর আদি ব্রাহ্ম সমাজের ট্রাষ্টিগণ সমাজের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করেছিলেন, তাব আচার্য ও সভাপতি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সম্পাদক গুরুদেব ববীন্দ্রনাথ। এই সংবাদে গায়কের দলে নাম পাই রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও শ্যামসুন্দর মিশ্রের। বাদক ছিলেন কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়। ১৩২৩ সালে রাধিকাবাবু কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আমন্ত্রণে সেখানকার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। কাশীমবাজারের এই বিদ্যালয়ে প্রায় ১৮ বছর তিনি কাজ করেন। ১৩৩১ সালের মাঘ মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বের তিন বছর তিনি ছিলেন কলিকাতার জমিদার ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষের দরবারের শিক্ষক রূপে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর সঙ্গে রাধিকাবাবুর কর্মজীবনের কিছু সংবাদ রেখে গেছেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তাঁর "পিতৃস্মৃতি" গ্রন্থে এ বিষয়ে লিখেছেন—

"আমাদের বাড়িতে সেকালে গানবাজনা সব সময়েই চলত। বৈঠকখানা ঘরে দাদা দ্বিপেন্দ্রনাথ (দিনেন্দ্রনাথের পিতা) ওস্তাদ নিয়ে আসর জমাতেন। তখনকার নামজাদা ওস্তাদরা তাঁর বৈঠকে সর্বদাই গান গাইতে আসতেন। রাধিকা গোস্বামী বাঁধা গাইয়ে ছিলেন ধ্রুপদ গাইবার জন্য।

"তাঁর (অমলা দাশ) গান গাইবার ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে বাবা তাঁকে রাধিকা গোস্বামীর কাছে হিন্দি গান শিখতে দিলেন। অল্পদিনেই ওস্তাদি গান শিখে নিলেন।"

"আমার অনুমান, এই গানগুলির সুর রাধিকাবাবুর কাছ থেকে বাবা নিয়েছিলেন।"

"মাঘোৎসব ছিল আমাদের বাড়িতে বছরের সব চেয়ে বড়ো ঘটনা। যতদিন মহর্ষি জীবিত ছিলেন খুব ঘটা করে এই উৎসব সম্পন্ন হত। মাঘোৎসবের আয়োজন এক মাস আগে থেকে শুরু হত, বিশেষত গানেব রিহার্স্যেল। বাবাকে প্রতি বছর নতুন গান রচনা করতে হত। গানে সুর বসানো হলে, রাধিকাবাবু বা অন্য কোনো গায়ককে বাবা শিখিয়ে দিতেন। তারপর রিহার্স্যেল চালাবার ভার নিতেন দ্বিপুদাদা। · বাবা যেবার বেদীতে বসে উপাসনা করতেন, তিনি নিজে কোনো গান গাইতেন না। একা গাইবার জন্য কয়েকটি গান দিদিদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। অমলা দিদি যতদিন ছিলেন, তার জন্য দুটি-একটি গান থাকতই।"

রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, মাঘোৎসবের জন্য গুরুদেব প্রতিবৎসর নতুন গান রচনা করতেন। এ-কথা ঠিক। এবারকার গানগুলির প্রায় সব ক'টিই যে ১৩০৩ সালের ১১ই মাঘের মাঘোৎসবে গাওয়া হয়েছিল—তা ১৮১৮ শকের (১৩০৩) ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের সান্ধ্যোপাসনার গানের তালিকা দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায়।

বেদগান

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

ব্রহ্মসঙ্গীত

১। সুন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল—ইমনকল্যাণ—সুরফাকতাল

২। শীতল তব পদছায়া—ইমনকল্যাণ—একতালা।

৩। আজি কোন্ ধন হতে—কেদারা—চৌতাল।
৪। আর কত দূরে আছে সে—হাম্বীর—তেওরা।
৫। আজি মম মন চাহে—বাহার—চৌতাল।
৬ হৃদয়ে জাগো আজি—হাম্বীর—ধামার।
৭ এ কী করুণা, করুণাময়—বাহার—আড়াঠেকা।
৮ আমার সত্য মিথ্যা সকলি—দেশ—একতালা।
৯ আজি হৃদি আসনে তোমারে কবি—বেহাগ—ধামার।
১০ কে যায় অমৃতধামযাত্রী—বেহাগ—চৌতাল।

হিন্দী গান অবলম্বনে বাঙলা গান রচনা করার সময়ে গুরুদেব প্রথমে হিন্দী গানটি খাতায় লিখে নিতেন। তারপর গাইয়েকে বলতেন গানটি বারে বারে গেয়ে শোনাতে। তখন মূল গানের সুরসহ কথার ছন্দ ও উচ্চারণ পদ্ধতি লক্ষ্য করে নিজের ভাবানুযায়ী বাঙলা কথাগুলি লিখে যেতেন। কথা-রচনার কাজ শেষ হলে গায়ককে সেই গানটি দিয়ে হিন্দী গানের সুর ও তালের সঙ্গে মিলিয়ে গাইতে বলতেন। খাতায় দুরকমে বাঙলা গানগুলি লেখা আছে। কতগুলি দেখি প্রথমে হিন্দী গানটি লিখে তার নীচে ভাঙা গানগুলি লিখেছেন। এ-দলের গান ক'টি হলো :

১। বাসুরি মোরি সুর সৈঁয়ি।
২। হরস জাগো লাল, লাল।
৩। শম্ভু হরপদ যুগধ্যান।
৪। শঙ্কর শিব পিনাকী।

অন্য গানের হিন্দী পংক্তির প্রতিটি শব্দের উপরে বাঙলা গানের শব্দগুলি লিখেছিলেন। এ-দলের গান হলো :

১। ফুলী বন ঘন মোর আয় বসন্ত শ্রী।
২। তুম বিনা কৈসো রহুগী তে পিয়ু।
৩। নয়ীরে মা বরণ কোয়েলিয়া।
৪। ঠাকুরিয়া আঁচরা মোঁয়ে ছাড়ি দে।
৫। প্যারি তেরে পাব্যানা পকারো।

কিভাবে বাঙলা শব্দগুলি উপরে লিখেছেন তার তিনটি নমুনা তুলে দিচ্ছি।

আজি মম মন চাহে জীবন বন্ধুরে।
১। ফুলী বন ঘন মোর আয় বসন্ত রী।

আজি হৃদি আসনেঁ তোমারে।
২। প্যারি তেরে পাবানা পকারো। ২

নিশিদিন জাগিয়া আছ নাথ হে।
৩। ঠাকুরিয়া আঁচরা মোরে ছাড়ি দে।

হিন্দী ও ভাঙা গানগুলির সঙ্গে ৭০ পৃষ্ঠায় "জাগো রে আজি জাগো রে তাঁহার সাথে" ৬ পংক্তির এই গানটি আছে, "তু কাঁহা পায়ো নয়ী তো" হিন্দী গানটির নিচে। বাঙলা গানটি সম্পূর্ণ কাটা। গানটি হলো :—

'জাগোরে আজি জাগোরে তাঁহার সাথে
সেই নিত্য জাগ্রত প্রেমভরে একাকী আনন্দ নিরমল অন্তরে
ভক্তি যোগাসনে
নির্নিমেষ প্রেমনেত্র জাগিছে যাঁর নিত্যকাল নির্বিকার
দিকে দিকে লোকে লোকে গগনে গগনে
অধো উর্দ্ধে নিত্যকাল।
সর্বজীবনে দেহ প্রাণে নিশ্বাস প্রশ্বাসে জাগিছেন নয়নে নয়নে
শয়নে স্বপনে।"

গানটি যে হিন্দী গান ভাঙা এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ৬৭ পৃষ্ঠায় "মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরূপ" বাঙলা গানটি যদিও ভাঙা গান কিন্তু মূল হিন্দী গানটি লেখা নেই। হিন্দী গানটি হলো "কৌনরূপ বনে হো"।

গুরুদেব রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছ থেকে যে-সব হিন্দী গান সংগ্রহ করে নিজের খাতাটিতে লিখেছিলেন, তার অনেকগুলিই পূর্বযুগের সঙ্গীতগুরুদের দ্বারা সংগৃহীত বা রচিত। রাধিকা গোস্বামীর নিজের সংগ্রহও কিছু এতে

আছে। এই কারণে রাধিকাপ্রসাদের সঙ্গীত, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা ১৯১৪ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত "সঙ্গীতমঞ্জরী" গ্রন্থে স্বরলিপি-সহ এর অধিকাংশ গানই পাওয়া যায়।' গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯১৭ সালের পূর্বে প্রকাশিত "সঙ্গীতচন্দ্রিকা"-য়ও কয়েকটি আছে। কিন্তু রাধিকা গোস্বামীর কাছ থেকে গুরুদেব কর্তৃক সংগৃহীত এবং অন্যান্য গ্রন্থে মুদ্রিত একই গানের মধ্যে পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। এ-থেকে বেশ বোঝা যায় যে, গায়কদের মুখে কথার পরিবর্তন হতো। রাধিকাপ্রসাদের মুখে গুরুদেব যেভাবে গানগুলি শুনেছিলেন, সেইভাবেই লিখে রেখেছিলেন। পরে, একই গান রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বা গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় যখন তাঁদের গ্রন্থে তা প্রকাশ করলেন, তখন তাঁদের উচ্চারণের প্রভাব তাতে দেখা গেল। বিষয়টি পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য গুরুদেবের খাতা, সঙ্গীতগ্রন্থ ও সঙ্গীতের পত্রিকা থেকে কয়েকটি গান নমুনা হিসেবে পর পর উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

১। গুরুদেবের খাতা। ১৩০৩।

বাঙ্গুরি মোরি মুর গৈয়ি জিন ছুঁয়ো
এ লঙ্গরবা করকি কলায়ী দোলন লাগ
নিভর ভরয়ে ঠানি ডারয়েরি।
সঙকালু গয়ী সব, ভুরামুর মুসাক গয়ী
সরকে ফরকে যে হা

"সঙ্গীতমঞ্জরী"। ১৩১৪।
(মধ্যগতি) ইমনকল্যাণ, একতালা।

বাঙুরি মোরি মোরে গয়ী, বিলে ছুঁয়া লঙ্গরবা।
করকে কলায়ী ভরুণ লাগী নিভর ভরজ ঠানি নিভর এরি।

সঙ্গকে লগরী, সব ছুরমুর মুরকায়ে গয়ী,
সরকে করকই হা।

২। গুরুদেবের খাতা। ১৩০৩।

প্যারি তেরে পাবানা পকাবো, সবমেলি
খেলিয়ে হো ফাগে
বুরিয়া বালমা চাহা ব্রজামে
তরুণী কৌন বিরাগে।
যাতহি গুরুকুল লাজনা বোরতা
সবকী বড়তা মে; কে অনুরাগা
একই ফাগুনা দুজে পিহারনা
তীজে কান্ত সোহাগা

"সঙ্গীত-মঞ্জরী"। ১৩১৪।
(বিলম্বিত) বেহাগ, ধামার।

আস্থায়ী

প্যারী তেরে পায়ন পকর্ব সব মিলি খেলিয়ে হো ফাগ।

অন্তরা।

বুরিয়া বালমা চিঁহে ব্রজমে, তরুণি কোনে বিরাগ।

সঞ্চারী।

যাতহিঁ গুরুকুল লাজন বোলত, সবকি বাঢ়ত মে কে অনুরাগ

আভোগ।

একহিঁ ফাগুন দুজে ব্রজবন তিজে কান্ত সোহাগ।

খাতার হিন্দী গানগুলির মধ্যে আছে সঙ্গীতগুণী যদুভট্ট-এর কয়েকটি গান। "সঙ্গীত-মঞ্জরী" ও "সঙ্গীত-চন্দ্রিকা(তে"ও গান ক'টি পাওয়া যায়।

১। গুরুদেবের খাতা। ১৩০৩।

শম্ভু শিব মহেশ আদি ত্রিলোচন
ভবভয় হর ভবেশ দীননাথ
জটাজুট পিনাক ডম্বু রুণ্ডমালা
গরল গলে ধর হর উড় বাঘাম্বর।

নাচত চন্দ্রভাল বোম্বোম্ ঘন ঘন বজ্র
অতি অপূর্ব হর গুণগাওয়ত ত্রিপুরেশ
বীরচন্দ্র নরপতি প্রকাশ কর নাথ
সু অধর ধরে সুমধুর তান সঁচি সুন্দর।

"সঙ্গীত প্রকাশিকা"। মাঘ। ১৩০৯

ছায়ানট—সুরফাক্তা।

শম্ভু শিব-মহেশ আদি ত্রিলোচন ভব-ভয়-হর ভবেশ
দীননাথ দানব-দলন দীনেশ্বর।
জটাজুট পিণাকী ভস্ম রুণ্ডমালা গরল গরে ধর হর
ওঢে বাঘাম্বর।
নাচত চন্দ্রভাল বোম্ বোম্ ঘেনে ঘেনে বাজে অতি অপূর্ব
হরগুণ গাওয়ত ত্রিপুরেশ্বর
বীরচন্দ্র নরপতি প্রকাশ কর নাথ সু-অধরে ধরে
সুমধুর তান সাঁচি সুন্দর।

"সঙ্গীত মঞ্জরী"। ১৩১৪।

(মধ্যগতি) ছায়ানট, সুরফাক্‌তাল।

আস্থায়ী

শম্ভু হর মহেশ, আদি ত্রিলোচন
ভব ভয় হর ভবেশ, দীন্‌নাথ দানবদলন, দিনেশ বর

অন্তরা।

জটাজুট পিনাকী ভস্মরুণ্ডমালা
গরল গরে রব হর, উড় বাঘাম্বর।

সঞ্চারী।

নাচত চন্দ্রভাল, বোম্ বোম্ বাজে ঘন ঘন,
অতি অপূর্ব হরিগুণ গাওত ত্রিপুরেশ।

আভোগ।

বীরচন্দ্র নরপতি প্রকাশ করণ, সো অধর ধরে
সুমধুর তান, গাঁচ সুন্দর

গুরুদেবের খাতা। ১৩০৩।

শম্ভু হরপদ যুগ ধ্যান বখনী নাথরঙ্গ
তেরি কিরতন দিনায়না, গাওত জনসমাজ
জয় ত্রিপুর নাথ দয়াল বীরচন্দ্র
গুণিজন প্রতিপালক দাতা।

"সঙ্গীত-মঞ্জরী"। ১৩১৪।

(মধ্যগতি) তিলক কামোদ, সুরফাক্‌তাল।

আস্থায়ী।

শম্ভু হরপদ যুগ ধ্যানি, বাখানি নাথ রঙ্গ
তেরি কিরতন দিনরয়না, গাবত জনসমাজ

অন্তরা।

জয়তি ত্রিপুরনাথ দয়ালবীরচন্দ্র গুণিগণ প্রতিপালক
তু সমান দাতা কহি নাহি হো রাজ।

এ-দুটি, ত্রিপুরারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের উদ্দেশ্যে যদুভট্টের বন্দনা গান। যে-কারণে মহারাজা বীরচন্দ্রের নাম এতে স্থান পেয়েছে। গান দুটি যদুভট্ট রচনা করেছিলেন ত্রিপুরার রাজদরবারের অন্যতম সভাগায়ক হিসেবে নিযুক্ত থাকাকালে। যদুভট্টের গুণপনায় সন্তুষ্ট হয়ে মহারাজ বীরচন্দ্র তাঁকে "তানরাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন।

আমরা জানি, যদুভট্ট ১৮৭৫ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময়ে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্রদের জন্য একটি অবৈতনিক সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। যদুভট্ট সেখানে রবিবার ও বুধবার ব্যতীত অন্যান্য দিনে সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তিনি বেশি দিন একাজে থাকতে পারেননি। ত্রিপুরার দর-বারের গায়ক হিসেবে নিযুক্ত হয়ে আগরতলায় যান। মহারাজ বীরচন্দ্র তখন ত্রিপুরার রাজা। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৮৬২ থেকে ১৮৯৬ সাল। যদুভট্ট ১৮৮৫ সালের কিছু পূর্বে আগরতলা ত্যাগ করে বিষ্ণুপুরে অসুস্থ অবস্থায় ফিরে আসেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ৪৫ বৎসর বয়সে। বাঁকুড়া জেলার পঞ্চকোট রাজের কাছ থেকে যদুভট্ট পেয়েছিলেন "রঙ্গনাথ" উপাধি। এই

উপাধিটির প্রতি তাঁর অধিক আকর্ষণ থাকায় "রঙ্গনাথ" বা "নায়ক" শব্দ দুটি নিজের গানের ভণিতা হিসেবে তিনি প্রায়ই ব্যবহার করতেন। উপরোক্ত গানে এ-দুটি ভণিতাই তিনি রেখেছেন।

যদুভট্টের আর একটি গান ভেঙে গুরুদেব রচনা করেছিলেন, "মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ"। এটি মোট দু-কলির গান। মূল হিন্দী গানটি খাতায় লেখা নেই। কিন্তু গানটি পাওয়া যায় "সঙ্গীত মঞ্জরী" গ্রন্থে মোট চার কলির গানরূপে।

খাতায় লিখিত গুরুদেবের গান—

মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ
শোভন সভা নিরখি মনপ্রাণ ভুলে
নীরব নিশি সুন্দর বিমল নীলাম্বর
শুচিরুচির চন্দ্রকলা চরণ মূলে ॥

"সঙ্গীত-মঞ্জরী"তে মুদ্রিত (১৩১৪) মূল হিন্দী গান।

(মধ্যগতি) তিলক কামোদ, ঝাঁপতাল।

আস্থায়ী।

কবন রূপ বনি হো রাজাধিরাজ,
আজু নৈ নিরখি রঙ্গনাথ গাবে।

অন্তরা।

ত্যাজি অগুরুচন্দন, বিভূতি অঙ্গ ভূখন,
জটা মুকুট কৈসি বনি আবে।

২য় অন্তরা।

কৈসি মুখমণ্ডল, ঝলস শ্রুতি কুণ্ডল,
ভই চন্দ্রভালে মৃগছাল পাবে।

৩য় অন্তরা।

বরজিবর অম্বর, পহন বাঘাম্বর
শীষপর গঙ্গাধর ধরসি ধাবে॥

তানসেন-ভণিতাযুক্ত "ভৈরবী" ও "ললিত" রাগিণীর দুটি হিন্দী গান খাতায়

পাওয়া গেছে।" ভৈরবী রাগিণীর গানটিকে বাংলায় রূপান্তরিত করার কাজে হাত দিয়ে গুরুদেব তার প্রথম পংক্তির উপর "আনন্দ ঊষাকালে মঙ্গল রবি" পংক্তিটিই মাত্র লিখেছিলেন। বাকি পংক্তি কটির উপর আর কিছু নেই। অন্যেরা ইন্দিরা দেবীর "ত্রিবেণী সংগম" বইটির সাহায্যে জানা যাচ্ছে যে, এটি সুরফাক্তালের একটি ধ্রুপদ গান এবং এটি ভেঙেই গুরুদেব রচনা করেছিলেন "আনন্দ তুমি স্বামী মঙ্গল তুমি" গানটি। "আনন্দ ঊষাকালে মঙ্গল রবি" পংক্তিটিকে ঐ গানের প্রাথমিক রূপ বলে ধরে নিতে পারি। "আনন্দ তুমি স্বামী মঙ্গল তুমি" গানটি পাওয়া যায় ১৩০৯ সালের গানের দলে। খাতায় প্রাপ্ত তানসেন রচিত হিন্দী গান।—

ভৈরবী।

ওঙ্কার মহাদেবা শঙ্কর তুমা
সকল কলা পূরণ করাত আশ।
নিহ চহি ধরত ধ্যান, সুমরণ কর মান,
দেখত দর্শন গয়ি প্রাশ।
হর দুখ দ্বন্দ্ব, শোহত জট গঙ্গা
রুণ্ডমাল পন্ন শোহ বাঘাম্বর বাস,
তানসেন সেবক ভাবত মম ইষ্ট
ফাল পাবে হোয়ক, দাস নিবাস।

বিষ্ণুপুরের ওস্তাদদের সুপরিচিত গ্রন্থগুলিতে এ গানটি এখনো পাওয়া যায়নি। মনে হয়, গানটি একমাত্র রাধিকাপ্রসাদই জানতেন।

ললিত রাগিণীর দ্বিতীয় গানটি ভেঙেই গুরুদেব "পান্থ এখন কেন অলসিত অঙ্গ" রচনা করেছিলেন। মূল গানটি গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১৯১৭ সালের পূর্বে প্রকাশিত "সঙ্গীত-চন্দ্রিকা"র প্রথম খণ্ডে স্বরলিপি সহ মুদ্রিত আছে। তানসেন-ভণিতাযুক্ত গুরুদেবের হাতে লেখা হিন্দী গানটি হলো :—

ললিত।

যখে যুগত জো গাবে বাজাবে
তাল মান সুর সঙ্গত আবে।
দুগুণ ত্রিগুণ চৌগুণ সো ভেদ বাজাবে
সব লাগ ডাট প্রমাণ সো আবে।

অপন মুখ্‌ত গুনী কহু রে
তাল মান সুর `গেয় ন পাবে।
তান সেন কহো বে গুনিয়ন
ছত্রপতী অকবর সায়ে সুঝায়ে।

"সঙ্গীত-চন্দ্রিকা"—১ম/ভাগ।

ললিত—সুরফাক্তা।

আস্থায়ী—রঙ্গ ধ্রুগত সোঁ গাবে বজাবে
তাল মান সুর সঙ্গত আবে।
অন্তরা—দ্বিগুণ ত্রিগুণ চৌগুণ সো ভেদ বতাবে,
যব লাগডাট প্রমাণ দেখাবে।
সঞ্চারী—অপনা মুখ তেঁ গুণী কহাবে
তাল মান কে বেবর পাবে।
আভোগ—তান সেন কহে হোয়ে গুণীয়ন
ছত্রপতি অকবর কো রিঝাবে॥

গুরুদেবের খাতার বেশীর ভাগ গানে রচয়িতাদের নাম বা "ভনিতা" পাওয়া যায় না। "সঙ্গীতমঞ্জরী" ও "সঙ্গীত-চন্দ্রিকা" গ্রন্থেও এ ধরনের গান বহু আছে। এর কারণ যে কী তা জানি না।

খাতা থেকে জানা যায় যে, ১৩০৪ সালের ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পতিসরে গুরুদেব অনেকগুলি প্রেম ও কয়েকটি ঋতু পর্যায়ের গান রচনা করেছিলেন। এ-গানগুলির অধিকাংশের নিচে রচনার তারিখ ও স্থানের উল্লেখ আছে। তালিকার শেষদিকে পূজা পর্যায়ের গানও কয়েকটি পাই। গান ক'টি হিন্দী-ভাঙা। কিন্তু কোন্ সময়ে বা কোথায় বসে রচনা করেছিলেন তার কোনো উল্লেখ নেই অন্য গানের মত। সময় ও স্থানের উল্লেখ না থাকলেও অন্যান্য তথ্যের সাহায্যে এ গানের সময় মোটামুটিভাবে বার করা সম্ভব হয়েছে। ১৩০৪ সালের গানের তালিকা:—

১। কেন ধরে রাখা, ও যে যাবে চলে।
২। বৃথা গেয়েছি বহু গান (মিশ্রকানাড়া। ২৬ ভাদ্র। ১৩০৪)
৩। কেন বাজাও কাঁকণ কনকন।
৪। হেরি নবীন শ্যামল ঘন। (৬ই আশ্বিন। ইছামতী; বজরালোকা)

৫। এবার চলিনু তবে। (৭ই আশ্বিন। ১৩০৪। ইছামতী)

৬। যামিনী না যেতে জাগালে না। (৭ই আশ্বিন। ১৩০৪। যমুনা নদী)

৭। (বন্ধু) কিসের তরে অশ্রু ঝরে। (৭ই আশ্বিন ১৩০৪। বড়ল নদী)

৮। আমি কেবলি স্বপন করেছি। (বেহাগ, ঝাঁপতাল। ৮ই আশ্বিন। ১৩০৪। বলেশ্বরী)

৯। ভালবেসে সখী কোমল যতনে। (৮ই আশ্বিন। ১৩০৪। সাহাজাদপুর)।

১০। তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা। (ইমনকল্যাণ।—৯ আশ্বিন। ১৩০৪। চলনবিল ; ঝড়বৃষ্টি)

১১। যদি বারণ কর তবে। (ছায়ানট। ৯ই আশ্বিন। ১৩০৪। চলনবিল) (দিনে দু'তিনবার করে ঝড় হচ্ছে। , বোট টলমল)

১২। আমি চাহিতে এসেছি। (কালাংড়া। ১০ই আশ্বিন। নাগর নদী)

১৩। সখি প্রতিদিন হায়। (আলেয়া। ১০ই আশ্বিন। ১৩০৪। নাগর নদী) (মেঘবৃষ্টি। শনিবার। অমাবস্যা)

১৪। বিধি ডাগর আঁখি যদি। (ভৈঁরবী, ঝাঁপতাল। ১০ই আশ্বিন। নাগর নদী)

(ধানের ক্ষেতের ভিতর)

১৫। বঁধু মিছে রাগ কোরো না। (বারোয়াঁ, মূলতান। ১০ই আশ্বিন। পতিসর)

১৬। ওগো কাঙাল আমারে। (১২ই আশ্বিন। পতিসর)

১৭। একি সত্য, সকলি সত্য। (১৩ই আশ্বিন। রেলপথে)

তারিখহীন গান :—

১। নিত্য সত্যে চিন্তন করো রে।

২। কে বসিলে আজি।

৩। উঠি চল সুদিন আইল

৪। লহ লহ তুলি লহ হে।

এই তালিকা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ১৩০২ সালের আশ্বিন মাসের

মত এ বছরেও তিনি নিজের প্রেরণায় ১৫টি গান রচনা করেছেন। সেবারে অমলা দেবী এসে শিলাইদহে ছিলেন। নতুন গান রচনায় গুরুদেবকে তিনি উৎসাহিত করেছেন, গান গেয়ে ও গান শিখে। এবারে পুত্র কন্যা পরিবার ও পরিজন সহ তিনি শিলাইদহে ছিলেন কিনা তার সঠিক কোন খবর জানা যাচ্ছে না। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পিতৃস্মৃতি" গ্রন্থের একটি বিবৃতি থেকে এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত মেলে। রথীন্দ্রনাথ বলছেন :—

"লেখার ফাঁকে ফাঁকে যখন বাবাকে গানে পেয়ে বসত—অমলা দিদিকে কলকাতা থেকে নিয়ে আসতেন। দিনের বেলায় অমলা দিদি মায়ের সঙ্গে রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।...সন্ধ্যে হলেই, অন্য-সব কাজ ফেলে গান শোনবার জন্য সবাই সমবেত হতেন। মাঝিরা জলিবোটটা বজরার গায়ে বেঁধে নিয়ে যেত। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে জানালা টপ্‌কে সেই বোটটাতে গিয়ে বসতুম। সুরেনদাদার হাতে এস্রাজ থাকত। জলিবোট খুলে মাঝ-দরিয়ায় নিয়ে গিয়ে নোঙর ফেলে রাখা হত। তারপর শুরু গান—পালা করে বাবা ও অমলা দিদি গানের পর গান গাইতে থাকতেন।... সে-সব রাত আজ স্বপ্নের মতো মনে হয়, কিন্তু আজও যখন

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে...

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা,

প্রভৃতি গান শুনি, সেই-সব রাত্রির কথা মনে পড়ে যায়..

দ্বিতীয় গানটি ১৩০৪ সালের আশ্বিনে জমিদারীর চলনবিল অঞ্চলে রচিত। প্রথমটি বেশ কয়েক বছরের পুরোনো। উপরোক্ত বর্ণনা ও গানটির সূত্রে বলা চলে যে, গুরুদেবের সঙ্গে মৃণালিনী দেবী, অমলা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গুরুদেবের পুত্রকন্যারা সকলেই ১৩০৪ সালের আশ্বিন মাসে পতিসরে ছিলেন। বোধহয় অমলা দেবীর উপস্থিতিই পুনরায় গুরুদেবকে গান রচনায় এবারেও উৎসাহ যুগিয়েছিল।

"বৃথা গেয়েছি বহু গান"—প্রথমে যেভাবে রচনা আরম্ভ করে কেটে দিয়েছিলেন, তা হলো :—

বৃথা গেয়েছি বহু গান,
কোথা সঁপেছি মন প্রাণ
হইল দিবা অবসান।
নীরব নিশা ধীরে ধীরে

আঁধারে সকল দিক ঘিরে,—
মহাসাগর বালুতীরে
ধূ ধূ করিছে এ শ্মশান।

এ পর্যন্ত গানটি লিখে, কেটে দিয়ে পর পৃষ্ঠায় সংশোধন করে লিখলেন :—

(মিশ্র কানাড়া)

গেয়েছি বৃথা বহু গান।
সঁপেছি কোথা মন প্রাণ!
তুমি ত ঘুমে নিমগন
আমি জাগিয়া অনুখন,
আলসে তুমি অচেতন
আমারে দহে অপমান।
যাত্রী সবে তরী খুলে
গেল সুদূর উপকূলে ;—
মহাসাগর তটমূলে
ধূ ধূ করিছে এ শ্মশান!
কাহার পানে চাহ কবি
একাকী বসি ম্লান ছবি
অস্তাচলে গেল রবি
হইল দিবা অবসান।

আশ্বিন মাসের প্রথম দিকে "কেন বাজাও কাঁকন কত ছল ভরে" রচনা করেছিলেন।' এ গানটির বিষয়ে লিখিত একটি অতি প্রয়োজনীয় উক্তি আমরা পাই। গুরুদেব লিখছেন :—

"প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন। 'কেন বাজাও কাঁকন কন-কন কত ছল ভরে'—এতে যা প্রকাশ পাচ্ছে তা কল্পনার রূপলীলা।"

এই রূপলীলার প্রয়োজন হয় কেন, সেকথা বুঝিয়ে বলতে গিয়ে অন্যত্র লিখছেন :—

"অধিকাংশ ভাবই আমাদের কাছে পুরাতন; এবং আমাদের মনের ধর্মই এই যে—পুরাতন অভ্যস্ত জিনিসগুলির সম্পূর্ণ সৌন্দর্য এবং রস আমাদের অনুভব করবার ক্ষমতা নেই—সেইজন্যে কোনো কবি যখন পুরাতন ভাবের মধ্যে তাঁর ছন্দ এবং বলবার নতুন ধরনের দ্বারা আমাদের মনকে আকর্ষণ করে আনে তখন আমরা নতুন করে সেই জিনিষটির আসল রসটুকু আস্বাদন করতে পারি —তখন চিরকেলে শোনা কথাটা নতুন সংগীতে কানের মধ্যে মনের মধ্যে বাজতে থাকে। কবিদের একটা প্রধান কাজ, পৃথিবীটাকে সর্বদা তাজা রেখে দেওয়া— গাছের সবুজ, আকাশের নীল, সন্ধ্যাবেলাকার সোনালি, সমস্ত এতদিনে ধুলো পড়ে অনেকটা ম্যাড়্মেড়ে হয়ে আসত, যদি না কবিরা সর্বদাই তার উপরে আপনাদের কল্পনাপাত করে আসত। মানুষের মনটা চিন্তার তাপে শীঘ্র শীঘ্র পেকে যায় বলে কবিত্বর কাজ হচ্ছে কল্পনার অমৃত সিঞ্চন করে তাকে অনন্তকাল সজীব সরস করে রাখা। সে নতুন জিনিষ কিছুই দেয় না, সে কেবল মনটাকে নতুন করে রাখবার চেষ্টা করে।"

গানটির প্রাথমিক রূপ হলো :—

কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছল ভরে
ওগো ঘরে ফিরে চল কনক কলসে জল ভরে।
কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি (কর খেলা ছলছল)
কেন চাহ খনে খনে চকিত নয়নে কার তরে কত ছল ভরে।
হের যমুনা বেলায় আলসে হেলায় গেল বেলা
যত হাসি ভরা ঢেউ করে কানাকানি কলস্বরে।
হের নদী-পরপারে গগন কিনারে মেঘমেলা,
চাহে হাসিয়া হাসিয়া গোপনে তোমারি মুখ পরে কত ছল ভরে।

উপরের তৃতীয় পংক্তির 'কর-খেলা' এবং 'ছল ছল' শব্দ দুটিই কাটা আছে। কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থ প্রকাশ কালে 'কর খেলা' শব্দটি রাখা হয়েছে। "হেরি নবীন শ্যামল ঘন নীল গগনে" গানটির এই পংক্তিটি গ্রন্থে সংশোধন করে লেখা হয়েছে, "হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে"। খাতায় লিখিত গানটি হলো :—

হেরি নবীন শ্যামল ঘন নীল গগনে,
সেই সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে

সেই অধর করুণা মাখা মিনতি বেদনা আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা বিদায়-খনে ;
হেরি নবীন শ্যামল ঘন নীল গগনে।
আজি ঝর ঝর ঝরে জল বিজুলি হাসে
বনে পবন মাতিয়া ওঠে পাগল গানে।
মম গোপন পরাণপুটে কোনখানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা বেজে উঠে হৃদয় কোণে !
হেরি নবীন শ্যামল ঘন নীল গগনে।

গানটির প্রথম পংক্তি-কে করেছিলেন :—

"হেরি সঘন মেঘমালা গগন কোণে,"
"হেরি সঘন নীরদমালা গগন কোণে।"

—তা কেটে দিয়েছিলেন।

বিভাস ও একতালায় রচিত "বন্ধু ! কিসের তরে অশ্রু ঝরে", গানটি খাতায় আছে মোট ছয় কলির গান রূপে, কিন্তু পরবর্তী সঙ্গীতগ্রন্থে গানটি মুদ্রিত হয়েছে ষোল কলিতে। বাকি দশ কলি "কল্পনা" কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কালে যুক্ত হয়েছে, ১৩০৩ সালে রচিত "(ওগো) ভাগ্যদেবী পিতামহী, মিটিল তব আশ !" গানটির সঙ্গে এ গানেব ভাবগত ঐক্য লক্ষ্য করার মত। গানটি যে কি সুরে গাওয়া হতো তা আজ কারোই জানা নেই। খাতায় লিখিত ঐ গানটি এখানে উদ্ধৃত করছি।—

(বন্ধু) কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের আশে দীর্ঘশ্বাস !
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
রিক্তহস্ত সর্বহারা,
বিশ্বে সর্বজয়ী তারা
ভাগ্যলক্ষ্মী গর্বময়ীর নয়কো তারা ক্রীতদাস !
আমরা সুখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি
আমরা দুখের বক্রমুখের চক্র দেখে ভয় না করি
ভাঙা ঢাকে যথাসাধ্য
বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ।

হে অলক্ষ্মী রুক্ষকেশী তুমি দেবী অচঞ্চলা।
সরল তোমার রীতি নীতি নাহি জান ছলাকলা।
আমরা বরপুত্র তব
যাহা দিবে তাহাই লব,
দিব তোমার জয়ধ্বনি, মাথায় বহি সর্বনাশ।

উপরোক্ত তালিকার ১৩ নম্বরের "সখি প্রতিদিন হায়" গানটির রচনার কারণ সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী তাঁর জীবনকথা-য় লিখেছেন ;—

"বাঙালীর মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যখন বুড়ি হবার মেয়াদ কুড়িকে অনেকদূর পর্যন্ত ছাড়িয়ে গিয়েছি, এবং আধা বিলাতী স্ত্রী-স্বাধীনতা অনেকদিন হল লাভ করেছি, তখন ঐতিহাসিক সত্যরক্ষার্থে স্বীকার করতেই হবে যে আমার পাণিগ্রহণের আগে পাণিপ্রার্থীর অভাব ছিল না। সব চেয়ে 'রোমাঞ্চকর' পূর্বপাত্র ছিলেন একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি, যিনি অনেকদিন ধরে আমাদের ফটকের ওপারে মাঠের এক গাছতলায়, আমাকে দেখবার জন্য, এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। পরে তাঁর নাম জানতে পারি এবং তাঁর দিদি, ভাইয়ের হয়ে, আমাদের বাড়ী বলতেও এসেছিলেন শুনেছি, কিন্তু বলা বাহুল্য আমাদের কারোরই এ সম্বন্ধ মনোনীত হল না। রবিকাকা এই পরিস্থিতি অবলম্বনে "সখি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায়" গানটি রচনা করেন।"

এ পর্যায়ের বাকি গানগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু পাঠান্তর আছে, কিন্তু তা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখযোগ্য নয় বলে মনে করি। আশ্বিনের ১৩ তারিখে রেলপথে রচিত "এ কি সত্য সকলি সত্য" গানটির পর তারিখহীন যে পাঁচটি গান পাচ্ছি, তার চারটি হলো পূজা পর্যায়ের হিন্দী-ভাঙা গান, একটি স্বদেশ পর্যায়ের। প্রথমটি "নিত্য সত্যচিন্তন করো রে বিমল হৃদয়ে।" মূল হিন্দী গানটি রচনা করেছিলেন বিহারের সঙ্গীতরসিক জমিদার "মহারাজা আনন্দ কিশোর"। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত-চন্দ্রিকার ২য় খণ্ডে গানটি আছে। গুরুদেব তাঁর খাতায় হিন্দী গানটি প্রথমে লিখে, তার প্রতি পংক্তির প্রতি শব্দের উপরে বাঙলা কথা লিখেছিলেন। খাতায় লিখিত হিন্দী গানটির প্রথম পংক্তি হলো "কালী নাম চিন্তন করোয়ে মেরে মন"। শরীমিয়ার পাঞ্জাবী টপ্পা ভেঙে রচনা করলেন "কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু।"

এ যুগের শ্রোতাদের কাছে গানটি খুবই পরিচিত। গানটির স্বরলিপি "সঙ্গীতবিজ্ঞান পত্রিকা'-র ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় আছে। গানটির প্রথম পংক্তি হলো, "যে পরি জা তাড়ে তাড়ে পর।" গানটি খাতায় নেই। তৃতীয় তাড়া, গানটির প্রথম পংক্তি—"উঠি চল সুদিন আইল আনন্দ সৌগন্ধ উচ্ছসিল।" গানের কথাগুলি হিন্দী গানের প্রতি 'শব্দের উপরে না লিখে পুরো গানটি নিচে লিখেছেন। খাতায় লিখিত হিন্দী গান :—

"উঠি চল সুদিন্নাচতরি আলী
হু' আয়ী তো হেলেন।
ল্যলন্ তেরি আরতি করতি তুয়া
সুন্দর নটনাগর নারী।"

১৩১২ সালের "সঙ্গীত প্রকাশিকা" পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় গানটি স্বরলিপি সহ মুদ্রিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত গানটির কথায় কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

"উঠি চল সুধি নাচত রি আলি হু
আইতো হেলেন।
লালন তেরি আরতি করত তুয়া
সুন্দর নটনাগর।
সুধি নাচতরি আলি হু
আইতো হেলেন।"

বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতগুরু রামপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক, ১৩১৪ সালে প্রকাশিত "সঙ্গীত মঞ্জরী" গ্রন্থের ৩০৪ পৃষ্ঠায়, এই গানটি যে ভাবে স্বরলিপির সঙ্গে মুদ্রিত আছে, তা হল,—

" (মধ্যগতি) কেদারা, সুরফাক্তাল।
আস্থায়ী।
উটি চলে সুদিন নাচতরে আলি হু
আয়ি তো হেলিনে।
অন্তরা।
লালন তেরি, আরতি করতি তুয়া,
সুন্দর নট নাগর নারী সুদিন নাচত রে
আলি হু
আয়ি তো হেলিনে।"

খাতার চতুর্থ গান—

"লহ লহ তুলি লহ হে ভূমিতল হতে
ধূলিম্লান এ পরাণ, রাখ তারে কৃপাচোখে
রাখ তাবে স্নেহ করতলে।
রাখ তারে আলোকে, রাখ তারে অমৃতে
রাখ তারে নিয়ত কল্যাণে।"

এটিও একটি হিন্দী-ভাঙা গান, কিন্তু মূল গানটি খাতাতে নেই। ১৩০৪ সালের মাঘোৎসবে এটি গাওয়া হয় কথার সামান্য পরিবর্তনের পর। যেমন—

(রাগিণী আড়ানা। তাল কাওয়ালি।)

"লহ লহ তুলি লহ হে ভূমিতল হতে ধূলিম্লান এ পরাণ,
রাখ তব কৃপা চোখে, রাখ তব স্নেহ করতলে।
রাখ তারে আলোকে, রাখ তাবে অমৃতে,
রাখ তারে নিয়ত কল্যাণে, রাখ তারে কৃপাচোখে,
রাখ তারে স্নেহ করতলে ॥"

১৮১৯ শকের (১৩০৪ সাল) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাঘোৎসবের সান্ধ্যো-পাসনার গানের তালিকা দেখলে জানা যায় যে, উপরোক্ত ভাঙা গানগুলির সবই গুরুদেব রচনা করেছিলেন এই উপাসনার কথা ভেবে।

১৩০৪ সালের মাঘোৎসবের গান—

১। উঠি চল সুদিন আইল—কেদারা, একতালা।
২। এস হে এস, বরেণ্য সুমহান—মিশ্রসুরট, সুরফাঁকতাল।
৩। ভক্তহৃদবিকাশ প্রাণ বিমোচন—ছায়ানট, সুরফাঁকতাল।
৪। কে বসিলে আজি—সিন্ধু, আড়াঠেকা।
৫। সুধা সাগর তীরে হে—সাহানা, ধামার।
৬। নিত্য সত্য চিন্তন কর রে—আড়ানা, ঝাঁপতাল।
৭। লহ লহ তুলি লহ হে—আড়ানা, কাওয়ালি।
৮। বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ—লচ্ছাসার, ঝাঁপতাল।

তালিকায় দ্বিতীয় গানটি গুরুদেবের নয়। "সুধা সাগর তীরে হে" গানটি খাতায় নেই। এটিও হিন্দী-ভাঙা গান। 'সঙ্গীতমঞ্জরী' গ্রন্থে মূল গানটি আছে।

তার প্রথম পংক্তি হলো—"আয়ো ফাগুন বাড়ো মান, নন্দকো ছয়লা ডোলে গোকুল কি ডগর।" অমলা দাশকে দিয়ে উপাসনায় গাওয়ানো হয়েছিল চতুর্থ গান "কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে"। রাধিকা গোস্বামী তাঁকে শিখিয়েছিলেন।

খাতায় প্রাপ্ত ১৩০৪ সালের শেষ গান হলো, "কে এসে চলে যায় ফিরে।" এটি একটি জাতীয় সঙ্গীত। তারিখ নেই এতে, কিন্তু ১৩০৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় "বীণাবাদিনী" পত্রিকায় স্বরলিপি সহ গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গুরুদেবের খাতায় প্রাপ্ত গানটির প্রথম কলিতে আছে :—

"কে এসে চলে যায় ফিরে
আকুল নয়নের নীরে।"

চতুর্থ কলির পংক্তি :—

"পুণ্য কুটীরে বিষণ্ণ
কে বসে সাজাইয়া অন্ন।
স্নেহের উপহার
রুচে না মুখে আর,"

"বীণাবাদিনী" পত্রিকায় এ-দুটি কলিতে সামান্য পরিবর্তন করা হয়।

প্রথম কলি :—

"কে এসে যায় ফিরে ফিরে, আকুল নয়ন-নীরে"

চতুর্থ কলি :—

"পুণ্য কুটীরে বিষণ্ণ, কে বসি' সাজাইয়া অন্ন
সে স্নেহ-উপহার রুচে না মুখে আর,"

১৩১০ সালের কাব্য গ্রন্থাবলীর "গান" খণ্ডে এর কথায় আর একবার বদল ঘটে।

প্রথম কলিতে :—

'কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়নের নীরে?"

চতুর্থ কলিতে :—

"বিরল কুটীরে বিষণ্ণ কে বসে সাজাইয়া অন্ন?"

খাতায়, এর পরে আছে, "তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়, কোন্ খানেরে কোন্ পাষাণের ঘায়।" ১৩০৭ সালের "চিরকুমার সভা" উপন্যাসের জন্য এ-গানটি রচিত। উপন্যাসের 'বিপিন' গানটি গেয়ে শোনাচ্ছে 'রসিক'-কে। "চিরকুমার

সভা"-য় ব্যবহৃত একটি সংস্কৃত শ্লোকের বাঙলা অনুবাদও এ খাতায় পাওয়া গেছে। সেটি:—

"কুঞ্জকুটীরের স্নিগ্ধ অলিন্দের পর
কালিন্দী কমলগন্ধ বহিবে সুন্দর,
মুদিত নয়না লীনা তব অঙ্কতলে,
বাসন্তী সুবাস উঠে এলান কুন্তলে ;
তাঁহার করিব সেবা, সে দিন কি হবে,
কিসলয় পাখাখানি দোলাইব যবে ?"

সামান্য সংশোধনের পর উপন্যাসে শ্লোকটি মুদ্রিত হলো :—

"কুঞ্জকুটীরের স্নিগ্ধ অলিন্দের পর
কালিন্দী কমলগন্ধ ছুটিবে সুন্দর ;
লীনা রবে মদিরাক্ষী তব অঙ্কতলে,
বহিবে বাসন্তীবাস ব্যাকুল কুন্তলে।
তাঁহারে করিব সেবা, কবে হবে হায়,
কিসলয় পাখাখানি দোলাইব গায় ?"

বাঙলা-অনুবাদটির পরেই খাতায় তিনটি সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া গেছে। তার প্রথমটি :—

"নিবিষ্টঃ পল্যাঙ্কে মৃদুলতর তুলীধবলিতে
আনন্দং পূর্ণেন্দু প্রতিমমুপধানং প্রমুদিতো নিধায়াগ্রে"

দ্বিতীয় :—

"বহন্তী সিন্দুরং প্রবল কবরী ভার তিমির
দ্বিষাং বৃন্দৈর্বন্দী কৃতমিব নবীনার্ক কিরণং
তনোতু ক্ষেমং ন স্তব বদন সৌন্দর্য্য লহরী
পরীবাহ স্রোতঃ সরনিরিব সীমন্ত সরণিঃ।"

তৃতীয় :—

"স্মিতজ্যোস্নাজালং তব বদন চন্দ্রস্য পিবতাং
চকোরাণাং আসীদতি রসতয়া চঞ্চুজড়িমা।"

হয়তো ১৩০৭ সালে "চিরকুমার সভা"র জন্যই এ-ক'টি শ্লোক গুরুদেব সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু ব্যবহার করেননি।

"তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়" গানটির পরেই আছে :—

"দুইটি হৃদয়ে একটি আসন
পাতিয়া বস হে হৃদয়নাথ"

১৩০৭ সালের বৈশাখে প্রকাশিত "কল্পনা" কাব্যগ্রন্থে এই গানটি মুদ্রিত হয়েছে "বিবাহমঙ্গল" নামে। রবীন্দ্ররচনাবলীর বিশ্বভারতী-সংস্করণ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্মশতবার্ষিক সংস্করণে এ গানটিকে বলা হয়েছে, ১৩০৪ সালের। কিন্তু, এই বছরে কার বিবাহ উপলক্ষ্যে এটি রচিত, তার কোনো সংবাদ নেই। খাতায় "চিরকুমার সভা"র গানটির পরেই এটি থাকায় এবং গুরুদেবের আপন ভাইপো ঋতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বছরের আষাঢ় মাসে বিবাহের সংবাদে, গানটি ১৩০৭ সালের বলেও মনে করা যেতে পারে। এ-ছাড়া, রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত, শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবীর ১২৯৯ সালের "গানের বহি" গ্রন্থে দেখা যায় যে, পিছনের স্বতন্ত্র কাগজে ১৩০০ সাল থেকে ১৩০৪ সাল পর্যন্ত রচিত যে গানগুলি গুরুদেব নিজের হাতে লিখে রেখেছিলেন তার মধ্যে "কল্পনা"-র "বিবাহ-মঙ্গল" গানটি নেই। আরো তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত এ গানটি যে কখন লিখেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়।

পূর্বেই বলেছি যে, পুরো খাতাটিতে এ পর্যন্ত যতগুলি পূজা পর্যায়ের হিন্দী-ভাঙা বাঙলা গান পাওয়া গেছে তার একটিতেও রচনার তারিখ দেওয়া নেই, কিন্তু দেখা গেছে যে, তারিখ বসানো অন্যান্য গানের কাছাকাছি পৃষ্ঠায় লেখা এই গানগুলির প্রায় সবই একই বছরের মাঘোৎসবের উপাসনার গানের তালিকায় স্থান পেয়েছে। মাঘোৎসবের গান রচনা ও তার প্রস্তুতির কাজ শুরু হোতো মাসখানেক আগে থেকে। প্রতি বছরেই গুরুদেব উৎসবের প্রয়োজনে হিন্দী গান ভেঙে বাঙলা গান রচনা করতেন, এবং তার অধিকাংশই গাইতেন হিন্দী গানের ওস্তাদরা, উৎসবের দিনে। এই দলের প্রধান গাইয়ে ছিলেন রাধিকা গোস্বামী। গুণী গাইয়ে হিসেবে তাঁকে গুরুদেব কিরকম শ্রদ্ধা করতেন তা জানা যায় গুরুদেবেরই একটি লিখিত উক্তি থেকে। রাধিকা গোস্বামী প্রসঙ্গে গুরুদেব লিখেছেন :—

"রাধিকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগরাগিণীর রূপজ্ঞান ছিল তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশেষ একটি রস সঞ্চার করতে পারতেন। সেটা ছিল ওস্তাদির চেয়ে বেশি।"

এ যুগে হিন্দী-ভাঙা বাঙলা গান রচনাতে গুরুদেবের প্রধান সহায় ছিলেন রাধিকা গোস্বামী।

১৩০৫ থেকে ১৩০৮ সাল পর্যন্ত, উপরোক্ত "তরী আমার হঠাৎ" এবং "তুমি হৃদয়ে একটি আসন" গান দুটি ছাড়া, গুরুদেবের আর কোনো গানই খাতায়ে নেই।' সেজন্যে, রাধিকাবাবুর সহায়তায় গুরুদেব হিন্দী-ভাঙা বাঙলা গান এই চার বছরে ক'টি যে রচনা করেছিলেন, তা এই খাতা দেখে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু বেশ কিছু গান তিনি রচনা করেছিলেন এবং তার তালিকাও পাওয়া যায় ১৩০৫ থেকে ১৩০৮ সালের মাঘোৎসবের গানের কার্যসূচী থেকে। মাঘোৎসবে গাওয়া হিন্দী ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গের বাঙলা গানগুলি রাধিকাবাবুর কাছে পাওয়া হিন্দী গান ভেঙেই গুরুদেব রচনা করতেন। ১৩১১ পর্যন্ত উভয়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় এইরূপ গান রচনার ধারা অব্যাহত ছিল।

১৩০৫ সাল থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত মাঘোৎসবের গানের তালিকা।

১৮২০ শকাব্দ (১৩০৫ সাল)।

প্রাতঃকালের উপাসনার গান—

১। বিমল আনন্দে জাগ রে।—বাহাদুরীটোড়ী, ঢিমাতেতালা।
২। পিপাসা হায় নাহি মিটিল।—ভৈরবী, কাওয়ালি।
৩। তুমি কাছে নাই বলে।—কীর্তন।
৪। নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে। কীর্তন।

"সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্তবাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মধুর স্বরে বেদগান করিলেন।"

সায়ংকালের উপাসনার গান—

১। তব রাজ-সিংহাসন বিরাজিত।—ইমনকল্যাণ, চৌতাল।
২। দিন ফুরাল হে সংসারী।—ভীমপলশ্রী, আড়াঠেকা।
৩। মধুর রূপে বিরাজ হে।—তিলককামোদ, ঝাঁপতাল।
৪। চিরসখা ছেড় না।—বেহাগ, কাওয়ালি।
৫। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই। কীর্তন।
৬। ওহে জীবন বল্লভ। কীর্তন।

প্রাতঃকালের তালিকার প্রথম দুটি ভাঙা-গান। প্রথম গানটি রাধিকাবাবু কর্তৃক গীত হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এর একটি রেকর্ড ছিল। সান্ধ্যানুষ্ঠানের তালিকার প্রথম গানটি গুরুদেবের নয়। পরবর্তী তিনটি ভাঙা-গান। "মধুর রূপে" গানটি প্রথম ভাঙা হয়েছিল ১৩০৩ সালে। খাতায় গানটি আছে। এবারের মাঘোৎসবে অমলাদেবীকে দিয়ে রাধিকাবাবু গাইয়েছিলেন "চির সখা ছেড় না" গানটি। কীর্তন সুরের "ওহে জীবন বল্লভ" গানটি ১৩০১ সালের ৮ই বৈশাখে রচিত। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর কথা (মৃঃ ১২৯১—৮ই বৈশাখ) স্মরণ করে কীর্তনটি রচনা করেছিলেন।

১৮২১ শকাব্দ (১৩০৬ সাল)।

প্রাতঃকালের গান—

১। তোমারি নামে নয়ন মেলিনু।—আশাভৈরোঁ, তেওড়া

২। আজি শুভ শুভ্র প্রাতে।—দেওগান্ধার, চৌতাল।

৩। রক্ষা কর হে। আসোয়ারি, চৌতাল।

৪। সদা থাক আনন্দে। খট্, ঝাঁপতাল।

৫। জানি হে যবে প্রভাত হবে। ভৈরবী, ঝাঁপতাল।

৬। (আজি) প্রণমি তোমারে। বিভাস, একতালা।

সান্ধ্যোপাসনার গান—

১। মহাবিশ্বে মহাকাশে। ইমনকল্যাণ, তেওরা।

২। দিনের বিচার কর। পূরবী, একতালা।

৩। তোমারি গেহে পালিত স্নেহে। খাম্বাজ, একতালা।

৪। হৃদি মন্দির দ্বারে। কেদার, ধামার।

৫। আজি এ ভারত লজ্জিত হে। ভূপালি, কাওয়ালি।

৬। তোমারি সেবক কর হে। ছায়ানট, চৌতাল।

৭। সুখহীন নিশিদিন। গৌড়মল্লার, কাওয়ালি।

৮। দিন যায় রে দিন যায়। পিলু, মধ্যমান।

৯। প্রভু খেলেছি অনেক। দেশ, একতালা।

১০। কে জানিত তুমি ডাকিবে। কীর্তন।

১১। বাণী তব ধায় অনন্ত। আড়ানা, চৌতাল।

১২। কেমনে রাখিবি তোরা। সিন্ধুড়া, ঝাঁপতাল।

১৩। ভুবন হইতে ভুবনবাসী। বড়হংসসারঙ্গ, একতালা।

১৪। ভয় হতে তব অভয়। বেহাগ, চৌতাল।

১৫। ইচ্ছা হবে যবে। কালাংড়া, ঠুংরী।

১৬। প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ। সিন্ধু, একতালা।

১৭। আমি সংসারে মন।—কীর্তন।

"দিনের বিচার কর" দুই নম্বর গানটি গুরুদেবের নয়।

১৮২২ শকাব্দ (১৩০৭)।

সন্ধ্যাকালীন উপাসনার গান—

১। হৃদয়শশী হৃদি-গগনে। ইমনকল্যাণ, তেওরা।

২। প্রতিদিন তব গাথা। ঝিলফ্‌বারোঁয়া, সুরফাঁকতাল

৩। তোমারি রাগিণী জীবন। ইমন, তেওরা।

৪। মহানন্দে হের গো তারে। তিলককামোদ, তেওরা।

৫। সখা হে মম হৃদয়ে। ছায়ানট, একতালা।

৬। প্রতিদিন আমি হে। কাফি, ঝাঁপতাল।

১৮২৩ শকাব্দ (১৩০৮)

প্রাতঃকালের উপাসনার গান—

১। মোরে ডাকি লয়ে যাও। রামকেলী, তেওরা।

২। বল দাও মোরে বল দাও। ভৈরবী, একতালা।

সন্ধ্যার উপাসনার গান—

১। মোরা সত্যের পরে মন।—ভূপনারায়ণ, একতালা।

২। আমার বিচার তুমি কর।—কেদারা, তেওরা।

৩। সফল কর হে প্রভু।—মল্লার, কাওয়ালি।

৪। আমি কি বলে করিব।—সিন্ধুবারোঁয়া ঝাঁপতাল।

৫। ডাক মোরে আজি এ।—পরজ, কাওয়ালি।

৬। আমি জেনেশুনে তবু।—কীর্তন।

"গত ১১ই মাঘের রাত্রিকালের উপাসনায় যে বেদগান হইয়াছিল তাহা হইল।—তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং।"

১৩০৮ সালের মাঘোৎসবের সাস্ক্যোপাসনায় প্রথম গানটি রচিত ও গীত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে, ৭ই পৌষে, ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের কিছু পরে।

১৩০৩ সাল থেকে এ-পর্যন্ত মাঘোৎসবের গানের তালিকা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো যে, গুরুদেব সকালের উপাসনার গানগুলি রচনার সময় ব্যবহার করেছেন সকালবেলাকার রাগিণী। যেমন—

বাহাদুরীটোড়ী, ভৈরবী, আশাভৈরোঁ, দেওগান্ধার, আসোয়ারী, খট্, বিভাস ও রামকেলী।

সন্ধ্যা ও রাত্রির উপাসনার গানে পাচ্ছি সন্ধ্যা ও রাত্রির রাগিণী। রাগিণীগুলি ঃ

শঙ্করাভরণ, ঝিঁঝিট, ইমনকল্যাণ, কেদারা, হাম্বীর, বাহার, দেশ, বেহাগ, মিশ্রসুরট, ছায়ানট, সিন্ধু, সাহানা, আড়ানা, কাচ্ছাসার, ভীমপলশ্রী, তিলককামোদ, পূরবী, খাম্বাজ, ভূপালী, গৌড়মল্লার, পিলু, সিন্ধুড়া, বড়হংসসারঙ্গ, জিল্ফবারোঁয়া।

ব্যতিক্রম হিসেবে, ১৩০৬ সালের সাস্ক্যোপাসনায় কালাংড়া রাগিণী ও ঠুংরি তালের একটিমাত্র গান পাওয়া যায়।

হিন্দী গানে দিন ও রাত্রিকে নানা প্রহরে ভাগ করে রাগরাগিণী গাইবার একটি রীতি বহু যুগ থেকে চলে আসছে। গুরুদেবও তাঁর গানের বেলায় এ নিয়মটিকে অবহেলা করতেন না। সকাল ও সন্ধ্যার উপাসনার গানের কথা বিবেচনা করে পূজাপর্যায়ের গান রচনার আরম্ভ যুগ থেকেই এ নিয়মটিকে গুরুদেব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছেন জীবনের শেষ পর্যন্ত।

মাঘোৎসবের গানগুলিতে যে ক'টি তাল গুরুদেব ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যে, "ত্রিতাল"-টি কোথাও নেই। এর কারণ হলো, বর্তমানে আমরা যে তালটিকে মধ্যলয়ের খেয়াল-গানে "ত্রিতাল" নামে ব্যবহার করি, সেই তালের ছন্দকেই ঊনবিংশ শতকের বাঙলা দেশে বলা হোতো "কাওয়ালি"। গুরুদেবের মধ্যলয়ের খেয়ালভাঙা বাঙলা গানগুলিতে এই কারণেই "ত্রিতাল"-এর পরিবর্তে "কাওয়ালি" নামটি রয়ে গেছে।

উপরোক্ত মাঘোৎসবের কয়েক বছরের তালিকায় যে সাতটি কীর্তন সুরের গান আছে, তা হলো ঃ—

১। তুমি কাছে নাই বলে হেরো সখা তাই।

২। নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে।

৩। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই।
৪। ওহে জীবন বল্লভ।
৫। কে জানিত তুমি ডাকিবে।
৬। আমি সংসারে মন দিয়েছিনু।
৭। আমি জেনেশুনে তবু ভুলে থাকি।

এই গান ক'টিতে সুরের তারতম্য থাকলেও একতালা ছন্দে রচিত, কিন্তু এর উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এর প্রত্যেকটিতেই গুরুদেব নিজে আখর জুড়ে মাঘোৎসবের উপাসনায় গাইয়েছিলেন। ১৩০১ সালের "মেঘ ও রৌদ্র" গল্পের "এস এস ফিরে এস, বঁধু হে ফিরে এস" গানটিতেই এরূপ চেষ্টার পরিচয় প্রথম পেয়েছিলাম। কিভাবে আখর দিয়ে গাইবার ঢং-এ গানটির কথা বাড়িয়েছিলেন তা নিয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এর পূর্বে আখর দেওয়া কীর্তন একটিও রচনা করেননি। "এস এস ফিরে এস" গানটির চার বছর পরে অর্থাৎ ১৩০৫ সালে, নতুন উদ্যমে আর একবার এইরূপ গান রচনায় তাঁকে হাত দিতে দেখা গেল। এবারের মাঘোৎসবের উপাসনায় কীর্তন গান ছিল মোট চারটি, ১৩০৬ সালে দুটি এবং ১৩০৮ সালে একটি। এর পরে আর কখনো এ ধরনের কীর্তন গান রচনা করেননি।

উপরোক্ত তালিকার "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে" গানটি ১২৯৩ সালের মাঘোৎসবে গীত হয়। "ওহে জীবন বল্লভ" গানটিই ৮ই বৈশাখ ১৩০১ সালে রচিত এবং "আমি জেনেশুনে তবু ভুলে থাকি" ও "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই" গান দুটি প্রথম রচিত হয়েছিল ১২৯১ সালে (১৮০৬ শকাব্দ)। প্রথম রচনা কালে এ-গান ক'টিতে আখর ছিল না, আখর বসিয়ে গাওয়ানো হলো এ-যুগে, প্রথম।

আখর-যুক্ত কীর্তন গান রচনার উৎসাহ এ-যুগে গুরুদেবের মনে জাগবার কারণ মনে করি, শিলাইদহে জমিদারির পুণ্যাহ-দিনের উৎসবে যোগদানকারী কীর্তনওয়ালারা। প্রতি বৎসরেই এঁদের গান গুরুদেব যে শুনতেন, ১৩০১ সালে মৃণালিনী দেবীকে লেখা তাঁর একটি চিঠি পড়ে তা মনে হয়। গুরুদেব মৃণালিনী দেবীকে উৎসবের কথা জানিয়ে লিখলেন—

> "কাল বাজনাবাদ্য উপাসনা ইত্যাদি করে পুণ্যাহ হয়ে গেল।
> সন্ধ্যাবেলায় কাছারিতে একদল কীর্তনওয়ালা এসেছিল।
> তাদের কীর্তন শুনতে রাত এগারোটা হয়ে গেল।"

এটুকু সংবাদ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি ধৈর্য ধরেই কীর্তন গান শুনতেন।

জোড়াসাঁকোর বাড়ির উৎসবে কীর্তন সুরের নিজের গানগুলি গুরুদেব যে গাইতেন সে খবরও আমরা পাই ১৩০৬ সালের ১১ই মাঘের এক উপাসনার সংবাদ থেকে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এ-সংবাদটিতে আছে :—

"প্রার্থনার পর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু তাঁহার নবরচিত সুমধুর কীর্তন আরম্ভ করিলেন—'আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু, তুমি দুখ বলে সুখ দিয়েছ' (সংসারে মন দিয়েছিনু)। আদি সমাজের কয়েকজন গায়ক এই কীর্তনে যোগদান করিলেন এবং সঙ্গে মৃদঙ্গ করতাল বাজিতে লাগিল, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্তবাবু হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হারমোনিয়ম বাজাইয়া সঙ্গীত এবং কীর্তনের মাধুর্যকে মধুরতর করিয়াছিলেন।"

এ-থেকে অনুমান করা যায় যে, কীর্তনওয়ালাদের মত দোঁহার, খোল ও করতাল যোগেই বাড়ির উৎসবাদিতে গুরুদেবের কীর্তন সুরের গানগুলি গাওয়া হতো।

১৩০৮ সালের ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। ১৩০৯ সালের গ্রীষ্মের ছুটির পর গুরুদেব মৃণালিনী দেবীকে সেখানে নিয়ে এলেন। মৃণালিনী দেবীকে দেখা গেল গুরুদেবের পাশে আশ্রম-পরিবারের মাতারূপে। কিন্তু এখানে আসার পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে ভাদ্র মাসে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হলো চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। কোন ফল হলো না। অগ্রহায়ণ মাসের ৭ তারিখে তিনি দেহত্যাগ করেন। মাসের শেষ দিকে গুরুদেব পুত্রকন্যাসহ বিদ্যালয়ে ফিরে এলেন। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর বেদনা গুরুদেব কিভাবে বহন করেছিলেন তার পরিচয় তিনি রেখে গেছেন তাঁর "স্মরণ" কাব্য-গ্রন্থের কবিতাগুচ্ছে। এই কবিতাগুচ্ছের অধিকাংশই প্রথম লিখেছিলেন আমাদের এই আলোচ্য খাতাটিতে। সব ক'টি কবিতার নিচেই আছে রচনার তারিখ। তা থেকে বোঝা যায় যে, ২৯শে অগ্রহায়ণ থেকে ১লা মাঘ পর্যন্ত মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর বেদনায় গুরুদেবের মন কতখানি গভীরভাবে আচ্ছন্ন। ১৮ই অঘ্রানে, দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা, গুরুদেবের একটি চিঠিতেও একথার সাক্ষ্য মেলে। তিনি লিখছেন ;—

"প্রিয়বরেষু,

ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়েছেন তাহা যদি নিরর্থক হয় তবে তার মত এমন

বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে। ইহা আমি মাথা নীচু করিয়া গ্রহণ করিলাম। যিনি আপন জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্ট কালকে সার্থক করিবেন। তাঁহার কল্যাণী স্মৃতি আমার সমস্ত কল্যাণ কর্মের নিত্যসহায় হইয়া আমাকে বলদান করিবে।"

এইরূপ মানসিক অবস্থাতেই শান্তিনিকেতন থেকে তাঁকে যেতে হলো কলকাতায় আসন্ন মাঘোৎসবের প্রয়োজনে। এই উৎসবের উপযোগী গান রচনার দায়িত্ব প্রধানত তাঁর উপরেই থাকাতে এবারেও মাঘোৎসবের সকাল ও সন্ধ্যার উপাসনার জন্যে অনেকগুলি গান নতুন করে তিনি রচনা করলেন। কিন্তু এবারের গানে প্রকাশ পেল মৃত্যুর গভীর বেদনায় অশান্ত মনকে শান্ত করার এক আকুল আবেদন। চেষ্টা করেছেন, মনে যে দুঃখের গভীর অন্ধকার নেমেছে তাকে অতিক্রম করতে।

১৮২৪ শকাব্দের (১৩০৯) মাঘোৎসবের গানের তালিকা :

প্রাতঃকালের উপাসনার গান—

১। পান্থ এখন কেন অলসিত অঙ্গ।—ললিত, সুরফাঁক্তা।

২। স্বপন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে।—রামকেলি, একতালা।

৩। মনোমোহন গহন যামিনী শেষে।—আসাবরি, ঝাঁপতাল।

৪। আছে দুঃখ আছে মৃত্যু।—বিভাস, একতালা।

৫। দুঃখ রাতে হে নাথ কে ডাকিলে।—সর্ফর্দা, আড়া।

৬। আনন্দ তুমি স্বামী মঙ্গল তুমি।—ভৈরবী, সুরফাঁক্তা।

৭। সংসার যবে মন কেড়ে লয়।—ভৈরবী, ঝাঁপতাল।

৮। যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার।—সিন্ধু ভৈরবী, ঝাঁপতাল।

৯। তোমার পতাকা যারে দাও। ভৈরবী, ঠুংরি।

রাত্রিকালের উপাসনার গান—

১। ঘাটে বসে আছি আনমনা।—পূরবী, একতালা।

২। সংসারে তুমি রাখিলে।—ইমনকল্যাণ, ঝাঁপতাল।

৩। অল্প লইয়া থাকি তাই।—ছায়ানট, একতালা।

৪। এ ভারতে রাখ নিত্য প্রভু।—সুরট, চৌতাল।

৫। দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া।—সুরটমল্লার, একাদশী।

৬। মন্দিরে মম কে আসিলে।—আড়ানা, একতালা।

৭। বাজাও তুমি কবি।—বাহার, সুরফাঁক্তা।

৮ শূন্য হাতে ফিরি হে।—কাফি, সুরফাঁক্তা।

৯ নিবিড় ঘন আঁধারে।—সাহানা, নবতাল।

১০ আমারে কর জীবন দান।—শঙ্করা, চৌতাল।

১১ তোমার অসীমে প্রাণমন।—বেহাগ, কাওয়ালি।

১২ গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে।—পরজ, রূপকড়া।

১৩ শান্ত হ রে মম চিত্ত।—ঝিঁঝিট, ঠুংরি।

এই তালিকার 'সংসার যবে মন,' 'যদি এ আমার', 'তোমার পতাকা,' 'ঘাটে বসে আছি,' 'সংসারে তুমি রাখিলে,' 'অল্প লইয়া থাকি তাই' এবং 'তোমার অসীমে,' এই সাতটি গান ১৩০৮ সালের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে পূর্বে মুদ্রিত। 'শান্ত হ রে মম চিত্ত' এবং 'পান্থ এখন কেন অলসিত' গান দুটি যথাক্রমে ১৩০৩ এবং ১৩০৪ সালে রচিত।

এবারকার মাঘোৎসবের জন্য নতুন গান রচনা করেছিলেন—

১। স্বপন যদি ভাঙিলে।

২। আছে দুঃখ আছে মৃত্যু।

৩। দুঃখ রাতে হে নাথ কে।

৪। আনন্দ তুমি স্বামী।

৫। দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া।

৬। মন্দিরে মম কে।

৭। নিবিড় ঘন আঁধারে।

৮। গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে।

৯। মনপ্রাণ কাড়িয়া লও হে নাথ।

৯ নম্বর গানটি মাঘোৎসবে গাওয়ানো হয়নি উপরের তালিকার মোট পাঁচটি গান হিন্দী-গান থেকে ভাঙা।

১। স্বপন যদি ভাঙিলে।—(হিন্দী)

আরা মরি বাওরী
মরুকে গয়ী রি
টুটি লঙ্গরবা
ছৈলত্ রথবা।
বার ছুটে হার টুটে
করকী করকী চুরিয়াঁ সু

৩। দুঃখ রাতে হে।—(হিন্দী)

রঙ্গরাত মাত আয়ে পিয়া

বাত কহতা ইত আয়ে পিয়া

অজহুঁ সহে নিদ পিয়া

নৈনা রতনারে

চাল চলতা ইত রাত আছে পিয়া।

৪। আনন্দ তুমি স্বামী।— (হিন্দী)

ওঙ্কার মহাদেব শঙ্কর তুম

(পূর্বে এ গানটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে)

৬। মন্দিরে মম কে।— (হিন্দী)

সুন্দরো লগো হাঁয় পিয়াবা

চপল চপল চখন লখন

দুর দুর মুর মুর ফিবি মুচকানি বাণী।

লটকি চলনি মুকুট সুকন

ভ্রুকুটি কুটিল অলক ঝলক

হলকানি কুড়ল কপলনি আনি আনি।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সঙ্গীত-চন্দ্রিকা' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে এ গানটি আছে, কিন্তু সর্বত্র কথা এক নয়।

৭। মনপ্রাণ কাড়িয়া লও হে।—(হিন্দী)

হাসি হাসি গারোয়া লগবে, কনহইয়া মোকো—

বাঁশরী বজাবে মেরে জিয়াকো লোভাবে প্যারে।

সুখ সে কটী সাচী রয়ন শ্যাম সঙা

ওত প্রাতা জিয়া ছীন লে যাবে প্যারে।

এই তালিকার 'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া' এবং 'নিবিড় ঘন আঁধারে,' তালের দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গান। কারণ, গান দুটির তাল সম্পূর্ণ নতুন এবং গুরুদেবেরই নিজস্ব সৃষ্টি। প্রথম গানের তালের নাম দেওয়া হয়েছে 'একাদশী', তালটি পুরো ১১ মাত্রার এবং ৩।২।২।৪ মাত্রা-ভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয়টির নাম 'নবতাল'—মোট ৯টি মাত্রায় বিভক্ত, এর মাত্রা ভাগ হলো ৩।২।২।২। নতুন তালে নিজের গান রচনায় চেষ্টা এর পূর্বে গুরুদেব আর করেননি। 'গভীর রজনী' গানটিতে অপ্রচলিত 'রূপকড়া' তালটি গুরুদেব এবারেই প্রথম ব্যবহার করলেন।

'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' গানটি বর্তমানে খুবই পরিচিত। কিন্তু মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর বেদনার আবেগে এটি যে রচিত, এই পকেটবুক-এর সাহায্যে এবারেই তা প্রথম জানা গেল। খাতায়, গানটির প্রথম কলি ছিল :—

"মৃত্যু শোক দুঃখ পরে শুভ্র রাগে। .
আছে দুঃখ আছে মৃত্যু
বিরহ দহন লাগে।
তবু আনন্দ জাগে হে"

মাঝের পংক্তিতে ছিল—'বসন্তে কুসুম বিকাশে অনন্ত রাগে।' আর শেষের পংক্তিতে আছে—'এই পূর্ণতার পায়ে কবি স্থান মাগে।'

'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে' গানটি লিখে দু'বার কাটাকুটি করে তৃতীয়বারে সম্পূর্ণ করেন। প্রথমবারে ছিল :—

"অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী
খেলা হল সমাধান।
চপল চঞ্চল লহরী লীলা
অতলে হল অবসান।"

গানটির এটি সঞ্চারী কলি। এটি কেটে, দ্বিতীয়বারে লিখলেন :—

"মধুর সন্ধ্যা নামিল হৃদয়ে
আর কোলাহল নাই
রহি রহি শুধু সুদূর সিন্ধুর
ধ্বনি শুনিবারে পাই।
সব আকাঙ্ক্ষা চিত্তে আসে ফিরে
গভীর আঁধার ঘনায় বাহিরে
একটি দীপ শুধু হের রে অন্তরে
নিভৃতে জ্বলে এক ঠাঁই।"

এটিও বাতিল করা হলো। তৃতীয়বারে লিখলেন—

"গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে
আর কোলাহল নাই।"

—ইত্যাদি বাকি কলির পংক্তির সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত পংক্তির পার্থক্য নেই। খাতায় 'গভীর' শব্দটি লিখেও কেটে দেওয়া হয়েছিল।

আমরা এতদিন জানতাম, গুরুদেব মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর বেদনার আবেগ কেবলমাত্র 'স্মরণ' গ্রন্থের কবিতাগুলিতে নানারূপে প্রকাশ করে গেছেন, কিন্তু গানের সুরেও যে সেই বেদনার প্রকাশ ঘটেছিল একথা তিনি নিজে কোথাও প্রকাশ করেননি বলে—'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু', 'দুঃখ রাতে, হে নাথ কে', 'আনন্দ তুমি স্বামী', 'নিবিড় ঘন আঁধারে', 'গভীর রজনী নামিল' প্রভৃতি গান-গুলির রচনার সঠিক কারণ এতদিন ধরা পড়েনি। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে ১৩০৯ সালের মাঘোৎসবের গানগুলি ভালো করে বিচার করলে সেবারকার উপাসনার প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করা সহজ হয়। গুরুদেব চাইছেন, মৃত্যুর বেদনাকে সহায় করে চিরন্তন আনন্দের জগতে পৌছতে।

মাঘোৎসবের গানের পরেই আছে 'জয় হোক তব জয়' গানটি। আচার্য জগদীশচন্দ্রকে লেখা, বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত গুরুদেবের পত্রগুচ্ছের সমষ্টি 'চিঠিপত্র' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে, এ-গানটির পরিচিতিতে বলা হয়েছে—"ভারত-সঙ্গীত সমাজ' জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য একটি 'সারস্বত সম্মিলন'-এর আয়োজন করেন (১৯ মাঘ, ১৩০৯ বা ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৩ তারিখে)···অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নলিখিত সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন :—'জয় হোক তব জয়।"

"এই গানটি 'বন্দনা' নামে, ১৩০৯ ফাল্গুন-সংখ্যা ভারতী পত্রে, নিম্নমুদ্রিত সম্পাদকীয় মন্তব্য-সহ প্রকাশিত হয়—

'এই বৎসর সারস্বত উৎসবকালে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে কলিকাতাস্থ বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায় হইতে সম্মান ও অর্ঘ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সঙ্গীতটি তদুপলক্ষ্যে রচিত'।"

এরপরে আছে দুটি বিবাহের গান। গান দুটি ১৩০৯ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠের আগে কোনো এক সময়ে রচিত। গান দুটিতে তারিখ না থাকায় কোন্ আত্মীয়ের বিবাহের জন্যে রচনা করেছিলেন, তা সঠিক বলা যাচ্ছে না। তবে জানা যায় যে, গুরুদেবের অত্যন্ত স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহের দিন ছিল ১৪ই আষাঢ়, ১৩১০ সাল। মনে হয়, এই বিবাহের পূর্বে জ্যৈষ্ঠ মাসে এ-দুটি গান গুরুদেব রচনা করেছিলেন। গান দুটি হলো :—

"যে তরণীখানি ভাসালে দুজনে" এবং
"দুজনে যেথায় মিলিছে সেথায়।"

খাতাটিতে এরপর পাতার পর পাতা কবিতা ছাড়া গান নেই। বেশ কয়েক মাস

পরে, একেবারে ১৩১১ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের পাওয়া গেল আটটি গান। গান ক'টি পর পর লেখা আছে রচনার সময় ও স্থানের উল্লেখসহ। যেমন :—

১। মন তুমি, নাথ, লবে হ'রে।

—২০শে জ্যৈষ্ঠ। ১৩১১। শান্তিনিকেতন।

২। দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।

—২২ জ্যৈষ্ঠ। ১৩১১। শান্তিনিকেতন।

৩। আজি যত তারা তব আকাশে।

—২৪শে জ্যৈষ্ঠ। ১৩১১। শান্তিনিকেতন।

৪। গরব মম হরেছ, প্রভু।

—২৫শে জ্যৈষ্ঠ। ১৩১১।

৫। সবার মাঝারে তোমারে।

—২৬শে জ্যৈষ্ঠ। ১৩১১।

৬। যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ।

—২৬শে জ্যৈষ্ঠ। ১৩১১।

৭। কি সুর বাজে আমার প্রাণে।

—২৩শে আষাঢ়। ১৩১১। মজফ্ফরপুর।

৮। তুমি যে আমারে চাও।

—২৩শে আষাঢ়। ১৩১১।

এই আটটি গানের রচনাকালের সঙ্গে মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্য-গ্রন্থাবলীর 'গান' খণ্ডের প্রকাশকাল একটি জটিলতার সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয়। গ্রন্থাবলীর অষ্টম খণ্ডটি হলো গানের সংকলন। এ-খণ্ডটি যে ১৩১০ সালে মুদ্রিত, তারও উল্লেখ আছে মুদ্রকের নাম ও ঠিকানার নিচে। অথচ গ্রন্থের ৩২৩ থেকে ৩৩১ পৃষ্ঠায় ১৩১১ সালের এই আটটি গান মুদ্রিত। এই গান ক'টির সালের সঙ্গে 'গান' খণ্ডের প্রকাশ সম্পর্কিত সালের এইরূপ অসামঞ্জস্য কেন দেখা দিয়েছিল, তা বলি।

১৩১০ সালে প্রকাশিত 'সমালোচনী' নামক একটি মাসিক পত্রিকার ৮ম সংখ্যার একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়েছিল যে কাব্যগ্রন্থাবলী মোট ৮ খণ্ডে বিভক্ত, তার ৭ম খণ্ডটি হল গানের সংকলন এবং ৯ম খণ্ডটি হল নাটকের। কিন্তু পত্রিকাটির পরবর্তী ৯ম সংখ্যার বিজ্ঞপ্তিতে ছিল "গ্রন্থাবলী প্রধানত নয় খণ্ডে সমাপ্ত হইতেছে। আট খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গান খণ্ড চৈত্র মাস মধ্যে

প্রকাশিত হইবে।" গান খণ্ড সম্পর্কে একই বিজ্ঞপ্তি পত্রিকাটির পরবর্তী ১০ম ও ১১ সংখ্যাতেও ছিল। এর দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডগুলি সংখ্যানুযায়ী পরপর মুদ্রিত হতে পারেনি। অন্তত গান খণ্ডের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছিল। সেটি চৈত্র মাসে প্রকাশিত হবে বলা হলেও, হয়নি। ১৩১১ সালের আষাঢ় মাসের পর কোন এক সময়ে মুদ্রিত হয়েছিল বলেই ধরে নিতে হবে। তা না হলে ঐ গান ক'টি গ্রন্থাবলীতে কিছুতেই স্থান পেতে পারে না।

১৩১১ সালের ৬ই মাঘ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোয় দেহত্যাগ করেন। স্বভাবতই পরিবারের সকলের মন এই মৃত্যুর আঘাতে বিষণ্ন। এইরূপ মানসিক অবস্থার মধ্যে গুরুদেব এবারের মাঘোৎসবের জন্য একটির বেশী নতুন গান রচনা করতে পারেননি। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের গান থেকে রাখলেন পাঁচটি গান, ১৩০৮ সালের 'নৈবেদ্য' থেকে নিলেন দুটি, আরো দুটি গান অন্যের লেখা। মাত্র একটি গান গুরুদেব এবারে হিন্দী থেকে ভেঙেছিলেন। সব মিলিয়ে গানের সংখ্যা ছিল দশ। গানগুলি হলো :—

১৮২৬ শকাব্দ (১৩১১)

সায়ংকালের উপাসনার গান—

১ শক্তিরূপ হের তার (ভাঙা গান)—ইমন, চৌতাল।
২ (আমার) মন তুমি, নাথ, লবে হ'রে।—ছায়ানট, ঝাঁপতাল।
৩ গরব মম হরেছ, প্রভু।—দেশমল্লার, ধামার।
৪ নিশীথশয়নে ভেবে রাখি—বাগেশ্রী, তেওরা।
৫ সকল গর্ব দূর করি দিব।—আড়ানা, একতালা।
৬ যে কেহ মোরে দিয়েছ।—কাফি, তেওরা।
৭ ঐ যে দেখা যায় (অন্যের গান)—সিন্ধুবিজয়, তেওরা।
৮ এ কি এ মোহের ছলনা (অন্যের গান)—কাফিকানাড়া, কাওয়ালি।
৯ দাঁড়াও আমার আঁখির।—বেহাগ, তেওরা।
১০ আজি যত তারা তব—লুম-খাম্বাজ, ঠুংরি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পরে এতদিনকার এই বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। জোড়াসাঁকোর বাড়ীর ওস্তাদি সঙ্গীতের বৃহৎ আসরটি ভেঙে গেল। গুরুদেব শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষা

সৃজনাত্মক কাজের প্রতি অধিক মনোযোগ দেবার সুযোগ পেলেন। সেই সঙ্গে গুরুদেবের গান রচনার আবেগও, এখন থেকে নতুন খাতে বইতে লাগল। এখনকার গানে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি বিশেষ স্থান পেল। শান্তিনিকেতন ও কলকাতার উৎসবের প্রয়োজনে হিন্দী-ভাঙা বাংলা গান রচনার পথ ত্যাগ করে গুরুদেব, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলতে শুরু করলেন। দেখা দিল পঞ্জা পর্যায়ের গানগুলিতে নতুন ভাব ও রসের আবেগপূর্ণ নতুন রূপ।

নির্দেশিকা

গান ও কবিতা

র

ল

শ

স

হ

গ্রন্থ, পত্রিকা, প্রবন্ধ ও স্থান

উল্লিখিত ব্যক্তিগণ